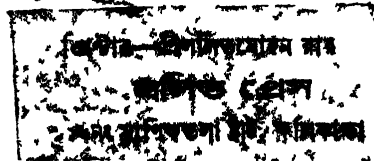
প্রার্থনা



বান্ধব দাসানুদাস
মহানামব্রত
সম্পাদিত।

শ্রীশ্রীমহানাম সম্প্রদায় সেবক
গোপীবন্ধু দাস
কর্ত্তৃক—

ফরিদপুর
শ্রীশ্রীধাম শ্রীঅঙ্গণ হইতে প্রকাশিত।



শুভ জন্মোৎসব

ভুবনৈকবন্দ্য পূণ্যময়া সর্ব্বমঙ্গলা শ্রীশ্রীসীতানবমীতিথি

স্মরণে

ভূলোকে গোলোকধাম ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গণে শ্রীশ্রীমহানাম যজ্ঞক্ষেত্রে ছাপ্পান্ন প্রহর ব্যাপী অবিরাম শ্রীসংকীর্ত্তন, পাঠ শ্রীমদ্ভাগবতীয় কথা প্রসঙ্গ, ইষ্ট গোষ্ঠী। ২৪শে বৈশাখ হইতে ৩০শে বৈশাখ।

কৈশোর লীলাক্ষেত্র শ্রীধাম বাকচর শ্রীঅঙ্গণে ছাপ্পান্ন প্রহর ব্যাপী শ্রীসংকীর্ত্তন মহোৎসব। ১৮ই বৈশাখ হইতে ২৪শে বৈশাখ।

আবির্ভাবপীঠ শ্রীডাহাপাড়া (মুর্শিদাবাদ) শ্রীজগদ্বন্ধুধামে চব্বিশ প্রহর ব্যাপী শ্রীসংকীর্ত্তন মহোৎসব, শ্রীমদ্ভাগবতীয় কথা প্রসঙ্গ ইষ্ট গোষ্ঠী নগর সংকীর্ত্তন। ২২শে বৈশাখ হইতে ২৪শে বৈশাখ।

বাল্যলীলা ভূমি শ্রীধাম ব্রাহ্মণকাঁদায় অষ্ট প্রহর ব্যাপী শ্রীসংকীর্ত্তন মহোৎসব। ২৪শে বৈশাখ।

শ্রীধাম ঢাকা শ্রীবন্ধু মিলন মঠে অষ্ট প্রহর ব্যাপী শ্রীসংকীর্ত্তন মহোৎসব। ২৪শে বৈশাখ।

চট্টগ্রাম শ্রীবন্ধু কুঞ্জে অষ্ট প্রহর ব্যাপী শ্রীসংকীর্ত্তন মহোৎসব। ২৪শে বৈশাখ।

পেগু (রেঙ্গুন) বন্ধুগতপ্রাণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুবল কুমার সরকার মহাশয়ের স্বকীয় ভবনে শ্রীসংকীর্ত্তন মহোৎসব। ২৪শে বৈশাখ।

এলাহাবাদ (কর্ণেলগঞ্জ) বন্ধুভক্তিপরায়ণ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাস ভবনে শ্রীসংকীর্ত্তনোৎসব। ২৪শে বৈশাখ।

কলিকাতা (প্রেম চাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট) বান্ধব প্রাণ শ্রীযুক্ত ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস ভবনে চতুঃ প্রহর ব্যাপী শ্রীসংকীর্ত্তনোৎসব। ২৪শে বৈশাখ।

মুন্সীগঞ্জ শ্রীবন্ধু আশ্রমে, কুষ্টিয়া শ্রীবন্ধু মিলন মঠে, কলিকাতা শ্রীমহাউদ্ধারণ মঠে, মেহেরপুর শ্রীবন্ধু পাটে, কৃষ্ণনগর (ঘূর্ণী) শ্রীবন্ধু আশ্রমে, বরিশাল শ্রীবন্ধু মিলন মঠে শ্রীসংকীর্ত্তনোৎসব। ২৪শে বৈশাখ।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে বন্ধু-পদা-শ্রিত বান্ধব বৃন্দের স্ব স্ব ভবনে শ্রীসংকীর্ত্তনোৎসব, তিথিপূজা, ভোগরাগ ও সেবানুষ্ঠান হইবে।

—:০:—

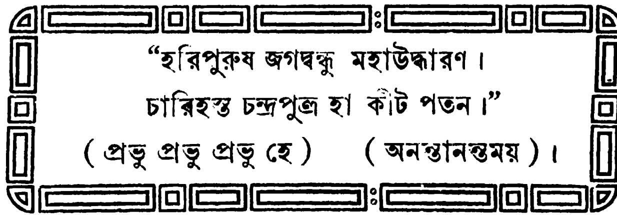


শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ।।



আঙ্গিনা

প্রথম বর্ষ
প্রথম সংখ্যা। | বৈশাখ—১৩৩৭, শ্রীশ্রীসীতানবমী। | শুভ জন্মোৎসব
শ্রীহরিপুরুষাব্দ ৬০



"হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।
চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীট পতন।"
(প্রভু প্রভু প্রভু হে) (অনন্তানন্তময়)।

মঙ্গলাচরণম্।

লীলাগুহ্যা যতিভিরপি দুর্বেদনীয়েঽস্মিন্
কাশক্তির্মে ভজন রহিতস্যাস্য তত্ত্ববোধে।
বক্ষ্যামীষত্তদপি সহজপ্রেমবাধ্যোঽহমজ্ঞঃ
কিং ন ক্ষম্যো গুণিভিরগুণস্যাপরাধো মমায়ম্॥

নিত্যং যো ন প্রকট বিভবোঽপি বোধোপলব্ধো
মায়োপাধৌ চ যদুপহিতত্বাদ্ বহুত্বাববোধঃ।
যোঽনীশোঽপি প্রকৃতিবশতঃ স্বীকরোতীশধর্ম্মং
মায়ী সোঽয়ং প্রভুরবতরত্যস্য "বন্ধু" র্ধরণ্যাম্॥

বিলোলাস্তীর্ব্বা যঃ সলিলবিপুলোচ্ছ্বাসলহরী
র্জঘান ক্রব্যাদান্ কপিকুলবলৈ র্নীলজলধেঃ।
স্বদেহো বৈদেহীপ্রণয় গগনেন্দুর্নৃপমণিঃ
প্রজারামো রামো হতখলবলো বালিকদনঃ॥

মুকুন্দঃ কালিন্দীকলকলিতকূলে পুলকিতে
পুরামঞ্জো কুঞ্জে ব্রজযুবতীবৃন্দৈ রভসতঃ।
স্বয়ং রেমে সাক্ষান্মদনমদনো যঃ সুখমধো
মধুধ্বংসী বংশীধরকর কদম্বাশ্রিতবপুঃ॥

কলৌ লীলালোলো গলিতবিমলাস্রো হরিরিতি
গদন্ যো হেমাঙ্গো নিজমধুরিমাস্বাদনপরঃ।
কৃপাসিন্ধুর্বন্ধুর্হরিচরিত-সংকীর্ত্তনপিতা
জগদ্বন্ধুঃ সোঽয়ং ত্রিভুবনসখশ্চেত্যবিতথম্॥

স্বয়ং গুপ্তোঽপ্যস্য প্রভবতি ভুবাং যোঽদ্ভুতগুণঃ
পুমান্ শ্রীমান্ শক্ত্যা যুগগতিবিধানে জিতবিধিঃ।
অকুর্ব্বাণোঽপ্যেকো নিভৃতনিলয়স্থঃ প্রকুরুতে
স্ববীর্য্যৈঃ সর্ব্বত্র প্রভুরবতু বঃ সোঽয়মিতরূপঃ॥

বিলোক্য ত্রৈলোক্যে সুমতি-কৃতি-চেতঃ শতদলং
স্ফুরেচ্চারু প্রাচ্যামুষসি দিশি দীপ্তং যমরুণং।
গতং ম্লানাং কান্তিং সুকৃত রহিতচেতঃ কুকুমুদং
"জগদ্বন্ধুঃ" সোঽয়ং তুদতু তিমিরৌঘং সপদি নঃ॥

পিবন্ত্বজ্ঘ্র্যব্জাভ্যাং প্রমদমকরন্দং বিগলিতং
প্রভোঃ সান্দ্রং ভক্তভ্রমরনিকরা রঙ্গবিবশাঃ।
ধুনোতু ধ্বান্তং নঃ পদনখবিভা শান্তিমধুরা
ধরোদ্ধৈতৌভূয়াৎ ঝটিতিকরুণাবৃত্তিরুদিতা॥

—সরস্বতী শ্রীরাধারমণ।
সাধনাশ্রম নদীয়া।

"জয় জগৎবন্ধু"

ভূমিকা।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরকে জানেন না এমন লোক এতদ্দেশে বিরল। আবার, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরকে জানেন, এমন লোক এ জগতে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। পদ্মাসনে উপবিষ্ট তেজঃপুঞ্জকলেবর একখানি কিশোর তাপসমূর্ত্তি প্রতি ঘরে ঘরে বিরাজমান রহিয়া প্রতিনিয়ত বালক-বৃদ্ধ-পুরুষ নারী জাতি-বর্ণ-বয়োধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের মনঃ প্রাণ আকর্ষণ করতঃ কোন্ যেন এক সম্মোহন রাজ্যে সকলকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। তাই তাঁহাকে জানেন না এমন লোক এতদ্দেশে বিরল; আবার, সেই নিভৃত রাজ্যের নীরব দেবতা অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মুর্শীদাবাদের গঙ্গাকূলে প্রকাশিত হইয়া ত্রিংশৎ বর্ষ ছদ্মবেশে সোণার অঙ্গটী মলিন বসনে আবরণ করতঃ সারা ভারতময় পর্য্যটন করিয়া অবশেষে সপ্তদশ বৎসর ফরিদপুর জেলার একটি আঁধার কুটিরে সম্পূর্ণ লোকলোচনের অন্তরালে অতিবাহিত করিয়াছেন। মানুষ তো মানুষ, চন্দ্র সূর্য্য তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই, এ জগতের আলো বাতাস তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই তাঁহাকে জানেন, এমন লোক এ জগতে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। গুরুগাম্ভীর্য্যে বিশ্ব স্তম্ভিত হইয়াছে, রূপমাধুর্য্যে অগণিত জীব আকৃষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে মুষ্টিমেয় তাঁহার পেছনে ছুটিয়াছে, গুটিকতক তাঁহাকে ধরিয়াছে, দুই একটী তাঁহাকে জানিতে চাহিয়াছে; কিন্তু বুঝিতে গিয়া সবাই বিস্ময়ে হা করিয়া রহিয়াছে।

সুদূর ঋষিযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত এই ভারতের বুকে যত উন্নতশক্তি সাধু মহাজন বা অবতার পুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধু তাঁহাদের প্রত্যেক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহার বৈশিষ্ট্য অলৌকিক, অনন্তসাধারণ, অদ্ভূতপূর্ব্ব,—এ কথা, যাঁহারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছেন বা শ্রীমুখের কথা শুনিয়াছেন, তাহারা মুক্তকণ্ঠে বলেন; আর যেখানে যিনি তাঁহার মনোরঞ্জন মূর্ত্তি দেখিতেছেন বা মহামাধুর্য্যময় মহানাম আস্বাদন করিতেছেন, তিনিই অবনত মস্তকে স্বীকার করেন।

মানবজাতির কল্যাণকামী অবতারপুরুষগণ সকলেই মঙ্গল-মালিকা লইয়া মর্ত্ত্যভূমিতে উদয় হয়েন, কত দেশের হাওয়া সেই মালার গন্ধে আলা হয়, কত মানুষের গলা সেই মালা পরিয়া শান্তি লাভে শান্ত হয়, কে তাহার ইয়ত্তা করে! কিন্তু পঙ্কিল জীবস্বভাব দেখিতে না দেখিতে সব ধুইয়া ফেলিয়া কেবল স্মৃতিটি রাখিয়া দেয়। তাই অবতারী যখন আসেন তিনি কেবল মালাটি লইয়াই আসেন না, আগে আসেন কর্ষণকর্ত্তা সংকর্ষণ, হল কাঁধে লইয়া; পাছে আসেন নবনটবর বাঁশীটি ধরিয়া; সমগ্র জীবের হৃদয়ভূমিকে কর্ষণ করতঃ নির্ম্মল করিয়া দিয়া বলাই দাদা ইঙ্গিত করেন আর বাঁশের বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে মধু ঢালিয়া দিয়া মধুরাজ মধুপুর সৃজন করিয়া মধুর লীলাভিনয় করেন। হল কর্ষণ আর মধুবর্ষণ, ইহাই অবতারীর বিশেষত্ব। মহাপুরুষগণ আসেন সুগন্ধি ফুলের ডালি লইয়া বিতরণ করিতে, আর অবতারী পুরুষ আসেন অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র লইয়া এই বিশ্ব-উদ্যান তৈয়ারী করিতে,—কর্ষণে ভাঙ্গিয়া বর্ষণে গড়িয়া পুরাণো জগৎখানাকে নবীন করিতে।

মহাবতারী প্রভু বন্ধু ঠিক তেমনি দুটী বস্তু লইয়া জগতে প্রকট হইয়াছেন। এক হাতে সুদৃঢ় ব্রহ্মচর্য্যের বজ্র-হল, আর এক হাতে সুকোমল হরিনামের মধু-মাধুরী। দশদিকে জলন্ত ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাকর প্রভা, তারই মধ্যে সুস্নিগ্ধ শারদ শশীর হৃদয় জুড়ান আভা, রবি শশীর মিলনময় এই পুষ্পবন্তযোগে যোগেশ্বরেশ্বর মহামহাপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের

আবির্ভাব। তিনি শুধু দিতেই আসেন নাই, নিতেও আসিয়াছেন! উলুবনে মুক্তারাশি ছড়াইলে কি হইবে? তাই আগে তিনি গ্রহণ করিবেন সকল আগাছার বোঝা নিজে মাথায়, তারপর ভুবন জুড়িয়া ব্রহ্মচর্য্যের চাষ, তাহাতে উলুবন হবে বৃন্দাবন, আর সহজ সুন্দর শিশুর হবে সেখানে বাস, তারপর মহানাম মহাকীর্ত্তনে পরম শিশুর সঙ্গে নিখিল বিশ্বের হবে মহারাস।

পুত্রবৎসলা জননী যেমন দিবস রজনী শয়নে স্বপনে স্নেহের পুত্তলী পুত্ররত্নের মঙ্গলকর কার্য্যে আত্মহারা ভাবে বিনিযুক্ত থাকেন অথচ দুরন্ত শিশু স্নেহময়ীর সে অগাধ বাৎসল্যসিন্ধুর বিন্দুমাত্রও অনুভব করিতে না পারিয়া, সঙ্গীগণ সহ আপন মনে মাঠে ঘাটে ছুটাছুটি খেলিয়া বেড়ায়, আজ পরম শান্তি-দাতা প্রভু বন্ধুও তেমনি বিশ্বের কল্যাণচিন্তায় নিজেকে ষোল আনা ডুবাইয়া দিয়া প্রতিনিয়ত অমৃতবারি সিঞ্চনে জীবন্মৃত জগৎকে সঞ্জীবিত করিতেছেন, আর বিষয়ান্ধ জীবকুল তাহাকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার প্রদর্শিত সহজ সুন্দর পথ ছাড়িয়া উৎপথে ছুটাছুটি করিতেছে। জগৎ জুড়িয়া শান্তিরাজ্য সংস্থাপিত না হইলে শান্তিদাতার শান্তি নাই। তাই নিজ শ্রীমুখে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে চারিটী মহাদেশে সমান ভাবে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন, তবে জগদ্বন্ধুর লীলা শেষ হবে।

শ্রীশ্রীপ্রভু নীরবে প্রকৃতির অনুকূলে তিল তিল করিয়া বিশ্বময় আত্মশক্তি সঞ্চার করিতেছেন। তাঁহার লীলা বৈচিত্র্য জীববুদ্ধির অগোচর। তাঁহার জীবনের প্রত্যেকটি বৃত্তান্ত রহস্যপরিপূর্ণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "ব্রহ্মচর্য্য করিও, করাইও" "নামের অভাব, হরিনাম কর" এই দুইটির সন্দেশ লইয়া তিনি ধরায় আগমন করিয়াছেন। নিজ জীবনে অতি কঠোর ভাবে আচরণ করতঃ ত্যাগধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বহু অভিনব তথ্য জানাইয়াছেন,—তাহা শুধু ভারতের নহে, সমগ্র মানব জাতির চিন্তার সামগ্রী। শ্রীশ্রীহরিনাম-তত্ত্ব, শ্রীশ্রীব্রজরস, শ্রীশ্রীনিতাইগৌরমাধুরী—অতি অপূর্ব্ব ভাবে জগতে প্রকাশ করিয়াছেন।

'গৌর না হ'ত কেমন হ'ত কেমনে ধরিত দে,
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা জগতে জানাত কে।'

শ্রীশ্রীঠাকুর নরহরির এই শ্রীপদের অনুসরণ করিয়া আমাদিগকেও কহিতে হইবে শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু যদি না আসিতেন, তবে শ্রীশ্রীনিতাইগৌরের সুনির্ম্মল নাম ধর্ম্মের অপ্রাকৃত সুষমা বিপথগামী কৈতবতপ্ত জীবের হাতে কে আর তুলিয়া দিত?

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা একটুখানিক দিগ্দর্শন করিব। এক দিন পরম ভক্ত বৈষ্ণবকুলতিলক একনিষ্ঠ নিতাই-সেবক জয়নিতাই (দেবেন্দ্রনাথ) শ্রীশ্রীবন্ধুর পাদমূলে বসিয়া নানাকথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "পরম দয়াল নিতাই চাঁদের কি মহিমা!" কথাটি শুনিবামাত্র অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে প্রভু কহিলেন, "দেবেন" অমন কথা বলিতে নাই। পরম দয়াল নিতাই চাঁদ সম্বন্ধে "মহিমা" না বলিয়া "মাধুরী" কথাটি ব্যবহার করিতে হয়, কারণ মহিমা শব্দটীতে একটু ঐশ্বর্য্যের ভাব প্রকাশ পায়।" স্বরচিত শ্রীসংকীর্ত্তন গ্রন্থে শ্রীনিতাই চাঁদের কথা লিখিয়াছেন "অযাচিত উদ্ধারণ বাসিত সংসার।"

শ্রীশ্রীহরিকথা, শ্রীশ্রীচন্দ্রপাত, শ্রীশ্রীত্রিকালগ্রন্থ, শ্রীশ্রীমতী সংকীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীনামসংকীর্ত্তন—এই মহাগ্রন্থ পঞ্চকে বৈষ্ণবে রুচি, শুদ্ধাভক্তি, ব্রজরস, গোপীভাব ও যুগল প্রেম এই তত্ত্বপঞ্চকের মধুরিমা মন্থন করিয়া অমৃত তুলিয়া ঐ যে নিজেই শিরে লইয়া বিশ্ব বিশারি বাহুযুগল বিস্তার করতঃ জীব জগৎকে ডাকিতেছেন—

"ভাব রাগ ভরা,　　প্রেমের পসরা,
ধরি নিজ শিরে ডাকে।
অবিচারে দেয়,　　বিনামূলে হায়,
কেন পড়ে থাক ফাঁকে?"

আমরা ভাবিয়াছি, এই প্রখর দিবালোকে পেচকের বৃত্তি লইয়া আর ফাঁকে পড়িয়া থাকিব না। অমন মধুর ডাক শুনিয়াও এই মায়া কোলাহলে আর বধির হইয়া ভুলিয়া থাকিব না। ঐ যে—

উদ্ধার বিধান হল এত দিনে, আয়রে কে কোথা আছিস্।
বিলম্ব কি সাজে হের ব্রজ রাজে, পেয়ে বন্ধু কেন ভুলিস্?

আমরা অনধিকারী অপরাধী জীব। আর প্রভু বন্ধুর শ্রীমুখবিগলিত সেই সব মহামহাতত্ত্ব-মাধুরী-মহাপ্রসাদ রসিক ও ভাবুক ভক্তেরই চির আস্বাদনীয়। তথাপি কেন জানি না, সাধ আছে, আশা—পরম দয়াল বান্ধববৈষ্ণববৃন্দের চরণতলে গড়াগড়ি দিয়া "আজিনা" দ্বারে সেই মহামহা-প্রসাদরসমাধুর্য্যের মাধুকরী লইয়া ধন্য হইব।

বন্ধু-বান্ধব কৃপা হি কেবলম্।

সমর্পণ।

এ বিশ্ব সংসার, রঙ্গমঞ্চ যাঁর,
সেই রঙ্গ নটবর।
তাঁহারি "আঙ্গিনা" পদাঙ্কে রঙ্গিনা,
লীলা রস সরোবর॥
শ্রীশ্রীবৃন্দাবন, নন্দের অঙ্গন,
পূণ্য তীর্থ কৈলা যেই।
মদীয়া গগনে, শ্রীবাসঅঙ্গনে,
নৃত্য-লীলা কৈলা সেই॥
সেই পহু পুনঃ, হ'য়ে অবতীর্ণ,
জগদ্বন্ধু নাম ধ'রে।
গোয়ালচামট, লীলায় প্রকট,
মহা-উদ্ধারণ তরে॥
নিজে সাধ ক'রে, শ্রীঅঙ্গন গ'ড়ে,
বিরাজিছে নিজে তায়।
সর্ব্ব লীলাময়, সর্ব্ব তীর্থোদয়,
করিলা শ্রীআঙ্গিনায়॥
সে অমৃত খনি, শ্রীঅঙ্গন-রাণী,
বক্ষে ধারণ করিলা।
তাহারি সন্ধান, জীবে দিতে দান,
পত্রিকারূপ ধরিলা॥
বন্ধুর করুণা, আঙ্গিনা বরুণা,
বহি তব দ্বারে এল।
তুমি সমাদরে, লহ তাঁরে ব'রে,
দেখিবে নয়ন মেল॥

—গোপীবন্ধু দাস

আঙ্গিনা।

শ্রীবৈষ্ণবের আজ্ঞা পাইয়া তাহা মস্তকে ধরিয়া এই লেখনী ধরিলাম। আমি ক্ষুদ্রাধম ভাল মন্দ বেশী বুঝি না। প্রাণের ফোয়ারা হইতে যা উঠে, উঠে। তাহাতে কোন অপরাধ ঘটিলে, শ্রীবৈষ্ণবেরই।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অপর এক মূর্ত্তি বা বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গ্রন্থবিগ্রহ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত। সর্ব্বযুগেই শ্রীভগবান্ মানুষ ও গ্রন্থ, এই মূর্ত্তি ধরিয়া লীলা করেন। ব্রহ্ম ও বেদ অভিন্ন, নিত্য। "শব্দরূপে ব্রহ্মণী" শাস্ত্র বাক্য। কৃষ্ণ—ব্রহ্ম, ভাগবত—বেদ। গৌর—ব্রহ্ম, চরিতামৃত—বেদ। এই হিসাবে বাইবেল কোরাণ প্রভৃতিও—বেদ। ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে বেদ ও অনুযুগ অবতীর্ণ হন। অবতার পরম্পরায় পরব্রহ্ম যেমন নিজ চমৎকার-কারিত্বের উৎকর্ষ প্রকাশ করেন, বেদও তদনুযায়ী উত্তরোত্তর চমৎকারিত্বের পরাকাষ্ঠা অভিব্যক্ত করেন। এই সমান্তর বিকাশোন্মুখ ব্রহ্ম ও বেদ অভেদসূত্রে উভয়েই "ব্রহ্ম" ইতি বাচ্য। শ্রীশ্রীমহানামের নিশান তুলিয়া এই শ্রী"আঙ্গিনা" দ্বার খুলিলেন। "আঙ্গিনা" মহোদ্ধারণ প্রভুর গ্রন্থ বিগ্রহ। "আঙ্গিনা" রূপে কাঙ্গাল প্রভুর পুণ্যাভিযান হইবে। ভক্ত-বৃন্দের প্রাণে প্রাণে নবোল্লাস বহিবে।

"আঙ্গিনা"র আবির্ভাব প্রয়োজন বিবৃত করিবার পূর্ব্বে মহোদ্ধারণ প্রভুর আবির্ভাব প্রয়োজন প্রভু নিজ কৃপা বাৎসল্যগুণে যেরূপ জানায়েন, লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

(৭।৪।গীতা)

"সৃজাম্যহম্" আত্মপ্রকাশ করি অর্থাৎ আবির্ভূত হই। "যদা যদা" দ্বারা "যত্র যত্র"ও ধ্বনিত হইতেছে। কারণ যে যে কালে ধর্ম্মের গ্লানি ঘটে, অবশ্য তাহা কোন স্থানকে আশ্রয় করিয়া ঘটে। দেশ ও কাল (space and time) নিরবচ্ছিন্ন যুক্ত থাকে। যিনি ধর্ম্মের গ্লানিরূপ ঘর্ম্ম মুছিয়া দিয়া অধর্ম্মের দাঁত ভাঙ্গিয়া দেন, তিনি শ্রীভগবানের অবতার। শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুর আবির্ভাব প্রাক্কালাবধি বঙ্গকে রঙ্গকেন্দ্র করিয়া ধর্ম্মগ্লানির পৈশাচিক তাণ্ডব এবং অধর্ম্মের ভেরিবাদ্য হইতেছে এবং তাঁহার আবির্ভাব এবং লীলাকটাক্ষে তৎ-উৎসাদনকল্পে ধর্ম্মক্ষেত্রে যে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে আলোচ্য এবং সেই গ্লানিচয়ই মহোদ্ধারণাবির্ভাবের প্রয়োজন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসংগোপনের পর যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের প্রদত্ত উপদেশনিচয় জ্ঞানপ্রধান বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সর্ব্বথা অনুকূল নয়। কারণ এসব উপদেশে "চিদ্‌বৈচিত্র লীলারস-বিশেষাশ্রিত সালোক্যাদি শুদ্ধ ভক্তিস্বরূপে ভগবদ্বরিবস্যাদি" লাভ উদ্দিষ্ট নয়। ভক্তেজ্ঞানিত্বং তু সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি শ্রুতেঃ সিদ্ধম্। সুতরাং জ্ঞান ও ভক্তির বিশেষত্ব কম। কিন্তু ভাগবতকীর্ত্তিত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রবিতরিত বিদ্যাব্রাগরসময়ী কেবলা ভক্তি সুদুর্লভা ও সর্ব্বোত্তমা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পর মহোদ্ধারণঠাকুরই কেবল সেই ভক্তিরসের নবপ্রবাহ তুলিয়াছেন।

পরব্রহ্ম—অমৃত-সাগর। তন্মথিত অমৃতপিণ্ডসার পূর্ণচন্দ্র—শ্রীভগবান্। বেদবাণী এই চন্দ্রের কৌমুদী।

সেই পূর্ণচন্দ্রের কৃপামৃত-কিরণে ফুলে ফুলে মধুরসের সঞ্চার হয়। অর্থাৎ জীবাদি তরুবল্লী প্রেমভক্তিসুধায় সিক্ত হয়। এই পূর্ণচন্দ্রই ভক্তির অবতার। ইনি জীবসত্ত্বকে ভালবাসিতে শিক্ষা দেন, ব্যবসায় শিক্ষা দেন না। "জ্ঞান-মেব কিঞ্চিদ্বিশেষাদ্ভক্তিরিতি"—অতএব মহাপুরুষগণ মধ্যে মহা-উদ্ধারণপ্রভুর একটু বিশেষত্ব আছে। অন্যান্য মহাপুরুষ বা অবতারগণের উপদেশসকল জ্ঞানের সরস পরিণাম ভক্তির বৈচিত্র্যে পৌঁছায় না। কিন্তু আমাদের মহাউদ্ধারণঠাকুর কাঙ্গালবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত প্রেম ভক্তিরাগময় সুনির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মের কালবৈগুণ্যঘটিত আবিলতা দূর করিয়া গৌর-নিতাই-গুণ গীতিকাগানে নামব্রহ্মের ও ভক্তিদেবীর জয়ঘোষণা করিয়াছেন। অতএব তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলা যায় না। কারণ মহাপ্রভুর অবতার ব্যতীত অপর কেহ মহাপ্রভুর ধর্ম্মের

সংস্কারক হইতে পারেন না এবং প্রেমদানে সমর্থ হয়েন না।

"এক আসীদ্ যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্ধা ব্যকল্পয়ৎ। চাতুর্হোত্রমভূত্তস্মিং স্তেন যজ্ঞমকল্পয়ৎ।।"

পূর্ব্বে একমাত্র যজুর্ব্বেদ ছিলেন। 'চাতুর্হোত্র যজ্ঞ সম্পাদন সৌকর্য্যার্থে ঋষি উহাকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন। অতএব চতুর্ব্বেদের মূল যজুঃ। আবার "যজুঃ" এবং "যজ্ঞ" উভয় শব্দই 'যজ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাই যজ্ঞই বেদের প্রাণ এবং যজ্ঞই বেদ। কলিতে যাগযজ্ঞ নাই। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বেদাতীত শুদ্ধরাগময়। যজ্ঞ—কাম্যকর্ম্ম। "জ্ঞান কাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড, কেবলি বিষের ভাণ্ড" (শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)।

অতএব মন্ত্রতন্ত্রের, দীক্ষামন্ত্রের বিশেষ মূল্য নাই। শিক্ষার তো কোন মন্ত্র একদম নাই। আছেন হরিনাম মহামন্ত্র—হরিনাম মহাযজ্ঞ। কিন্তু সদগুরু চিদানন্দশক্তি দিয়া অনুপ্রাণিত করিয়া থাকেন—ইহা পরম সত্য।

সাধারণ ধর্ম্মের নয়, ধর্ম্মের মণি বৈষ্ণবধর্ম্মের—রাগময় শুদ্ধ ধর্ম্মের—যিনি গ্লানি দূর করিতে সমর্থ, তিনি মহাপ্রভু সন্দেহ নাই। শ্রীমন্মহোদ্ধারণ ঠাকুরের আবির্ভাব পূর্ব্বাবধি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানি কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, দেখা যাউক্ :—

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যে হনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতরেতরেষাম্ ।।
(১২। কাঠকোপনিষৎ)

এই শ্লোকভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিলেন—"রূপং নামরূপাদ্যশুদ্ধোপাধিভেদবশেন বহুধা অনেক প্রকারং"—তিনি পরমেশ্বরের নাম ও রূপকে অশুদ্ধোপাধি বলিয়া বর্ণন করিলেন। ভাল, তাঁহার ব্যাখ্যায় উপেক্ষা করিয়া—লঘুভাগবতামৃতধৃত পদ্মপুরাণবচন গৃহীত হউক :—

"অনামরূপ এবায়ং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।"

বৈষ্ণবগণের মানিতেই হইবে পরমেশ্বরের নামও নাই, রূপও নাই। কারণ পরমেশ্বর অব্যক্ত নিরুপাধি।

কিন্তু ব্যক্ত হইলে কেমন ?—শাস্ত্রান্তরে বলেন "নাম নামী অভিন্ন।" সুতরাং নাম নিত্য। "নামের সহিত থাকেন আপনি শ্রীহরি!" অতএব নাম ও নামী ভিন্ন। এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে নাম ও নামী ভিন্ন ও অভিন্নও—অচিন্ত্যভেদাভেদ। তৎপ্রমাণ, যথা—নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়।" এতদ্দ্বারা নামীর বিশেষত্ব ধ্বনিত হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে সাধনপক্কতায় নামও নামীতে মিশে অর্থাৎ নাম ও নামীর অভেদ ঘটে।

বেদোপনিষদ্ বলেন "পরমেশ্বর অব্যক্ত।" ভাগবত তাঁহার উপরে গেলেন। কারণ, তিনি বলেন, "পরমেশ্বর নিজস্বরূপ-শক্তি দ্বারে ব্যক্ত হন। বেদোপনিষৎ বলেন, "পরমেশ্বর অরূপ"—ভাগবত বলেন, "তাঁহার রূপ অপ্রাকৃত, চিন্ময়।" বেদোপনিষৎ বলেন, "পরমেশ্বর অনাম"—ভাগবত বলেন, "তাঁহার নাম অনন্ত।" ভাগবত পুরাণাদি "অরূপ" ও "অনামের" এইরূপ ব্যাখ্যা দিলেন এবং ভাগবত দ্বারাই ব্যাসদেব পরিতৃপ্ত হইলেন।

পরমেশ্বরের স্বরূপ কীদৃশ ?—শ্রুতিবাক্য যথা—

"স্বপ্নমগনস্কমশ্রোত্রমপাণিপাদং জ্যোতির্ব্বর্জিতম্।"

ইনি মনোরহিত—ইহার চক্ষুকর্ণহস্তপদাদি নাই। "জ্যোতির্ব্বর্জিতম্। কিন্তু ইন্দ্রিয়াদিরহিতমপি জ্যোতীরূপমেব" অর্থাৎ স্বপ্রকাশরূপ। (ব্রহ্মোপনিষৎ)

কিন্তু ভাগবত বলেন কি ?—বলেন, ভগবদ্বিগ্রহের যুগপৎসর্ব্বব্যাপকত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব (সাকারতা) দামবন্ধনকালে শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মগোপালের এই দ্বিরূপত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। নন্দরাণী রজ্জুতে বেড় পাননা, (নিরাকারত্ব), আবার বেড় পাইলেন (সাকারত্ব)। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে শ্রীভগবানের দ্বিভুজ মুরলীধর চিন্ময়মূর্ত্তির কীর্ত্তন বর্ণন করিয়াছেন এবং নিজকে তন্মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রুতিগণ সাধন দ্বারা গোপীদেহ প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ-সেবাধিকার লাভ করিলেন। তথাপি ইদানীং গোস্বামিচরণগণ শ্রুতির দোহাই দিয়া বেশ কৃতিত্ব ও বিজ্ঞাবত্তা রটান এবং শ্রীনাম মহিমায় ও শ্রবণকীর্ত্তনাদ্যঙ্গসাধনের গৌরব কমাইয়া ফেলেন।—এইটি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানি। পরবর্ত্তী আচার্য্য গোস্বামিপাদগণ বেদ ও উপনিষদের আলোচনা কমাইয়া পুরাণেতিহাসাদির চর্চ্চা বেশী করিয়াছেন। কারণ পুরাণেতিহাসই প্রেমভক্তির প্রোজ্জ্বল চিত্রপট।

"ব্যাস" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা (Analysis). ভাগবত ধর্ম্মের পরিস্ফুট ব্যাখ্যা বা ব্যাস, এই ব্যাসের মূর্ত্তি ব্যাসদেব।

বৈষ্ণবগণ শ্যামরূপের ও কৃষ্ণনামের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। অথচ শ্রুতির "অরূপ" "অনাম" আবৃত্ত করিতেছেন। এই বিরুদ্ধভাবের আলোচনা এক ধর্ম্মগ্লানি নয় কি? বেদোপনিষৎ আমাদের তেমন মিত্র নয়। পুরাণ আমাদের পরম সহায়। শ্রুত্যাদির আলোচনায় প্রাণের সুধা প্রেমভক্তি দমিয়া যায়। শ্রুতিবাক্যে অভ্যস্ত হইলেই বৈষ্ণব ধর্ম্মাচার্য্য হওয়া যায় না। ঈশ্বরের যিনি অবতার তাঁহার ঈশ্বরত্বে প্রমাণ স্বতঃসিদ্ধ। শ্রুতিব্যাহৃতি দ্বারা সিদ্ধ হয় না। এবং সেই অবতার পুরুষের বাক্যই বেদ।
—"সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর-স্বরূপ।"　　(শ্রীচৈঃ চঃ)
গোপীনাথ বলিলেন—

"পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরত্ব কভু জ্ঞাত নহে।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

জীব শান্ত, সমাহিত ও ধীর হইয়া প্রজ্ঞান বৃত্তি লাভ করে। এই প্রজ্ঞান বৃত্তি ঈশ্বরের কৃপাকে আকর্ষণ করে; এবং সেই ভগবৎকৃপাগুণেই তাঁহাকে ধরা যায়। তাঁহার কৃপা হইলে তিনি ধরা দেন। চরিত্রবান্ ব্যক্তি নিরপরাধে শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা প্রজ্ঞান লাভ করে। নচেৎ ঈশ্বর মানবরূপে সাক্ষাৎ বিচরণ করিলেও জীব চিনিতে পারে না।

তস্য পুনঃ রসনং জলভূমীন্দুসম্পাত কামাদি—
কৃষ্ণায়েত্যেকং পদং গোবিন্দায়েতি দ্বিতীয়ং
গোপীজনেতি তৃতীয়ং বল্লভায়েতি তুরীয়ং
স্বাহেতি পঞ্চমমিতি জপন্ পঞ্চাঙ্গং
ভাবাভূমী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সাগ্নী তদ্রূপতয়া
ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ব্রহ্ম সম্পাদ্যতে ইতি।

(তাপনীশ্রুতিঃ)

পঞ্চব্যাহৃতিময় অষ্টাদশার্ণবৈষ্ণবমন্ত্র দ্বারা জীবের দ্যাবাভূমী, সূর্য্য, সোম ও অগ্নি এই পঞ্চাঙ্গ ব্রহ্ম লাভ হয়। এতদ্দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি সূচিত হইল। পরবর্ত্তী শ্লোকে তৎ প্রমাণ। অষ্টাদশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষার কি এই চরম ফল? যদি বলেন ব্রহ্মলাভ হয় এবং যদি বলেন—

মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা
তৎসারভূতং যদ্ যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে॥

ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা জগৎ মন্থন করিলে সারভূত শ্রীগোপাল-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। সেই ব্রহ্মজ্ঞানই মথুরা নামে অভিহিত।

তবে এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হয় ব্রহ্মজ্ঞান বিনা কৃষ্ণভক্তি অসম্ভব। কিন্তু তাহা অসম্ভব হউক, ভয় নাই—কারণ কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ ভাগবত ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।—কেবল হরি-নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনেই কৃষ্ণভক্তিসঞ্চার এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব্রহ্মজ্ঞানরূপ কঠোর ব্রতের অপেক্ষা রাখেন নাই। এ'জন্যই গৌর নিতাই পরম দয়ালাবতার। আচার্য্যগণ শ্রুতি লইয়া ব্যস্ত থাকুন, মন্ত্রতন্ত্রোপদেশ করুন; কিন্তু অপর দিকে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

(বৃহন্নারদীয়ে)

অশ্রুকম্পপুলকাদি অষ্ট সাত্ত্বিক সঞ্চার কি দীক্ষার কোন বিশিষ্ট মন্ত্র দ্বারা হয়, না মহানামজপকীর্ত্তনাদি দ্বারা হয়?

শ্রীহরির নামই সারভূত। ইহা মন্ত্র নয়, মহামন্ত্র। মহা-মন্ত্র কেন? কলিতে এই নাম ভিন্ন অন্যথা গতি নাই।—এক মাত্র মহানাম মন্ত্রেই গতি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে নাম মাহাত্ম্য এত ছিল না। কলিতেই নামশক্তি জাগ্রত হইয়াছে। যুগ ধর্ম্মের এমনি প্রভাব। ব্যাসকাশীতে মরিলে মানুষ গাধা হয়। ইহা সেই স্থানেরই ধর্ম্ম নয়। মহাদেবীর আজ্ঞাই বলবতী। তদ্রূপ কলিতে শ্রীগৌরভগবান্ করুণার ফুৎকারে নিজ নামে মহাশক্তি সুধা ভরিয়া দিয়াছেন। তাই এই কলিতে—ধন্য কলিতে—মহানাম আনন্দরসভরে নাচিয়া উঠিয়াছেন।

নামে প্রেমোদয় হয় এবং প্রেমেই ভগবৎপ্রাপ্তি। "প্রেমসে মিলে নন্দলালা"। "কর্ম্মীজ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।" সুতরাং তাহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। "পূর্ণশশধর ভেল চৈতন্য তাহায়"—"পূর্ণকুম্ভ নিত্যানন্দ"—তবে এদুই ছাড়িয়া গ্রন্থের পাতায় খুঁজি কি?—এদুইই প্রেমক্ষীরাব্ধি হইতে উত্থিত। চন্দ্র ও কলস ক্ষীরোদোত্থ। সঙ্কীর্ত্তন লইয়া গৌর-নিতাই সতত বিচরণ করিতেছেন। কারণ এখনও কলি-যুগ বিদ্যমান। তাই বলি ভক্তিসাধনপথে অন্য মন্ত্র বিশেষের প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু খোলে করতালে যোগযাগকর্ম্মকাণ্ড মন্ত্র তন্ত্র উড়াইয়া দিয়াছেন। তবে আর বেদশ্রুতির ফলশ্রুতি মানি কেন?

সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অগ্নি যদি নিভিয়া যায়, যজ্ঞ করিবার অগ্নি মিলে না। সেই রূপ জগতে ভগবৎপ্রেমের অভাব ঘটিয়াছিল। ভাগ্যক্রমে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর হৃদয়ে ইনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে উপদেশ পাওয়া যায়, কিন্তু চিদানন্দরস কেবল গুরুপরম্পরায় নামিয়া আসে। তাহা কলিতে এক মাধবেন্দ্রে ছিল। এই আনন্দচিন্ময় রস গুরুপসত্তি (গুরুপদাশ্রয়) বিনা পাইবার উপায় নাই। এ' জন্য গুরুকরণের প্রয়োজন। গুরুকৃপা করিয়া আশ্রিত জনকে কি দেন?—ঐ আনন্দ চিন্ময়-রসের ধারা বা মন্ত্র-চৈতন্য দান করেন। তিনি এক অপূর্ব্ব শক্তিসুধা পুরিয়া দেন। তাহাতে কি হয়? ভিতর অমৃতায়মান হয় এবং প্রাণে এক আনন্দোচ্ছ্বাস উপলে। গুরু কোন মন্ত্র দেন বা কেবল ঐ আনন্দচিন্ময় সুধার প্রবাহ সঞ্চার করেন?

শ্রীগোপীনাথের স্বপ্নাদেশমতে পূজারি ঠাকুর মাধবেন্দ্রকে ক্ষীর প্রসাদ দিয়া আসিলেন। প্রসাদ পাইয়া পুরী মহারাজ মৃদ্‌ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ঠিকারি বহির্ব্বাসে বাঁধিলেন এবং এক একখানি চর্ব্বণ করেন আর প্রেমপুলকে নৃত্য করেন। বলিহারি! অমৃতকেলি প্রসাদ পাইলেন মৃৎপাত্রে, সেই মৃৎপাত্রেরও প্রসাদ সংস্পর্শ গুণে এত দূর প্রভাব বর্দ্ধিল। সেইরূপ মন্ত্ররূপ ভাণ্ডে করিয়া গুরু আনন্দচিন্ময়-রস শিষ্যকে প্রদান করেন। সেই আনন্দামৃত বস্তুই সার সামগ্রী। মন্ত্র একটী ভাণ্ড মাত্র। তথাপি উহাতে সঙ্গগুণে আনন্দপ্রদ। আনন্দ চিন্ময় রস ঢুকাইয়া (Injection) দেওয়াই গুরুদীক্ষার উদ্দেশ্য। মন্ত্র তার সরঞ্জাম। অতএব মন্ত্রমাহাত্ম্য বেশী নয়। উহা ঐশ্বর্য্যময়, মোক্ষপ্রদ। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম দানে এক শ্রীহরের্ণামই সমর্থ। এজন্য "নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিতেছেন—

"এক হরি নামে সর্ব্ব পাপ হরে।
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে॥"

শ্রীমৎপরমহংসদেব মন্ত্র দীক্ষার নিন্দা করিয়াছেন। শ্রীমৎপ্রভুজগদ্বন্ধুও দীক্ষা মন্ত্রের বিরোধী। বন্ধুহরি বলিয়াছেন —"একমাত্র হরিনামই মহা-উদ্ধারণ মন্ত্র"। গৌরহরি তারক-ব্রহ্ম হরি নাম মহামন্ত্র দিয়াই জীবোদ্ধার করিয়াছেন। এক-মাত্র নাম দিয়াই শ্রীমন্নিত্যানন্দ জগামাধার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। চৈতন্য সম্পাদনের নাম দীক্ষা। দৃষ্টি দানই দীক্ষা। তাহা নামে প্রেমেই সম্পাদিত হয়। নাম জপেই প্রণবের বিকাশ হয়। "রাম", "কৃষ্ণ" ইত্যাদির অনুনাসিক-উচ্চারেই প্রণব স্ফূর্ত্তি পায়।

এই দীক্ষা মন্ত্রের প্রচার বাহুল্যই ভক্তি রাজ্যের গুরুতর গ্লানিকর। মন্ত্রদীক্ষা ও কিশোরীভজন উভয়ই তান্ত্রিক সাধনার অঙ্গ। দীক্ষামন্ত্রের প্রথাটি বিষবল্লীরূপে রোপিত হইয়াছে এবং এই লতা দেশ ছাইয়াছে। গোস্বামিপাদ গণের যে এত উচ্চ সম্মান ও পূজা, উহার মূল জাতিতে নিহিত। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া—নচেৎ এতদিনে উহারা নগণ্য হইতেন। অপর জাতীয় একজন সিদ্ধবৈষ্ণবকে কেহ পুছে না, কিন্তু মূর্খ হইয়াও গোসাঞি রাজসম্মান পান। মূর্খত্বে দোষ নাই, কিন্তু অন্ধ। তাহাদের হা করিবারও শক্তি নাই। তদ্দ্বারা জাতি পতিত, দুর্ব্বল হইতেছে। তিলকমালা লইয়া কৃপণের বিষয়ভোগ—ইহাই কি ধর্ম্মজীবন? গুরুশিষ্যসম্বন্ধ টাকার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কাঞ্চনে বিষ সৃষ্টি।

গোস্বামী-দীক্ষায় কামিনীকাঞ্চনের আরতি বড় বেশী। এই আরতির উপর শিক্ষার রতি। ইহা বাঙ্গালী হিন্দুর উৎসন্নতার মূল। জীবের এই ঘোর মলিনদশা দর্শনে জীববন্ধু প্রভু ছুটিয়া আসিলেন।

"আর দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

১২৭৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখী সীতানবমী তিথিতে প্রভু আবির্ভূত হইলেন, কারণ শ্রীভগবান্ সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং দৃঢ়ব্রত। সংকীর্ত্তনযজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতা কখন প্রকট, কখন অপ্রকটভাবে লুকোচুরি (Bo-peep) খেলিতেছেন। —ইহাতে যাহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা ধন্য।

"আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ"

(৪র্থ অধ্যায়, বেদান্তদর্শন)

আত্মা ব্রহ্ম, ইহাই উপনিষদের প্রতিপাদ্য। সুতরাং উহা দ্বারা অহংগ্রহ অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অদ্বৈত-বাদ ভক্তিপরিপন্থী। হস্তে পুরাণ, সম্মুখে অবতার-সাক্ষাৎ-কার, যাহার নাই, তিনি ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন না। মেঘ বিনা যেমন পানীয় জলের অভাব, গৌর বিনা তেমন ভক্তির অভাব।

বাবাজীর কালিয়দমন, কিশোরভজন, দাবাগ্নিমোক্ষণ, দীক্ষাবাহুল্য জন্য বিষবল্লীর উত্থান উৎসাদন এবং বৈষ্ণবের চরিত্রগঠন ইত্যাদি এবং অন্যান্য দেশ কল্যাণকর নব নব আন্দোলন সবই •শ্রীশ্রীবন্ধুহরির আবির্ভাব বিক্ষেপ। "অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌররায়।—"বচন কভু মিথ্যা নয়, দেশময় ধর্ম্মযুদ্ধের আন্দোলন উঠিয়াছে।

'প্রকাশ বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান॥' (শ্রীচৈঃ চঃ)

যাহার এই তিন রূপ প্রকাশ তাঁহার স্বরূপ কি ?—তিনি সংকীর্ত্তনযজ্ঞে নিজ স্বরূপে প্রকাশ পান, সুতরাং তাঁহাকে ধরিবার জন্য বেদবিধি পূজার ঘটা বৃথা। মন্ত্র দ্বারা নানা সিদ্ধি সংলব্ধ হয় বটে; কিন্তু গোপিকার লব্ধ সিদ্ধিই শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধি। তাহা বেদবিধি ও মন্ত্রবলে হয় নাই —কেবল ভালবাসা দ্বারা। শ্রীশ্রীবন্ধুহরি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রদর্শিত এই উত্তম পদ্ধতিরই ঘোর জঙ্গল অপসারিত করিতেছেন। গোস্বামিপাদগণ রাগধর্ম্মের চরণে বিধির নিগড় জড়াইয়া দিতেছেন। তাঁহারা পূজোপকরণ ও পিতলের বাসনের ঠক্‌ঠাক অনেক বাড়াইয়াছেন। ব্যবসায়ের জাল এখন জগদ্‌বেড় হইয়াছে। "গো" শব্দে বেদ বুঝায়। কলির বেদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। এই শ্রীগ্রন্থে যিনি উত্তমাধিকারী, তিনিই গোস্বামী।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মেরনির্ম্মলতা রক্ষাকল্পে, দোষাপনোদন-মানসে যে মহাবতারী ধরায় অবতরণ করিয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীহরিপুরুষের অতুল অমূল্য উপদেশ ও জীবশিক্ষানুকূল অতুল অমূল্য উপদেশ জনসমাজে সুপ্রচারোদ্দেশে মহাযজ্ঞস্থলীর "আঙ্গিনা" দ্বার উন্মুক্ত হইল।

মানুষদেহে যিনি গোপী হইয়াছেন, তিনিই আদর্শবৈষ্ণব। সুতরাং বুঝিতে হইবে, পুরুষ দেহীর মেয়ে হওয়া সহজ নয়। যিনি বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহার মধ্যেও "আমি পুরুষ" এই বুদ্ধি অবসর মতে উকি দেয় বস্ত্র হরণ না হইলে অর্থাৎ পুং স্ত্রীভেদজ্ঞান দূর না হইলে গোপী হওয়া যায় না। এখন দেখা যায় উদাসীন বৈষ্ণবে ধাম ও দেশ ছাইয়াছে। কাম থাকিতে ধাম ও রাম মিলে কি ? বৈষ্ণব কাচ ধরিয়া সমাজ ধ্বংস করার ও শঙ্কর ভুলিয়া সঙ্করোৎপত্তির প্রথা নিবারণ করিতে জগদ্বন্ধু রথ হইতে ভূমিতে নামিয়াছেন এবং "আঙ্গিনায়" নৃত্য করিতেছেন। আপনারা এই মধুর নর্ত্তনলীলা দর্শন করুন্—প্রভুর গলিত কাঞ্চনমূর্ত্তি ক্ষরিত সুধারস পান করুন্।

জয়নিতাই ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথ অদ্যাপি ভেক গ্রহণ করেন নাই, অথচ সতত প্রেমময়, ভাববিভোর। তথাকথিত ভেকধারীর সংখ্যা এত বেশী হওয়াই কলঙ্কসূচক। এই কলঙ্কাপনোদন করিতে "আঙ্গিনার" উদয়।

গোস্বামিপাদগণ যারে তারে ধরিয়া ব্রজের রাগভজনোপদেশ দিয়া প্রমদাকৃতির চিত্র প্রদান করিতেছেন। ঈদৃশী মন্ত্র দীক্ষার সংকোচ সাধন ভিন্ন বৈষ্ণব সমাজের চরিত্র-নির্ম্মলতা সুরক্ষিত হইবার আশা নাই। বৈষ্ণবসমাজ সমগ্র হিন্দুসমাজে চরিত্রহীনতা দোষে অতি ঘৃণিত। লোকগুলি মহাপুরুষাশ্রয় না করিয়া বহু বহু কৃত্রিম গোসাঞির আনুগত্য গ্রহণ করিতেছে এবং পাপপ্রলোভনে পড়িয়া নিরয়গামী হইতেছে। তাহা হইতে মানবসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীশ্রীবন্ধুহরির আবির্ভাব। তাঁহারই শ্রীচরণচুম্বিত পুণ্যধাম শ্রীঅঙ্গন। "আঙ্গিনা" শ্রীধামের মুখপাত্রিকা। এই শ্রীপত্রিকাবল্লী অমৃত ফলোৎপাদন করিয়া নিখিল জীবকুলের পরিতোষ বিধান করুক।

মদ্‌গুরু জয়নিতাই শ্রীশ্রীদেবেন্দ্রনাথ, সুধীভক্ত শ্রীমদতুলকৃষ্ণ চম্পটী মহাশয়, শ্রীশ্রীপ্রেমানন্দ ভারতী এবং অরুণাচলোদিতারুণ শ্রীশ্রীদয়ানন্দ, যে বন্ধুহরির পাদপদ্ম শরণ লইয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন, সেই কনকবিগ্রহ বন্ধু হরির সাক্ষাদ্দর্শন সুখানুভব করিয়া আমি জীবাধম যা বুঝিবার বুঝিয়াছি। অলমতি বিস্তরেণ ইতি—

দীনকাঙ্গাল শ্রীকালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর।
হাঁসাড়া, ঢাকা।

"আঙ্গিনা রাণী"

জয়রে জয়রে ধাম
পূত পুরী সম্রাজ্ঞী মোহিনী।
মহারাসস্থলী মণ্ডলী নেতৃকা
ভাবমাধুর্য্য শিশু গন্ধাবরণী॥
শ্রীবৈভববিলাস থর্ব্বকারিণী
শাশ্বতী বৈকুণ্ঠ কুণ্ঠাবিবর্দ্ধিনী।
পরা গোলোক মহিষী মরম মানসী
প্রেমলীলামৃত রসতরঙ্গিনী॥
গৌড়মণি মৈনাক শিখরিণী
নদীয়া মাধুরী চমৎকারিণী।
চিরপাবনী প্রকট গোয়ালচামট
রসিকেন্দ্র বন্ধু বিলাসভাগিনী॥
মহানাম মঙ্গলা রাগরঞ্জিনী
শ্রীআঙ্গিনা রঙ্গিণী গরবিণী।
স্বর্ণলতিকা কল্যাণী প্রেমপ্রদায়িনী
অয়ি শিশুবালা-সখী প্রমোদিনী॥

মহানামভিক্ষু দীন।

জন্ম-রহস্য।

—:•:—

"শ্রুত আছি, ১২৭৮ সনের বৈশাখ মাসের সীতানবমী তিথির শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে পুষ্পাবন্ত-যোগে অভিন্না শচীমাতা বামাদেবী যখন আত্মস্থা হইলেন, তখন অমিয়-নিমাই-গৌরহরি পূর্ব্ব অঙ্গীকার রক্ষার্থ এবং অনর্পিত প্রেম বিতরণ করিবার জন্য গাভীর অশ্রু ও চন্দ্রের সুধা আশ্রয় করতঃ তাহার মেরুদণ্ডাশ্রিত সুষুম্নাদি ত্রিতন্ত্র-বিরাজিত হৃদয়-সরোজ বিকশিত করিয়া পীতবর্ণ পঞ্চতত্ত্বময় শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুরূপে আবির্ভূত হইলেন॥"

—জগদ্‌গুরু॥

শ্রীমহানাম-মধু-ভাষ্য।

(জন্মরহস্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।)

শ্রীবন্ধুপদকমলং হৃদয়ে নিধায়
শ্রীগুরুপদবন্দনং শিরসা বিধায়।
নিগূঢ় জন্মরহস্য সুখাববোধায়
শক্তিং যাচে দেহি নাথ! চরণাশ্রিতায়॥

১২৭৮ সনঃ—বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশ (খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দী) বঙ্গীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে (খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দী) শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর আবির্ভূত হন। তাঁহার শুভাগমনের পর কলিযুগে পরমায়ু আর পঞ্চ সহস্র মাস মাত্র অবশেষ রহিল। একথা শ্রীহরিকথা গ্রন্থে শ্রীশ্রীপ্রভু সংকেতে লিখিয়া জানাইয়াছেন, যথা,—"কলি সংখ্যা পূর্ণ বটে, পঞ্চ সহস্র মাহে বটে, এই মাত্র সংখ্যা বটে।" পঞ্চ সহস্র মাস বা চারি শত ষোল বৎসর আট মাস মাত্র। অর্থাৎ বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর (খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর) শেষার্দ্ধে কলিযুগ শেষ হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুবন্ধু কলি-যুগের আয়ু আর অতি অল্প মাত্র অবশেষ দেখিয়া সমাগত সত্যযুগের সঙ্গে কলির সংঘর্ষ কালে ভীষণ মহাপ্রলয় আশঙ্কা করতঃ, তাহার কবল হইতে জগৎ রক্ষা করিবার জন্য ১২৭৮ সনে ধরাধামে অবতরণ করেন। তথাহি শ্রীহরিকথায়াং—
"ঐঐ প্রলয় হয় ভ ভ ভয় কর"

সীতানবমী—শ্রীশ্রীরামলীলায় মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-স্বরূপিনী জনকদুহিতা সীতার জন্মের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য-বশতঃ নবমী না বলিয়া সীতা শব্দটী দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন। সীতাদেবী অযোনিজাতা, যজ্ঞভূমি হইতে উৎপন্না। পুণ্যময়ী নবমী তিথির এইটি মহাগৌরব। সীতা-রামকে বুকে লইয়া গৌরবে নবমী তিথি নিজেকে সকল তিথির রাণী ভাবিয়া গর্ব্বানুভব করিতেছিলেন। হঠাৎ দোল-পূর্ণিমার ভাগ্য দেখিয়া অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া সে কত না কাঁদিয়াছে। আজ চারিশত বৎসর ধরিয়া সে কত না আক্ষেপ করিয়া বিলাপ করিতেছে? হা দেব! শ্রীরামা-বতারে আমাকে এত আব্দার দিয়া এত অধিকার দিয়া আজ কেন এমন করিয়া বঞ্চিত করিলে? আহা পূর্ণিমার এত ভাগ্য! দুই তনু এক হইয়া তুমি পূর্ণিমাকে ধন্য করিলে! হা

নাথ! আমাকে কৃতার্থ কর করুণাকটাক্ষপাতে আবার আমাকে ধন্য কর। আবার কবে ভাগ্য প্রসন্ন হইবে, ভাবিয়া ভাবিয়া নবমীদেবী এই সুদীর্ঘ কাল কত না কাঁদিতেছে। দয়াময় আজ তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন। পূর্ণিমা হইতেও অধিকতর সৌভাগ্য তাহাকে দান করিবার জন্য একাধারে পঞ্চতত্ব লইয়া আজ শ্রীনবমীতে উদয় হইবেন। সেই পূর্ব্ব পরিচিতা গৌরবময়ী নবমী তিথির অন্তর্নিহিত বিশেষত্ব স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে সুরসিক গ্রন্থকার শুধু নবমী না বলিয়া "সীতানবমী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"অভিন্না শচীমাতা বামাদেবী"।

শ্রীশ্রীপ্রভু আমার লীলারসরাজ। শ্রীশ্রীগোলোকধামে তিনি একক। সেখানে পিতা মাতা সখাসখী কেহই নাই। সেখানে কি আনন্দে যে তিনি ছিলেন জগজ্জীবের কাছে তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ভক্ত তাই গাহিয়াছেন—

'নিত্যে যখন ছিলে গো গুপ্ত সুপ্ত ছিলে কি জাগ্রত।
জানিতে পারেনি জগতের জীব হয়ে কৈতব নির্হত।"

একা একা থাকা ভাল লাগে না। এক তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন। 'একোহহং বহুস্যামিতি' (শ্রুতিঃ)। ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই অমৃতবৃষ্টি হইল। সেই বৃষ্টিতে লীলা ধাম ফুটিয়া উঠিল। এক তনু দুই হইল। রসগোরা ও নিতাইচাঁদ-রূপে প্রকাশ হইলেন। তথাহি শ্রীপ্রেমপাতমাধুর্য্যবিন্দৌ শ্রীল শিশুরাজেন—

"প্রথম অমৃত বৃষ্টি—রস গৌরা
ধ্রুবতারা নিতাই ভাব নিছনি।"

অমৃত তিনি দুই ভাগ হইলেন'—রস আর ভাব। রসময় গোরা আর ভাবময় নিতাই। নিত্য ধামে গৌরলীলা প্রকাশ হইল। এইরূপে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় লীলার দ্বিতীয় তৃতীয় স্তর প্রকাশ হইল। আপনাকেই আপনি আস্বাদন করিবার জন্য কত না কৌশলকলা বিস্তার করিলেন। ললিতা বিশাখা লইয়া নন্দলালা মহারাসে মজিয়া রহিলেন। অমৃত বৃষ্টির প্লাবনে গোলোক ভরিয়া গেল। প্রপঞ্চের দেশেও দুই এক ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল। বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত ধাম গড়িয়া উঠিল। নিত্য আজ জীবের গোচরে সত্য হইল। নিত্যের দেশের রাধা কৃষ্ণ আজ লীলায় আসিলেন। সর্ব্ব-রসাধার স্বীয় অঙ্গ হইতে বাৎসল্যাদি রসের মূর্ত্তি কতশত পুতুল গড়িয়া লীলার সঙ্গী করিয়া লইলেন। পিতৃ শান্ত ভাবের মূর্ত্ত বিগ্রহ নন্দমহারাজ ও মাতৃবাৎসল্যভাবের পূর্ণ প্রতিমা যশোমতী ধনিষ্ঠা পৌর্ণমাসী কৃত্তিকা—সকলকে আগে পাঠাইলেন। পরে সখ্য ও মধুর রসের সখা ও কান্তাগণকে লইয়া সর্ব্ব জীবগোচর হইলেন। মাঠে ঘাটে যমুনাতটে কতরঙ্গের খেলা খেলাইয়া মায়ের কোলে সর নবনী ছড়াইয়া সখাগণের কাঁধে হেলিয়া দুলিয়া গোপবালার হৃদয়ে প্রেমের প্রবাহ ছুটাইয়া দিয়া রসময় আড়ালে লুকাইলেন। কে জানে কোন্ জগতের ভাগ্যাকাশে উদয় হইয়া আবার অভিনয় করিতে লাগিলেন? অনন্ত জগতে নিত্য লীলা অনন্তকাল চলিতেছে। আবির্ভাব ও তিরোভাব জীবের চক্ষে যোগমায়ার আবরণে ভোজের বাজীর মত বিস্ময়কর।

পাঁচ হাজার বছর কাটিয়া গেল। ১৪০৭ শকের দোল-পূর্ণিমায় নিত্য ধামের দ্বিতীয় পর্দ্দাখানা সরাইয়া দিয়া সেই চির পুরাতন নবীনরূপে প্রকাশ হইলেন। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর এই পঞ্চ রসের খেলাধুলা প্রথম দৃশ্যে জগতকে দেখাইয়াছেন, আজ শুধু মধুর রস হইয়া মূর্ত্ত মধু-বিগ্রহ প্রকট হইলেন। আজ মধুর রসকেই পঞ্চ ভাবে আস্বাদন করিবেন। মধুর শান্ত, মধুর দাস্য, মধুর বাৎসল্য, মধুর সখ্য ও মধুর মধুর। স্বরূপাদি মধুর রসাধিকারী ভক্ত-গণকে লইয়া পরে আসিবেন। আগে মধুর পিতৃ বাৎসল্যময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশচীদেবীকে পাঠাইলেন। অধিকার অনুযায়ী পরিকরগণকে কাহাকেও পূর্ব্বে কাহাকেও পরে পাঠাইয়া রসের তনু গৌররবি প্রেমের মূর্ত্তি অনন্ত ভাবময় নিতাইচাঁদকে লইয়া গৌড়দেশে উদয় হইলেন। তথাহি শ্রীচরিতামৃতে শ্রীলকৃষ্ণদাসেন :—

"গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ"

তথাহি শ্রীমহানাম-গ্রন্থে শ্রীশিশুরাজেন :—

"দুটী বাহু তুলে ভাই নিতাই সনে ডোর কৌপীন পরি।
সন্ন্যাসীর বেশে হরি ব'লে হরি নাচিলে ব্রহ্মাণ্ড ভরি'।"

নদীয়ায় প্রেমের হাট বসাইয়া গম্ভীরায় রসের উৎস ছুটাইয়া বৃন্দাবনের রসকেলিবার্ত্তা পুনরুজ্জীবিত করিয়া ৪৮ বৎসর বয়সে জীবনয়নের অগোচর হইলেন। নিত্যের লীল

নিত্যে চলিতে লাগিল। কোন্ অজানা দেশের পুণ্যাকাশে সে প্রেমের রবি দশ দিশি উজ্জ্বল করিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল, স্থূলবুদ্ধি মানব তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া জন্ম কর্ম্ম আবির্ভাব তিরোভাব লইয়া বাদানুবাদ করিতে লাগিল।

তথাহি শ্রীগীতায়াং—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতো মহেশ্বরম্।"

নিত্যলীলার দ্বিতীয় তৃতীয় দৃশ্য জগদক্ষে অভিনীত হইল। আপন জনের সহিত খেলাধুলা করিয়া রসরাস পরিতৃপ্ত হইলেন না। তথাহি শ্রীচন্দ্রপাতাখ্য মহাউদ্ধারণ-গ্রন্থে—

"রাধাকৃষ্ণ ধাম তৃষ্ণ প্রয়াস পাবন।"

অন্বয়ার্থঃ। শ্রীশ্রীরাধা, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীধাম—কাহারও তৃষ্ণা মিটিল না। সবাই সতৃষ্ণ। নিকুঞ্জের প্রেমের খেলা, গম্ভীরার গুপ্ত লীলা সর্ব্বত্রই রাগের অমিয় ধারা। কিন্তু জীব জগৎ অন্ধ। বহির্ম্মুখ জীব তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইল না। আজ নিখিল জীব জগতের অনুপরমাণুকে পর্য্যন্ত আপন জন করিয়া প্রেমের বুকে তুলিয়া লইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তৃষ্ণ। হ্লাদিনীর সারভূতা মহাভাবময়ী শ্রীমতী অনন্ত জীবের বহির্ম্মুখীনতা ঘুচাইয়া প্রাণদয়িতের প্রেমের সেবার অধিকারী করিয়া দিতে সতত সতৃষ্ণ। শ্রীশ্রীধাম গোলোকেই নিত্য গুপ্ত না রহিয়া, বৃন্দাবন নবদ্বীপেই লুপ্ত না রহিয়া ঘাটে ঘাটে যমুনা বহাইয়া হৃদয়ে হৃদয়ে গোলোক ফুটাইয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িতে সতত সতৃষ্ণ। এই তিনের তৃষ্ণা বা স্বরূপা ইচ্ছাশক্তির প্রয়াস বা প্রচেষ্টাই পাবনলীলা বা উদ্ধারণ লীলার মূলসূত্র। তথাহি শ্রীহরিকথায়াং—

"বৃন্দা নাচে চন্দ্রা গায় ললিতা বাজায়।
বন্ধু বুধ কার্য্য সিদ্ধি উদ্ধারণ চায়॥"

সেই কার্য্যসিদ্ধি উদ্ধারণ হইল কই? তাই আজ পতিত-পাবনের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। নিত্যের দ্বার খুলিয়া গেল। অনন্ত রহস্যের অর্গল ভাঙ্গিয়া গেল, পতিতের দুয়ারে পতিত-পাবন গড়াইয়া পড়িলেন। তথাহি শ্রীলীলাবৈচিত্র্য কবিতায়াং শ্রীল শিশুরাজেন—

"পাবন করিছে পতিতের আরতি।
অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব পরকাশি॥"

জীব তাহাকে ধরিতে পারিল না দেখিয়া আজ ইচ্ছাময় স্বেচ্ছায় ধূলায় নামিলেন। ঐ যে "কি ভয়রে" বলিয়া অভয় বাণী শুনাইতে শুনাইতে একক সর্ব্বময় তিনি ছুটিয়া আসিলেন, মধুর ভাবের রস ছানিয়া গম্ভীরায় ছড়াছড়ি করিয়াছেন; আজ দুগ্ধপুরে সুকর্পূর মিলাইয়া মধুর মধুর রস অধিকতর ঘনীভূত করিয়া সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্ত পঞ্চভাবে সেই রসমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে আসিলেন। মধুর মধুর শান্ত-রসমাধুরী মধুর মধুর দাস্য রসমাধুরী, মধুর মধুর বাৎসল্য রসমাধুরী, মধুর মধুর সখ্যরস মাধুরী, মধুর মধুর মধুর রস-মাধুরী। মহামহারসরাসেশ্বরের এই অন্তর্নিহিত সুক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম নিরুপম সুধাধার জগজ্জীবকে দিবার জন্য জগৎস্বামী কাঁদিতে লাগিলেন। আগে মধুর মধুর পিতৃশান্ত ভাব বিগ্রহ শ্রীশ্রীদীননাথ ও মধুর মধুর মাতৃ বাৎসল্য রসসিন্ধুর প্রকট প্রতিমা শ্রীশ্রীবামাদেবী প্রকাশ হইলেন। এই দীননাথ-বামাদেবী, জগন্নাথ-শচীদেবী, নন্দ-যশোমতী—স্বরূপতঃ এক। রসাস্বাদনের অধিকার-তত্ত্ব-বিচারে পৃথক্। বাৎসল্যরসময়ী যশোমতী সেদিন মধুর বাৎসল্যে শচীদেবী হইয়াছিলেন। আজ মধুর মধুর বাৎসল্যরস-মাধুর্য্যে বামাদেবী হইয়াছেন, অভিন্না শচীমাতা বামাদেবী ইত্যাকার মহারহস্য ভাবব্যঞ্জক শব্দ প্রয়োগ করতঃ, অভিন্না এই নঞ সমাসবদ্ধ পদ রচনা করিয়া তত্ত্বরসিক গ্রন্থকার উভয়ের ভেদ ও অভেদ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তত্ত্বতঃ বিভিন্নতা থাকিলেও স্বরূপতঃ ভেদ নাই, এই পরম নিগূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত করিবার জন্যই অভিন্না পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। অন্যথা সর্ব্বতোভাবে অভেদ হইলে শচীমাতা-বামাদেবী এইরূপ অভেদ কর্ম্মধারয় করিলেই হরিহর শব্দবৎ কার্য্যসিদ্ধি হইত। অতএব ভেদাভেদ প্রকাশই অভিন্না পদ প্রয়োগের তাৎপর্য্য, ইহাতে সংশয়মাত্র নাই। বাষ্প মেঘ তুষার রামধনু যেরূপ স্বরূপতঃ একই জলের রূপান্তর মাত্র হইয়াও শোভা সৌন্দর্য্য ও শক্তি-তত্ত্বে বহুল ভেদবিশিষ্ট; তদ্রূপ অভেদ হইয়াও ভেদবিশিষ্ট, ইহাই জানাইবার জন্য অভিন্না বলা হইয়াছে। তৎসদৃশ তদন্যত্বই এ স্থলে নঞ পদের অর্থ বুঝিতে হইবে।

"যখন আত্মস্থা হইলেন"

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা।" যোগমায়া পৌর্ণমাসীদেবীর একখানি রহস্যময় আবরণ আছে। সেই

আবরণই এই সর্ব্বোত্তম লীলার মাধুর্য্যাস্বাদনের প্রধান সহায়ক। স্বীয় অন্তর্নিহিত অনন্ত রস আস্বাদন করিবার জন্যই শ্রীহরি লীলায় আসেন। উপাদেয় বহুবিধ আহার্য্য বস্তু প্রস্তুত থাকিলেও, যেমন রসজ্ঞ পরিবেশক না হইলে ভোজনে তৃপ্তি হয় না, পরিবেশনের ক্রম, পরিবেশনের পরিমাণ ও পরিবেশকের সুমিষ্ট ব্যবহার ফলেই যেমন আহারের পরিতৃপ্তি হয়, তেমন পৌর্ণমাসী দেবী যে পর্দ্দাখানার আবরণে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে রহস্য উদ্ঘাটন করতঃ অনন্ত রসমাধুর্য্যের এক একটি ধীরে ধীরে সময়োপযোগী ভাবে লীলারসরাজ শ্রীহরির সম্মুখে প্রকাশ করেন, তাহারই ফলে নরলীলা এত মাধুর্য্যময় হইয়া উঠে। ইচ্ছাময় অনন্ত শক্তিময় হইলেও পৌর্ণমাসীর হাতের পুতুল। একহাতে ভক্ত আর একহাতে ভগবান্ লইয়া দেবী অনন্তকাল এক মজার খেলা খেলাইতেছেন। 'আমিহ না জানি না জানে গোপীগণ' ভক্তও জানেন না, ভগবানও জানেন না। যোগমায়াদেবী আড়ালে রহিয়া কত না ছাঁদে উভয়কে নাচাইতে থাকেন!—

সর্ব্বোত্তমত্বে ইহাই হেতু। অখিল বিশ্বপতি যোগমায়ার হাতে নাচেন, নরলীলার এই রহস্য। লীলার পরিকরগণ সকলেই আপনাভোলা। গোপালের মুখে মাটী গিয়াছে। যশোমতী 'হারে গোপালরে কি খেয়েছিস্' বলিয়া ফেলিতে গেলে গোপাল হাঁ করিলেন। মা দেখিলেন বিরাট বিশ্ব গোপালের মুখের মধ্যে, স্থাবর-জঙ্গম অন্তরীক্ষ, দিক্‌সকল, কত সিদ্ধ বিদ্যাধর, কত যোগীঋষি, তপস্বী নদী অরণ্যানী, কত চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র, সব গোপালের মুখের মধ্যে বিরাজমান। এক মুহূর্ত্তে মা ভাবিলেন, এ কি! একি স্বপ্ন, না আমার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, না কি গোপালেরই কোন অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য। অহো! গোপাল তবে মানুষ নয়। তবে কি নারায়ণ!! দুর্ব্বিভাব্য তত্ত্ব ভাবিতে ভাবিতে 'প্রণতাস্মিতৎপদং' বলিয়া জননী প্রণতা হইলেন। যোগেশ্বর অমনি যোগমায়াকে ইঙ্গিত করিলেন। অমনি "বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ" অমনি "প্রবৃদ্ধ স্নেহকলিল হৃদয়াসীৎ যথা পুরা।" যেমন ছিলেন তেমন হইলেন।

"ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মান মাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্॥"

চাঁদবদনে শত শত চুম্বন করতঃ বুকে তুলিয়া লইলেন।

এই যে মুহূর্ত্তে মনে হওয়া আর মুহূর্ত্তে ভুলিয়া যাওয়া, ইহাই লীলার রসব্যঞ্জক। যোগমায়াদেবীর এই ক্রিয়াকৌশলেই সর্ব্ববিধ রস আস্বাদনীয় হয়। পৌর্ণমাসী যখন পর্দ্দাখানা একটু সরাইয়া দেন, ভক্ত ভগবান্ তখন কোথায় যেন ডুবিয়া যায়, ডুবিয়া গেলে আর লীলা হয় না, দেবী তাই অমনি আবরণখানি টানিয়া দেন, ভক্ত তখন ভাসিয়া উঠে। উচ্ছলিত মধুসিন্ধুর তরঙ্গরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া ভক্ত ভগবানের গলাটি জড়াইয়া প্রেমের খেলা খেলাইতে থাকে। এই ডোবা অবস্থাকেই আত্মস্থ ভাব বলে।

মুর্শীদাবাদ বাংলার প্রাচীন রাজধানী। তথা শ্রীহস্তলিখিত আত্মপরিচয়ে "মুর্শীধাভাধ্ রাঝ্।" পতিতপাবনী সুরধুনী পশ্চিম দিক্ বিধৌত করতঃ কত না অতীত গাঁথা গাহিতে গাহিতে বীচিমালা সহ হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। গঙ্গার দুই কুলের কত না শোভা! পূর্ব্বতীরে নবাবের রাজধানী, পশ্চিমতীরে শ্রীশ্রীডাহাপাড়াধাম। শ্রীদীননাথ বঙ্গাধিকারীর সভাপণ্ডিত। বামাদেবী সহ ডাহাপাড়ায় অবস্থান করেন।

সাধারণ মানুষের মত আচার ব্যবহার বাহ্যতঃ পরিদৃষ্ট হইলেও তাহারা যে-সাধারণ জীব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরণের, তাহা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ব্যতীত বুঝিবার সাধ্য কোথায়? গঙ্গার তীরে অনতিদূরে দুই জনে বাস করেন। দীননাথ ন্যায়ের পণ্ডিত। ভাগবত-শাস্ত্রে প্রগাঢ় রতি। সকালে বিকালে চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণ সহ অধ্যাপনা করেন। মধ্যাহ্নে ও রাত্রে নিজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতা একজন মাত্র, তিনি পতিপ্রাণা বামাদেবী! নন্দদুলাল গোপালের কথা গাথা শুনিতে শুনিতে দেবী আবিষ্ট হইয়া নয়নজলে ভাসিতে থাকেন। কত ভাব, কত স্মৃতি, কত কল্পনা পর পর হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে কোন্ যেন এক স্বপ্নরাজ্যে লইয়া যায়। কখনও ননী চুরি করিয়া প্রতিবেশীর ঘরে উৎপাত করিয়াছে বলিয়া দড়ী লইয়া বাঁধিতে যান, অমনি "চৌর্য্য বিশঙ্কিতেক্ষণং" পুত্রমুখ দর্শন করিয়া স্নেহবশতঃ কোলে লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করেন। কখনও সরনবনী অঞ্চলে বাঁধিয়া, কখন গোঠের খেলা খেলিয়া নীলমণি আমার ঘরে ফিরিবে ভাবিয়া স্নেহসিক্তনেত্রে সহস্রবার পথপানে তাকাইতে থাকেন।

হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কে দেখিল ভাবিয়া আত্মসম্বরণ করেন।

'নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো নশ্রীরপ্যঙ্গ সংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাং॥'

—শ্লোক শুনিয়া দেবী কপালে করাঘাত করেন। কখনও 'কৃষ্ণ কৃষ্ণারবিন্দাক্ষ তাত এহি স্তনং পিব' বলিয়া ডাকিতে থাকেন।

'অহো ভাগ্যং অহো ভাগ্যং নন্দ গোপ ব্রজৌকসাং,
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণব্রহ্ম সনাতনং।'

—পড়িতে পড়িতে ধীরাগ্রগণ্য দীননাথও অস্থির হইয়া পড়েন। কখনও স্বপ্ন দেখেন গোপালকে বুকে চাপিয়া শুইয়া আছেন। ঠাকুর ঘরে গিয়া পূজায় বসিয়া 'নন্দ কিমকরোৎ ব্রহ্মণ্ শ্রেয় এব মহোদয়' ভাবিতে ভাবিতে চোখের জলেই কার্য্য শেষ করেন, মুখে মন্ত্র উচ্চারণ হয় না। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে "সত্যব্রতং সত্যাপরং ত্রিসত্যং সত্যস্যযোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে। সত্যস্য সত্যামৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ"—পড়িতে পড়িতে শয্যা ত্যাগ করিয়া দীননাথ বামাদেবীকে ডাকিয়া তোলেন। উভয়ে গঙ্গার ঘাটে স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনা করেন। হরিকথা ছাড়া অন্য কথা আলোচনা নাই, ভাগবত ছাড়া আন চিন্তা নাই। আজ কৃষ্ণ কথা বলিতে বলিতে উভয়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। হঠাৎ শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উভয়ে কৃষ্ণকথা বলিতে লাগিলেন। আর ঘুম হইল না।

রাত্রি শেষ হইয়াছে। শুক্লানবমীর চন্দ্রকলা পশ্চিমাকাশে ডুবু ডুবু হইয়াছে। দিক্‌সকল প্রসন্ন হইয়াছে। পূবাকাশ অরুণরাগে ঈষৎ রঞ্জিত হইয়াছে। আজ জগতের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের দিন। বনরাজি পুষ্পস্তবকে পরিপূর্ণ হইয়াছে! প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী কমল দলে শোভাময়ী হইয়াছে। পদ্মগন্ধে ভরপুর হইয়া সুখস্পর্শ মলয় মারুত মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া কোন্ এক মঙ্গলবার্ত্তা যেন দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া দিতেছে। চাঁদ সূর্য্য দেখাদেখি হয় হয়। দুইদিকে হিঙ্গুল মাখাইয়া প্রকৃতিদেবী গঙ্গার তরঙ্গে রঙ্গে গগিয়া পড়িয়াছেন। দুটী পাঁচটী উজ্জ্বল তারকা শুভযোগের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। মেষে সূর্য্যদেব, তুঙ্গে গুরুদেব, ধরণী সুপ্রসন্না এমন সময়ে গঙ্গার ঘাটে আর্দ্রবসনে দীননাথ ও বামাদেবী। উভয়ে আত্মস্থ।

'অমিয় নিমাই গৌরহরি পূর্ব্ব অঙ্গীকার রক্ষার্থ'

'কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে তাঁরে তারে ভজে তৈছে॥'

শ্রীগীতায় অর্জ্জুনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।' পুত্ররূপে তাহাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, পৃশ্নি আর সুতপা। ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর অধিকার দিতে দিতে তাহাদিগকে ব্রজরসের অধিকারী করিলেন। 'ন পারয়েহহং' বলিয়া ভক্তের ভক্তির দ্বারে চিরবাঁধা রহিয়াছেন। গৌররূপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচারিত হবে মোর নাম।"

শচীমাতাকে সান্ত্বনা দিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন,—

"আরও দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে।"

বিরহাকুল ভক্তগণকে কহিয়াছেন,—

"এই মত আরও আছে দুই অবতার
কীর্ত্তন আনন্দরূপ হইবে আমার।
তাহাতেও তুমি সব এই মত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবে মহাসুখে আমা সঙ্গে।"

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল কথা এককালে মনে উদয় হইল। জীবজগৎকে প্রেম দান করিতেই হইবে। 'আমা বিনু অন্যে নারে ব্রজ প্রেম দিতে।' পাপতাপক্লিষ্ট জীবের পাপতাপ কালিমা ধুইয়া মুছিয়া অমূল্য প্রেমধনে ধনী করিতে অধিকার তো আর কাহারও নাই! এবার ব্রজপ্রেমদানে সকলকে ধন্য করিব। "ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত।" এবার আর কাহাকেও বাকী রাখিব না। বাৎসল্যময়ী জননীর নিকটেও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। প্রিয় ভক্তগণের কাছেও অঙ্গীকার আছে। ঋণ দেনা প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকার সব এক কালে মনে হইল। দেনার দায়ে দায়বদ্ধ হইয়া লীলারসরাজ ধার শোধিতে আসিলেন।

"বন্ধু বলে খত লিখিলে ধার শোধিতে এলে তাই॥"

"গাভীর অশ্রু চাঁদের সুধা"

"ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ।
গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখীখিন্না রুদন্তী করুণং বিভোঃ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং স্বমবোচত ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত)

অসুরের অত্যাচারে পাপভারাক্রান্তা ধরিত্রী প্রপীড়িতা হইয়া গোরূপ ধারণ করতঃ খিন্না ও অশ্রুমুখী হইয়া ব্রহ্মার সমীপে আপনার বিপদকাহিনী নিবেদন করিয়াছিলেন। দেবগণকে সম্বোধন করিয়া পৃথিবী কহিলেন—

"তদ্ভূরিভারপীড়ার্ত্তা নশক্লোম্যমরেশ্বরাঃ
বিভর্ত্তুমাত্মানমহমিতি বিজ্ঞাপয়ামি বঃ।
ক্রিয়তাং তন্মহাভাগা মম ভারাবতারণং।
যথা রসাতলং নাহং গচ্ছেয়মতিবিহ্বলা ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ)

হে দেবগণ, তোমরা আমাকে রক্ষা কর; আমি যেন ভারাক্রান্ত হইয়া রসাতলগামী না হই। দেবগণ সহ ব্রহ্মার প্রার্থনায় গোলোকবিহারীর আসন টলিয়াছিল। এই গেল শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পৌরানিকী বার্ত্তা। বিংশ শতাব্দীর ভীষণ বিজ্ঞানের যুগে তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট এটী একটি নিরেট আষাঢ়ে গল্প। তাহাদিগকে ইহার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার মত উপকরণ আমার নাই; কারণ সূক্ষ্ম জগতের অস্তিত্ব বা তাহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে যাহারা অনাস্থাবান্ তাহাদিগকে এই সব তত্ত্ব বুঝান কঠিন ব্যাপার।

তবে স্থূলতঃ ব্যাপারটীর তাৎপর্য্য এইভাবে নির্ণয় করা যায় যে জগতের একটী শোচনীয় বা অধঃপতিত অবস্থা দেখিয়া উন্নতসত্ত্বা মনীষিগণ প্রাণে ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন ও ইহার প্রতিকারকল্পে অনন্যসাধারণ কোনও শক্তির আবির্ভাবের জন্য সতত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভক্ত লিখিয়াছেন "এস এস দয়াধার, মলিন হৃদয়ে, হের গো দাঁড়ায়ে, উর্দ্ধমুখে নারীনর।" উৎপীড়িতা গোরূপা ধরিত্রীর অশ্রুবর্ষণ অর্থে, অত্যাচারিত মানবসমাজের অবস্থা সন্দর্শনে ভক্তীসন্তানগণের কাতরপ্রার্থনা, এইরূপ বুঝিতে পারি। মূল কথা এই যে মায়াধীশ অজ নিত্যপুরুষবর যেমন স্বকীয় যোগমায়ার আবরণে সামান্য মানুষরূপে ধরায় নামিয়া খেলাধূলা করেন, বিশাল ধরিত্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীও তেমনি নিখিল বিশ্বের সন্তানগুলিকে বুকে ধরিয়া অপৃথক্ হইয়াও পৃথকরূপে গাভী সাজিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করেন।

"শোচত্যশ্রুকলা সাধ্বী দুর্ভগে বোজ্ঝিতা সতী।
অব্রহ্মণ্যা নৃপব্যাজাঃ শূদ্রা ভোক্ষ্যন্তি মামিতি ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত)

ধরণীদেবীর এই অশ্রু মোচন নিত্য। যুগে যুগেই প্রপঞ্চে তাহা প্রকট হয়। শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন "তত্র তাবৎ প্রথমং ভগবদবতারকারণম্।" শ্রীল সনাতন ও চক্রবর্ত্তী বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, "তত্র তাবৎ ভগবদবতারে প্রসিদ্ধকারণম্।" যদা ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি তদাত্মানং সৃজাম্যহং, ইহা যদি সত্য হয়, তবে গ্লানিকালে অত্যাচারিতের অত্যাচার-নিবেদন সত্য না হইবে কেন? এই নিবেদন আবেদন স্থূলে যেমন সত্য, মূলেও তেমন সত্য, প্রকাশও তেমনি সত্য। বাসুদেব বিশুদ্ধ সত্ত্ব, দেবকী পরাভক্তি; উভয়ের মিলনে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব; কংস পাপান্ধকার, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বিনাশ করেন;—এই স্থূল ব্যাখ্যাও যেমন সত্য, সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাও তেমনি সত্য; আবার একদিন প্রপঞ্চে যে তাহা প্রকট হইয়াছিল তাহাও তেমনি সত্য। বর্ত্তমান জাগতিক অবস্থা দেখিয়া কে অস্বীকার করিবে যে অপরিমিত ক্ষমতাবান্ কোন বিরাট ইচ্ছাশক্তি না হইলে, এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন জড় বিজ্ঞানের যুগে সত্যধর্ম্ম ও প্রেমধর্ম্ম স্থাপন পূর্ব্বক সারা জগতময় প্রকৃত শান্তিসংস্থাপন কখনই সম্ভবপর নহে! প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু নিঃস্বার্থ জগৎকল্যাণকামী মহাত্মাগণ বহুদিন হইতে এস এস বলিয়া ঐ যে তাঁহাকে ডাকিতেছেন, কেহ বা পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কেহ বা যুক্তকরে মুক্তকণ্ঠে আগমনী গাথা গাহিতেছেন। দৃপ্ত অসুরের শাসনে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উচ্ছন্নপ্রায় হইলে ধরাদেবী বিমর্ষ ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। গাভীরূপ ধারণ করতঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। একটি নৃশংস ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পাইয়া কৃষি কর্ষণার্থে নিযুক্ত করিলেন। গাভী হইয়া জমি চাষ, তাহা আবার ব্রাহ্মণের হাতে! শোচনীয় অবস্থার কথা ভাবিয়া ধরণীর দুঃখের আর অবধি নাই।

বৈশাখ মাস। প্রচণ্ড সূর্য্য, স্পৃহণীয় চন্দ্রমা। দিনগুলি ভীষণ গরম। কাহারও কোন কাজ কর্ম্ম করিবার সামর্থ্যই যেন তখন থাকে না। কবি লিখিয়াছেন 'উৎপ্লুত্য ভেক-

ছুষিতস্থ ভোগিনঃ ফণাত পত্রস্থ তলে নিষীদতি।' শেষ রাত্রটি কেবল মনোরম। 'নিশাঃ শশাঙ্ক ক্ষত নীল রাজয়ঃ' তাহাই মানুষের একমাত্র প্রিয়। রাত্রশেষে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ অন্ত এক বলদের সঙ্গে ধরণী মাতাকেও মাঠে টানিয়া লইয়া গেল। হাল টানিতে টানিতে দেবী অত্যাচারের কথা ভাবিতে লাগিলেন। "কলৌ তু ধর্ম্ম পাদানাং তুর্য্যাংশঃ অধর্ম্মহেতুভিঃ" কোন মতে এক পায়ে ভর করিয়া অতি কষ্টে চাষ করিতে লাগিলেন আর নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ তদুপরি ভীষণ কশাঘাত করিতে লাগিল। কাতরা ধরিত্রী দুঃখের কথা ভাবিতে লাগিলেন—

"কলৌ কাকিনিকেহপ্যর্থে বিগৃহ্যত্যক্ত সৌহৃদাঃ।
ত্যক্ষ্যন্তি হি প্রিয়ান্ প্রাণান্ হনিষ্যন্তি স্বকানপি॥
ন রক্ষিষ্যন্তি মনুজাঃ স্থবিরৌ পিতরাবপি।
পুত্রান্ ভার্য্যাঞ্চ কুলজ্ঞাং ক্ষুদ্রাঃ শিশ্নোদরম্ভরাঃ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত)

হায়রে ঘোর কলি! বিশটি পয়সার জন্য বিরোধ করিয়া মানুষ সৌহৃদ্য পরিত্যাগ করিতেছে, স্বীয় প্রিয় প্রাণ বিনাশ করিতেছে, আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করিতেছে। দিনের পর দিন জীব এত নীচাশয় হইতেছে যে বৃদ্ধ পিতামাতাকে রক্ষা না করিয়া কেবল শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া জীবন কাটাইতেছে। হায়, হায়, হায়রে বলিয়া দেবী বিপদ্‌বারণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ পরে উষালোক সমাগত দেখিয়া ক্লান্ত ব্রাহ্মণ হাল ছাড়িয়া অদূরে বৃক্ষতলে তন্দ্রাতুর হইয়া পড়িল। বসুন্ধরা দেবী তৃষ্ণাতুরা হইয়া কোনমতে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। ঘাটে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা ব্রহ্মাণীর মত দম্পতীযুগলকে ধ্যানস্তিমিত সন্দর্শন করিয়া সেই পুরাতন স্মৃতি নূতন হইয়া উঠিল। দুঃখ-সমুদ্র যেন ফুলিয়া উঠিল। দুটি গণ্ড বহিয়া অবিরল ধারায় পবিত্র অশ্রুরাশি ঝর্‌ঝর্ ঝরিতে লাগিল। গাভীরূপা ধরণী কাঁদিতে লাগিলেন—

'যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্ত কর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥'

অহো কি পরিতাপ! যাহার সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ নামটি একটিবার গ্রহণ করিলে পতিত, স্খলিত, ম্রিয়মাণ আতুর পর্য্যন্ত উত্তমা গতি প্রাপ্ত হয়, হতভাগ্য কলির জীব সেই দয়াল ঠাকুরের নামটি মুখে উচ্চারণ করে না। "ন তং কলৌ জনাঃ", "ন তং কলৌ জনাঃ" বলিতে বলিতে উন্মাদিনী ধরণী আজ অঝোরে ঝুরিতে লাগিলেন। কুলু কুলু করিয়া কলনাদিনী অলকানন্দাও যেন তার কান্নায় সাড়া দিয়া সেই তপ্ত অশ্রুরাশি বুকে লইয়া দয়িতের অন্বেষণে দ্রুত গমনে ছুটিতে লাগিল। হা প্রভু! শ্রীচরণে জন্ম দিয়াছ, এই বুকে কত খেলিয়াছ, এই তটে কত নাচিয়াছ। আজ সুদীর্ঘ চারি শতাব্দী বুকের ধন বুক ছাড়া হইয়াছে, ভাবিয়া ভাবিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া পাগলিনী মন্দাকিনী আলুথালু হইয়া পড়িল। সমদুঃখিনীকে দেখিয়া দুঃখভার আরও ভারী হইয়া উঠিল। শত সহস্র তরঙ্গচ্ছলে হৃদয় সহস্র সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

সুধারাশি লইয়া সুধাকর মঘা নক্ষত্র সঙ্গে সারানিশি ক্রীড়া কৌতুকে কাটাইয়া পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। ধরার বুকখানি শীতল করিবার জন্য সুনির্ম্মল জ্যোৎস্না-সঙ্গে গলিয়া গলিয়া চন্দ্রদেব গঙ্গার তরঙ্গভাঙ্গা বুকে পড়িতে লাগিলেন।

মাতৃজঠরে যেমন রজ-বীর্য্যের মিলন হয়, আজ পাপতাপ-নাশিনী ভাগীরথীর কোলে তেমনি গাভীর অশ্রুর সঙ্গে চন্দ্রের সুধার অপ্রাকৃত মিলন ঘটিল। শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ-পুষ্পবন্তযোগ একই কালে উদয় হইল। ভাবময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। হরিনামরূপ নামী মহামহাবিগ্রহ গ্রহণ করিলেন। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল, দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। সিদ্ধ বিদ্যাধর, ঋষি তপস্বিগণ জয় জয় রব উচ্চারণ করিলেন। পঞ্চগ্রহ তুঙ্গে উদয় হইলেন, কেতুসঙ্গে অষ্টম স্থানে রহিয়া শনিদেবও কুদৃষ্টি পরিত্যাগ করতঃ শুভগ্রহ হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। এই অপূর্ব্ব পুণ্যমুহূর্ত্তে গঙ্গার কূলে হরিনাম মূর্ত্ত হইয়া অনিন্দ্যসুন্দর একটি সোণার কমলের মত দিব্য লাবণ্যময় অপ্রাকৃত শিশুরূপে ভাসিতে লাগিলেন। আহ্লাদে আত্মহারা জাহ্নবী প্রসন্নোজ্জ্বল বদনে সেই হারাধন গোলোকরতন বুকে লইয়া নাচিতে নাচিতে যে ঘাটে ধ্যানস্থ দম্পতিযুগল গোপালের চিন্তায় তন্ময় হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় উপবিষ্ট আছেন, সেই ঘাটের দিকে চলিলেন।

জন্মরহস্য তত্ত্ব লিখিতে বসিয়া বেশ এক কাব্যের

উপন্যাস হইল, একথা আধুনিক শিক্ষিত সমাজ এক কথায় বলিয়া উঠিবেন—তাহা জানিয়াও লিখিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম কাব্য নবমীর দুঃখ, দ্বিতীয় গাভীর কান্না, তৃতীয় চাঁদের সুধা। গাভীর অশ্রু সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিয়াছি, এখন নবমীর কথা আর চাঁদের কথা একটু আলোচনা করিব।

মনে করুন, একটি শুভ দিনে একটি শুভ ঘটনা ঘটিল। ব্যাপারটিকে আমরা দুই ভাবেই বলিতে পারি; অমন শুভ-দিনটি বলিয়াই এমন সুন্দর ঘটনাটি ঘটিল বা অমন সুন্দর ঘটনাটি ঘটিল বলিয়াই দিনটি শুভ। সাধারণতঃ উন্নতসত্ত্বা সাধু মনীষিবৃন্দের ও অবতারের জন্মক্ষণটী অতি শোভনীয় থাকে। বলবান্ গ্রহ সকল উচ্চস্থানে বিরাজ করেন। শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর আবির্ভাব কালে পাঁচটী গ্রহই তুঙ্গস্থানে ছিল। শ্রীসীতারামের জন্ম কালেও ঐরূপ ঘটিয়াছিল। একথা শাস্ত্রে আছে, তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে—

"উচ্চস্থে গ্রহ পঞ্চকে সুরগুরৌ সেন্দৌ নবম্যাং তিথৌ
লগ্নে কর্কটকে পুনর্ব্বসুযুতে মেষং গতে পূষণি।
নির্দ্দগ্ধং নিখিলাঃ পলাশসমিধো মেধ্যাদযোধ্যারণে
রাবির্ভূতমভূতপূর্ব্ববিভবং যৎকিঞ্চিদেকং মহঃ॥"

নবমী একটী তিথি। চন্দ্রের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি হেতু ঐ তিথিটী হয়। এক মাস পর পর সেই একই নবমী তিথি ফিরে ফিরে আসে বটে, কিন্তু অন্যান্য গ্রহগণের গতির বৈলক্ষণ্যবশতঃ তুঙ্গস্থ গুর্ব্বাদি পঞ্চ গ্রহ সহ একই কালে নবমী কচিৎ উদয় হয়। অগণিত গ্রহনক্ষত্রের অনন্ত গতি একটী প্রাকৃতিক ব্যাপার (Phenomenon). প্রকৃতি প্রাণবতী না হইলেও ক্রিয়াবতী। সেই শুক্লা নবমী সহ তুঙ্গস্থ পঞ্চগ্রহের মিলন ঘটাইতে প্রকৃতির একটা চেষ্টা—তাহাই নবমীর কান্না। ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমায় একবার ঐরূপ হইয়াছিল, নবমীতে হয় নাই, তাহাই যেন পূর্ণিমার সঙ্গে নবমীর দ্বেষ। সেই চেষ্টা আজ ফলবতী হইল! তাই এত আনন্দ। একটা ফুল ফুটাইতে প্রকৃতির কত চেষ্টা! একটা বীজকে লইয়া খাটিতে খাটিতে যে দিন কৃতকার্য্যতা লাভ করে, সে দিন হাসিরাশি আর চাপিয়া রাখিতে পারে না। এত চেষ্টার পর আজ সেই নবমী আবার আসিয়াছে, অতএব ভগবান্ আসিবেন; তাই প্রকৃতির অত আনন্দ, ফুলে ফলে গঙ্গার কোলে তাই অত শোভা ঢালিয়া দিয়াছে।

তারপর চন্দ্রের সুধার কথা। গাভীর অশ্রু যেমন জাগতিক ধর্ম্মবিপ্লব বুঝায়, চন্দ্রের সুধা তেমনি শান্তিদাতার আগমন বুঝায়। জগতের দুঃখ দেখিয়া চাঁদের মত কমনীয় কান্তি আশ্রয় করতঃ এক নবশিশু আবির্ভূত হইলেন। রসিক ভক্ত যাহারা, তাহারা আর একটু সরস করিয়া বুঝিয়া লউন। ঐ যে সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর সার্দ্ধ চব্বিশ চাঁদ স্বরূপ আমার কালাচাঁদ, ঐ চাঁদ আজ তাপময় ধরার বুকে গলিয়া পড়িলেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"কাম গায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণ করি উদয়,
ত্রিজগত কৈল কামময়।
সখি হে কৃষ্ণ মুখদ্বিজরাজ।
কৃষ্ণ বপু সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে,
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ॥
দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণি দর্পণ,
সেই দুই পূর্ণ চন্দ্র জানি।
ললাটে অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দনবিন্দু
সেই এক পূর্ণ চন্দ্র মানি॥
কর নখ চাঁদের হাট, বংশীর উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান।
নাচে মকর কুণ্ডল, নেত্র লীলাকমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূ ধনু নাসা-বাণ, ধনুর্গুণ দুই কাণ,
নারীর মন লক্ষ বিঁধে তায়॥
এ চাঁদের বড় নাট, পশারি চাঁদের হাট,
বিনি মূলে বিলায় নিজামৃত।
কাহোস্মিত জ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে,
সবলোক করে আপ্যায়িত॥"

আজ নিখিল জীব জগতকে আপ্যায়িত করিতে গাভীর অশ্রু আশ্রয় করিয়া বা জীবদুঃখ কাতরতায় বিগলিত-তনু হইয়া গঙ্গাস্রোতে ভাসিতে লাগিলেন।

অবশ্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক বীর আমার কোন কথাই শুনিবেন না। চন্দ্র একটা জড়পিণ্ড, তার জ্যোতিও নাই, সুধাও নাই, তার কমনীয়তাই কি আর সার্দ্ধ চাব্বিশ না হউন সাত শত থাকিলেই কি, তার আবার গ'লে পড়াই কি? অবশ্য সে সকল যন্ত্রাদি সাহায্যে বর্ত্তমানে চন্দ্রের স্বরূপ বিশ্লেষিত হইয়াছে, তাহা যদি অভ্রান্তই ধরিয়া লই, তবে চাঁদকে একটা জ্যোতিহীন জড়পিণ্ড বলিতে হইবে বটে, কিন্তু ঐ আলোগুলি তাহার নিজেরই হউক, আর সূর্য্য-ঠাকুরের ধার দেওয়াই হউক, নিদাঘ নিশিতে নিশাপতির রমণীয় রূপখানি যে মনোনয়ন স্নিগ্ধকর ও হৃদয়জুড়ান তাহা বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক মাত্রই অনুভব করেন। ওর পানে একটীবার মাত্র তাকাইলে বিরহী প্রেমাস্পদ যে আর নয়ন ফিরাইতে পারে না, একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। ফলিত জ্যোতিষ চন্দ্রকে সকল মনের অধিপতি ধরিয়া এতাবৎকাল হিসাব নিকাশ করিয়া আসিতেছেন, কই, কোন কালে কেহ তো তাহাতে কোনরূপ ভুল ধরিতে পারে নাই। জন্মকালে চন্দ্রাধিষ্ঠিত রাশিই একটা মানুষের সমগ্র জীবনটা চালিতে করে। কেবল মনের উপর নহে, যাবতীয় ঔষধীর উপরেও চন্দ্রের রাজত্ব।

'তেনৌষধ্যঃ সমুদ্ভূতা যাভিঃ সন্ধার্য্যতে জগৎ,
স লব্ধতেজো ভগবান্ ব্রহ্মণাবর্দ্ধিতঃ স্বয়ং।'

এস্থলে ব্রহ্মণা অর্থে সূর্য্যেণ বলিয়া বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে মিল রাখা যায় বটে, কিন্তু ধান্যাদি ওষধীবৃদ্ধির হেতু যে চন্দ্র তাহা স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই। ওষধীর বিকার বিশ্বের যত কিছু সবই; মূল যে ওজঃ ধাতু তাহাও ওষধীর বিকার। তাই তারও এক নাম চন্দ্র। অতএব বৈজ্ঞানিক মতে মত ঠিক রাখিয়াও আমরা বলিতে পারি, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর যাহা সারভূত, যাবতীয় মনের যাহা অধিপতি স্বরূপ, সেই মহাশক্তি মূর্ত্তিমান হইয়া ধরায় প্রকাশ হইলেন। কেন হইলেন? গাভীর অশ্রু দেখিয়া! গাভীর অশ্রু কেন? কলির জীবের দুর্দ্দশার জন্য; সেই দুর্দ্দশার কারণ কি? চন্দ্রের অভাব, মহাশক্তির অভাব, তেজোবীর্য্যব্রহ্ম-চর্য্যের অভাব। প্রত্যেক অণুপরমাণুতে তাহাই দান করিতে, শক্তিদানে নিখিল বিশ্ব সঞ্জীবিত করিতে, মহা-মহাশক্তি ঐ যে মুর্শীদাবাদের গঙ্গার কূলে সামান্য শিশুরূপে ভাসিয়া চলিলেন।

শিক্ষিতাভিমানী বিংশ শতাব্দীর সভ্যবৃন্দের জন্যই এত সব নীরস তত্ত্বের অবতারণা করিলাম। প্রভু-বন্ধুতে বিশ্বাসবান্ একনিষ্ঠ ভক্ত যারা তাহাদের জন্য নহে। তাহাদের জন্য সোজা কথায় যাহা বলিয়াছি, তাহাই সুন্দর ও সত্য; কারণ শরণাগত একান্ত ভক্তগণের নিকট শ্রীশ্রীপ্রভু নিজ জন্ম সম্বন্ধে ঐরূপই প্রকাশ করিয়াছেন। ক্রমে তাহা ব্যক্ত হইবে।

"তাহার মেরুদণ্ডাশ্রিত সুষুম্নাদি ত্রিতন্ত্র-বিরাজিত হৃদয়-সরোজ বিকশিত করিয়া।"

"তাহার" পদে লক্ষ্য না করিয়া "উভয়ের" বুঝিতে হইবে। 'সুষুম্নাদি' আদি পদে ইড়া পিঙ্গলা বুঝিতে হইবে। মেরুদণ্ডে তিনটি নাড়ী, ত্রিধারার মত সহস্রার হইতে আজ্ঞা-চক্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। বামে ইড়া শঙ্খ চন্দ্রাভা, দক্ষিণে পিঙ্গলা সিত রক্তাভা, ইড়ায় চন্দ্রদেব, পিঙ্গলায় সূর্য্যদেব। তথাহি যোগার্ণবে—

"ইড়া চ শঙ্খচন্দ্রাভা শুভ্রা বামে ব্যবস্থিতা।
পিঙ্গলা সিতরক্তাভা দক্ষিণং পার্শ্বমাশ্রিতা।"

তন্ত্রান্তরে—

"ইড়ায়াং সংশ্রিতশ্চন্দ্রঃ পিঙ্গলায়াং দিবাকরঃ।"

মধ্যে সুষুম্না সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়ী একদিকে সূর্য্য, একদিকে চন্দ্রমা; সূর্য্যমার্গ হইতে ব্রহ্মদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃতা। সুষুম্না অগ্নিরূপা। তথাহি ষট্‌চক্রভেদে—

'মেরো বাহ্যপ্রদেশে শশিমিহির শিরে সব্যদক্ষে নিষণ্ণে
মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিগুণময়ী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা'—ইতি

তথাহি যোগ স্বরোদয়ে—

"সুষুম্না ভানুমার্গেন ব্রহ্মদ্বার ব্যবস্থিতা"

ত্রিতন্ত্র বিরাজিত হৃদয়-সরোজ—হৃদয়ের মধ্যস্থলে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নিরূপা ত্রিতন্ত্র বা নাড়ীত্রয় মিলিত হইয়াছে।

তথাহি কালিকাপুরাণে ৫৪ অধ্যায়ে—

"ব্রয়াণামথ নাড়ীনাং হৃদয়ে চৈকতা ভবেৎ।"

হৃদয়ে অনাহত চক্র উদয়মান সূর্য্যের মত সেই চক্রের প্রভা। তথাহি পাদ্মে স্বর্গখণ্ডে—

"উদ্যদাদিত্য সঙ্কাশং হৃদিচক্রমনাহতং।"

এই অনাহত চক্রই হৃদয়-সরোজ, ত্রিতন্ত্র-মিলন-ভূমি। এই অনাহত চক্রেই আনন্দময় পুরুষবর বাস করেন। শব্দ ব্রহ্ম তাঁর স্বরূপ। শব্দ ব্রহ্ম বা নাম ব্রহ্মময় পুরুষ জীবের এই চক্রে অবস্থান করেন। তথাহি তন্ত্রসারে—

"তদূর্দ্ধেঽনাহতং পদ্মমুদ্যদাদিত্য শঙ্কাশং

* * * *

শব্দ ব্রহ্মময়ং শব্দোঽনাহত স্তত্র দৃশ্যতে

* * * *

আনন্দ সদনং তত্তু পুরুষাধিষ্ঠিতং পরং।"

মায়ান্ধ জীব সেই পুরুষের সন্ধান জানে না। জীবের নিত্যস্বরূপজ্ঞান হইলেই, সম্পূর্ণ আত্মস্থ ভাব আসিলেই সেই পরমস্বামীর সন্ধান পায়।

তথাহি তত্রৈব—

"ধ্যানিনাং অথ মন্ত্রাণাং চিন্তনস্য জপস্য চ
যস্মাদাশুক্তা হৃদয়ং তস্মাদাদীতি গদ্যতে।"

আজ দম্পতীযুগল গঙ্গাতীরে ধ্যানস্থ ; গোপালের কথা ভাবিতে ভাবিতে সম্পূর্ণ আত্মস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। অনাহত চক্রে স্পন্দন খেলিতেছে। দেখিতে দেখিতে অনাহত দ্বাদশদল বিকশিত হইল। পরম পুরুষবর হৃদয়মণ্ডল উদ্ভাসিত করতঃ বিরাজ করিতে লাগিলেন। আহা! কি অপূর্ব্ব মিলন, বাহিরেও যিনি ভিতরেও তিনি। অন্তরে পরমপুরুষরূপে অনাহত চক্র আলোকিত করিয়া উদয়মান আদিত্যের প্রভা মলিন করতঃ, আর—বাহিরে গঙ্গাস্রোতে সুধামাখা তনু প্রাকৃতশিশুরূপে ভাসমান হইয়া বিরাজিত। মুহূর্ত্তে অন্তর বাহির মিলন হইল। উভয়তঃ-প্রাজ্ঞ দীননাথ চোখ খুলিলেন।

"পীতবর্ণ পঞ্চতত্ত্বময়" ইতিমূল।

অপ্রাকৃত মহাভাবের মানুষ তিনি—প্রাকৃত মানুষরূপে মানুষের দ্বারে ছুটে আসেন যখন,তখন তাহাকেও দেশোচিত কালোচিত যুগোচিত শ্রীদেহ ও তৎকান্তি গ্রহণ করিতে হয়। শাস্ত্র লিখিয়াছেন—

"গৃহ্ণত্যনুযুগং তনু।" শিশুরাজ লিখিয়াছেন—"কান্তি কাঁদে হেরে কান্তি।" প্রাকৃত জগতের কান্তি সেই বিমল অমল কান্তি দেখিয়া মলিন বিষন্ন, এ জগতের রূপ লাবণ্য যেন কত ভয়ভীতিতে জড়সড় হইয়া দূরে অতি দূরে সরিয়া কেবল অশ্রুনেত্রে যুক্তকরে গৌরব প্রদর্শন করে। সেই ভাবের মানুষের সঙ্গে এই ভাবের মানুষ মিলিতে পারে না। প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন "জীবের হিতের জন্য বিশেষ চিহ্ন লইয়া মানুষের ভিতরেও মানুষ হইয়া আসেন। লক্ষণে চিনে নিতে হয়।" সেইলক্ষণটী কি, পূজ্যপাদ গ্রন্থকার তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন। লক্ষণ দুই প্রকারের হয়, স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ। যে বৈশিষ্ট্য বশতঃ এক বস্তুকে অপর বস্তু হইতে পৃথক বলিয়া জানিতে পারা যায় তাহাই তাহার লক্ষণ। প্রত্যেক বস্তুর দুই প্রকারের সত্তা আছে। তাহা আপনাতে আপনি যাহা (in it self), তাহা অন্যের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় যে ভাবে। পাশ্চত্য দর্শনের ভাষায় Subjective & objective Existence বলা হয়। শ্রীশ্রীভগবান্ আপনাতে আপনি যাহা তাহাই তাহার Subjetive Existence, তাহার নির্দ্দেশই স্বরূপ লক্ষণ। অজ্ঞ জীবের ক্ষুদ্র জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে তিনি যেমন ভাবে প্রকাশ হন বা জীব তাহাকে যে ভাবে জানে, তাহাই তাহার তটস্থ লক্ষণ। 'পঞ্চতত্ত্বময়' পদটী দ্বারা স্বরূপ লক্ষণ ও "পীতবর্ণ" পদ দ্বারা তটস্থ লক্ষণ বলিয়াছেন। উপনিষদ্ গাহিয়াছেন,"অবাঙ্মনসোগোচরম্।" উপনিষদ্‌কে জিজ্ঞাসা কর,তিনি কেমন ? উপনিষদ্ বলিবে—"যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।" 'নেতি' 'নেতি' তিনি এ' নয়, তিনি ও' নয়, তিনি প্রাকৃত নামরূপ শব্দস্পর্শগন্ধের অতীত। প্রাকৃত মন তাহাকে জানে না, সসীমবাক্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতকার লিখিয়াছেন"সত্য পরং ধীমহি।"তিনি সৎ,তিনি পরম। তিনি আছেন, অনন্ত বিশ্বে কেবল তাঁহারই পরম সত্ত্বা। তিনি আছেন। পরম জ্ঞানস্বরূপ তিনি,আনন্দ-রস ঘন তিনি। শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীচন্দ্রপাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন "অনন্তানন্তময়।" অসীম অনন্ত ভাব তাঁর, অসীম অনন্তরূপ তাঁ'র, মহামহাভাবরসেশ্বরেশ্বর তিনি। অতি অতি গম্ভীর সেই ভাব-বারিধির কূল কিনারা নাই। শ্রীপাদ গ্রন্থকার লিখিলেন "পঞ্চতত্ত্বময়"। এই পঞ্চতত্ত্ব রহস্য আস্বাদন করিবার পূর্ব্বে একটী নীরস তত্ত্ববিচারের অবতারণা করিতে হইবে। "অবাঙ্মানসগোচরং" 'সত্যং পরং' 'অনন্তানন্তময়' ইত্যাদি উপনিষদ্ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচন্দ্রপাতোক্ত উত্তরোত্তর গভীর গভীরতর স্বরূপলক্ষণ শাস্ত্রে সুনির্দ্দিষ্ট থাকিলেও গ্রন্থকার শিশুরাজ মহেন্দ্রজী সে সকল ভাবের পদ না লইয়া 'পঞ্চতত্ত্বময়' এইরূপ

স্বরূপ নির্দ্দেশ করিলেন কেন? এইস্থলে রহস্য হইতেছে এই যে, স্বরূপ ও তটস্থ বলিয়া যে দ্বিধা লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ কিছুই নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীভগবানের স্বরূপটী যে কি তাহা কাহারও জানিবার সাধ্য নাই! তাহা চিরগুপ্ত, চির অজ্ঞাত। শ্রীশ্রীপ্রভু যে কে, কেমন ও কি বস্তু তাহা তিনি ছাড়া কেহ কদাপি জানিতে পারে না, পারে নাই, পারিবে না। অতএব তাঁহাকে "বন্ধু" না বলিয়া আমরা বলিব "জগদ্বন্ধু" অথবা আরও সত্য করিয়া বলিব "আমার বন্ধু।" ভক্তের কাছে তাঁহার প্রকাশ যাহা তিনি তাহাই বলিয়া নিখিল শাস্ত্রে কীর্ত্তিত ও গীত হইয়া আসিতেছেন। তিনি যেন একটী "ভাব" আর অনন্ত অক্ষৌহিণী সৃষ্টি-সংসারের অনন্ত অক্ষৌহিণী জীব-হৃদয়ে যেন সেই ভাবের একটী "উচ্ছ্বাস"। তিনি যে কেমন, জীব তাহা জানে না, কদাপি জানিবে না, জানিতে বৃথা চেষ্টা করিবে মাত্র। আমার নিকট তিনি কেমন, ভক্তের বুকে তাঁহার প্রকাশ কেমন, জীব কেবল তাহাই জানিবে। শ্রীশ্রীপ্রভুর স্বরূপতত্ত্বটী চির অজ্ঞাত। 'আমার প্রভু' যিনি তিনি যে কেমন, কেবল তাহাই জানিবার শক্তি আমাকে দিয়াছেন। তাদাত্ম্য সম্বন্ধে কেবল তিনিই তাঁহাতে আছেন। তদিতর অন্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট যাহা কিছু, সবই অভেদ হইয়াও ভেদ-বিশিষ্ট। অতএব স্বরূপ-লক্ষণ জানিবার উপায় কোথায়? এই মনের দ্বারাই তাঁহার সেই মনের অতীত স্বরূপটী ধরিবার প্রয়াস বৃথা নহে কি? 'নেতি নেতি' দ্বারা কোন ভাব বস্তুর (Positive) স্বরূপ নির্ণয় হয় না। "সত্যপরং" বলিতে গেলেই তটস্থভাব তাহাকে স্পর্শ করে অর্থাৎ জীবের স্বানুভূতি ভূমিকায় তিনি চিত্রিত হইয়া পড়েন। তবে 'অনন্তানন্তময়' এই যে স্বরূপ ইহা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, নিখুঁত ও নির্ম্মল। কারণ তাহাকে বলিতে হইলে, এই শব্দটী ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু অজ্ঞজীবের ব্যবহারিক জ্ঞানবত্তার মাপকাটীতে ঐ পদটী একটী নিরর্থক পদের সমান। স্বয়ং প্রভুই নিজকে নিজে 'অনন্তানন্তময়' বলিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু সাধনাবিহীন সাধারণ জীবের তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। অধিকন্তু, অন্যতত্ত্ব হইতে পৃথকরূপে শ্রীশ্রীপ্রভুর তত্ত্বটী বুঝাইবার জন্যই লক্ষণ নির্দ্দেশ, সেই প্রয়োজন 'অনন্তানন্তময়' পদ দ্বারা সিদ্ধ হয় না। তত্ত্বদর্শী পরমদয়াল গ্রন্থকার নিখিল জীবের চিত্তপট যেন প্রত্যক্ষকরতঃ সাধারণের সহজ-বোধ্যভাবে তাঁহাকে ধরিবার, বুঝিবার, জানিবার ও চিনিবার মত লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াই 'পীতবর্ণ পঞ্চতত্ত্বময়' কথাটী ব্যবহার করিয়াছেন।

লীলারসরাজ শ্রীশ্রীগোলোকনায়ক শ্রীশ্রীহরি। প্রাকৃত জগতে তাহার প্রথম প্রকাশ রসিকেন্দ্র চূড়ামণি রাসরসেশ্বর শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্ররূপে। শ্রীশ্রীধাম বৃন্দাবনের নিকুঞ্জগগনে রসাধিকারিণী ললিতাদি তারার হাটে শ্যামচাঁদ প্রেমসুধার বিকিকিনি করেন। দশমদশার বিরহ বেদনা বুকে লইয়া বৃন্দাবনচন্দ্রমণী পশ্চিমাচলে অন্তর্ধান করিলেন। নবদ্বীপে গৌরশৈলে মহামিলন হইল।

"রাই কুন্দ ললিতিকা, শ্যামসুন্দর বৃন্দিকা" বিরহ-প্রতাপে মহাযোগে যুক্ত হইলেন। শ্রীনিতাই, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর—প্রত্যেকেই পঞ্চগোপীময়। (শ্রীহরিকথা প্রকটরহস্য দ্রষ্টব্য।) ব্রজধাম রূপান্তরে নদীয়ায় উদয় হইল। নিভৃত নিকুঞ্জের প্রেমসুধা জীবের হাতে তুলিয়া দিলেন। "হরের্নামৈব কেবলম্" এই মহামন্ত্র জীবের কাণে দিয়া পঞ্চতত্ত্ব নীলাচল-অচলে লুকাইয়া রহিলেন। আজ "দুহুঁ ধাম দুহুঁ ধামের শকতি" মহা-মহাসম্মিলনে মহামহাকায় মহাবিগ্রহ প্রকট করিলেন। তথাহি শ্রীপ্রেমযোগ গ্রন্থে—

"ব্রজলীলার পরিকর পঞ্চ সম্মিলনে,
পঞ্চতত্ত্ব গৌরের প্রেম-প্রচারণে,
পঞ্চতত্ত্ব একাধারে প্রেমের প্লাবন,
হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ॥"

অতএব সংক্ষেপতঃ সার কথায় "পঞ্চতত্ত্বময়" ইহাই শ্রীশ্রীপ্রভুর স্বরূপ লক্ষণ।

"**পীতবর্ণ**।" বর্ণদ্বারা লক্ষণ বিনির্ণয় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়; তথা "আসন্‌বর্ণা স্ত্রয়োহ্যস্য" ইত্যাদি। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও পরিকরবৃন্দের লক্ষণ শ্রীশ্রীপ্রভুও বর্ণদ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন। "কৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, চালিতা গাছের পাতার রং, রাধিকা স্বর্ণবর্ণ, গিণি ও পাউণ্ডের রং, আর সমস্ত পরিকর বৃক্ষের রং।

উক্ত সর্ব্বত্র বর্ণ শব্দটি উপলক্ষণ। বর্ণটী সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত। বর্ণদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মানসে সর্ব্বাঙ্গ দর্শন হয়। শ্রীদীননাথ নয়ন খুলিয়া কি দেখিলেন? ভানুকোটী-উজ্জ্বল চন্দ্রকোটী-সুশীতল একটি পীতবর্ণ অবুঝাক পরমরমণীয় শিশু। গঙ্গা-

দেবী সানন্দে সেই পরম শিশুটী দীননাথের হাতে তুলিয়া দিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

"অনর্পিত প্রেম বিতরণ করিবার জন্য" ঃ—

আজ নবমীর ক্ষীণ উষালোকে একটি আলোর মানুষ আঁধার জগতে নামিয়া আসিলেন—কেন? সেই অনর্পিতচরী ভক্তি বিতরণ করিবার জন্য। শত সহস্রবার অর্পিত হইলেও সে মধুসিন্ধু চিরঅনর্পিত। শ্রীশ্রীহরিপুরুষতত্ত্ব জীব কেন, বিধিব্রহ্মাদিরও চির অনাস্বাদিত। স্বয়ং শ্রীমুখে তাই বলিয়াছেন যে ব্রজলীলার রসাস্বাদন করিয়াছিল অষ্টসখী, গৌরলীলায় রসপাত্র ছিলেন সাড়ে তিন জন। ও' সব লীলায় বিশেষ কিছু হয় নাই। এবার পরমধনের আস্বাদন দিতে প্রাণধন ছুটিয়া আসিলেন। এবার 'গুরু তত্ত্ব প্রকাশ হ'বে, ভাবের দ্বারা সেবা হ'বে, ঘাটে ঘাটে যমুনা ব'বে, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার হবে'। প্রত্যেক জীব পরমস্বামী শ্রীহরিপুরুষের সঙ্গে পরমানন্দে বিহার করিবে, বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণু ঐ রসস্বরূপকে আস্বাদন করিবে—উহাই করাইবার জন্য উধাও হইয়া ধরায় আসিলেন।

"জন্য"—এস্থলে একটি অনুমান প্রমাণাশ্রয় করিবার উদ্দেশ্যে ভাবুক গ্রন্থকার 'জন্য' পদটি প্রয়োগ করিয়াছেন। একটি শিশু জন্মিয়াছে শুনিলেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিবেন, প্রাক্তন-কর্ম্মফল ভোগ করিতে জন্মিয়াছে; কারণ বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর উদ্ভবের হেতু প্রাক্তন-কর্ম্ম। জীবমাত্রের জন্মের হেতু স্বকীয় কর্ম্মবন্ধ-পাশ। আর শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্মের হেতু 'অনর্পিত প্রেম বিতরণ'।

জন্মের হেতু যখন সম্পূর্ণ বিপরীত, তখন তোমরা একটা অনুমান করিয়া লও। সাধারণ জীবের জন্ম জননীজঠরেই হইয়া থাকে। গর্ভাবাসে কঠোর যন্ত্রণা, তাহা নরকসদৃশ উক্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীপ্রভু যখন সাধারণ জীব হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, তখন তাঁহার জন্মের প্রকারও বিভিন্ন হইবে; ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। ইহাই জানাইবার উদ্দেশ্যে "জন্য" পদটী ব্যবহার করিয়াছেন। জীবের ও প্রভুর জন্মের হেতুদ্বয়ের সম্পূর্ণ বিসদৃশত্ব দেখানই এই "জন্য" পদ প্রয়োগের তাৎপর্য্য। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রও পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন "জন্ম গুহ্যং ভগবতঃ"।

"এবং জন্মানি কর্ম্মাণি হ্যকর্ত্তুরজনস্য চ।
বর্ণয়ন্তি স্ম কবয়ঃ বেদগুহ্যানি হৃৎপতেঃ॥" ১।৩।৩৪।

ষড়িন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা হৃষীকেশ হইয়াও তিনি যে কি প্রকারে আত্মতন্ত্র রহিয়া ইন্দ্রিয়বিষয় গ্রহণ করেন, তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের পক্ষে অনুমান করাও অসম্ভব। স্বামিপাদ শ্রীধর লিখিয়াছেন, "দূরাদেব গৃহ্ণাতি নতু সজ্জতে"। এই জগতে আসিয়াও তিনি যে কিরূপে না আসিয়া থাকেন, তাহা তর্কাদি দ্বারা কদাপি জ্ঞাতব্য নহে। শাস্ত্রে তাই স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতু
রবৈতি জন্তু কুমনীশ ঊতীঃ॥"

তথাপি আমরা অতি স্থূল বুদ্ধি দ্বারাও এ পর্য্যন্ত অনুমান করিতে পারি যে কর্ম্মফলস্বরূপ শরীরধারী জীবের জন্ম যেরূপ কামজ, যিনি আসেন স্বেচ্ছায়, যিনি আসেন কামনাবদ্ধ জীবের দুর্গতি দর্শন করতঃ কৃপা পরবশ হইয়া, যিনি আসেন জন্মজরাদি আত্যান্তিক দুঃখের কবল হইতে জীবকুলকে উদ্ধারণের পথে তুলিয়া অনর্পিত প্রেমধনে ধনী করিতে—তাঁহার জন্ম কদাপি তদ্রূপ নহে। অতএব কেমন করিয়া একটি শিশু উদ্ভূত হইয়া গঙ্গাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আসিল ভাবিয়া একেবারে ধাঁধায় পড়িও না। এই কথাটি বলিবার জন্যই গ্রন্থকার 'প্রেম বিতরণের জন্য' এই বাক্যটি প্রয়োগ করিয়াছেন।

"অমিয় নিমাই গৌরহরি পূর্ব্ব অঙ্গীকার রক্ষার্থ"

এই বাক্যাবলীর ভাষ্যরচনা পূর্ব্বেই করিয়াছি। গ্রন্থকারের ভাব পরম গম্ভীর। লেখনী পরম চতুর। একটি অক্ষরও নিরর্থক ব্যবহার করেন নাই। "অমিয়" পদটি প্রয়োগ করিবার নিগূঢ় তাৎপর্য্য শুনুন। যে শচীর নিমাই আজ আবার নবশিশুরূপে দীননাথের অঙ্কদেশ উজ্জ্বল করিলেন, তিনি আরও কতবার এই কামময় জগতে আসিয়াছিলেন—অমিয়-তনু লইয়া। সেই তপ্ত-রুক্ম-সুধানিধিকায় প্রাকৃত রজবীর্য্যাত্মক নহে। তিনিই যখন আসিলেন, তখন তোমরা একটি উপমাণ প্রমাণ অঙ্গীকার করিয়া বুঝিয়া লও। 'অমিয়' পদ প্রয়োগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞ গ্রন্থকার উপমাণ-প্রমাণের ইঙ্গিত করিয়াছেন। "প্রসিদ্ধ সাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং উপমানং।" প্রজ্ঞাত পদার্থের সহিত সমানতাপ্রযুক্ত প্রজ্ঞাপনী পদার্থের

প্রজ্ঞাপনই উপমান। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরহরি প্রসিদ্ধ বা প্রকৃষ্টরূপে পরিচিত তত্ত্ব। শ্রীশ্রীগৌরহরির অমিয় তনু অযোনিসম্ভব। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রসিদ্ধতত্ত্ব। তিনি অযোনিসম্ভব। সেই দুই তনু অভিন্ন-তনু শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু। তিনি যোনি-সম্বন্ধ ব্যতীত আপনাআপনিই আবির্ভূত হইলেন শুনিয়া চমৎকৃত হইবার হেতু কিছুই নাই। তিনি যে অমনভাবেই আসেন। একবার নয়, বার বার দুইবার আসিয়াছেন, দেখেও কি সংশয় দূর হয় নাই—এতখানি কথা বলিবার জন্য গ্রন্থকার "অমিয়" পদটি ব্যবহার করিয়াছেন।

গ্রন্থকার বলিলেন বটে; কিন্তু আমরা টীকাকার, দেবকী-গর্ভে কংশ কারাগারে জন্মিলেন যিনি, তিনি অযোনিসম্ভব, একথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? দেখা যাউক, শ্রীমদ্ভাগবতের গুটীকতক শ্লোক আলোচনা করিয়া কিছু লাভ হয় কি না?

তথা শ্রীদশমে—

"ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়প্রদঃ।
আবিবেশাংশ ভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥"

ভক্তজনের অভয়দাতা বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরি পরিপূর্ণ-রূপে বসুদেবের মনে আবির্ভূত হইলেন। সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা শ্রীপাদ শ্রীধর ভাবার্থদীপিকায় কি লিখিতেছেন, নিবিষ্টচিত্তে অনুভব করুণ।

"মন আবিবেশ মনস্যাবির্বভূব **জীবানামিব ন তস্য ধাতুসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ"** জীব সকলের ন্যায় তাহার ধাতুসম্বন্ধ হয় নাই। এইভাবে রহিলেন, শ্রীবসুদেবে। এখন শ্রীদেবকীতে আধান হইল কিরূপে, তাহাই শুনুন।

"ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ॥"

পূর্ব্বদিক যদ্রূপ আনন্দকর চন্দ্রধারণ করে তদ্রূপ দীপ্তি-শালিনী শুদ্ধসত্বা দেবকী-বসুদেব কর্ত্তৃক বেদদীক্ষা দ্বারা অর্পিত অচ্যুতাংশ যাহা ভক্তানুগ্রহার্থ পরিছিন্ন শরীরতুল্য হইয়াছিল, তাহা আপনার মন দ্বারাই ধারণ করিলেন।

(সমাহিতং সম্যগ্‌ভূতমেবাহিতং বেদদীক্ষয়া অর্পিতং অচ্যুতস্য অংশইব অংশস্তং ভক্তানুগ্রহায় পরিছিন্নমেবেবপু রিত্যর্থঃ—ইতি শ্রীধরঃ)। এই শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণীতে গোস্বামিবরেণ্য শ্রীসনাতন লিখিয়াছেন—'তেন জীবজন্মা-ভাবাৎ ব্যক্তিরেব শ্রীভগবতোজন্ম উচ্যতে"। প্রাকৃত জীবের মত জন্ম হয় নাই বলিয়াই এইরূপ বলিলেন। এই গেল গর্ভাধান। আসুন এখন জন্ম সময়টী দেখি—

"দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুস্কলঃ॥"

দৃষ্টান্তটী লক্ষ্য করুন, পূর্ব্ব দিকে যেমন চন্দ্র শোভা পায়, তাহার ন্যায় ভগবান্ হরি দেবকীতে ঈশ্বররূপে আবির্ভূত হইলেন। "যথা" অর্থ শ্রীধর লিখিলেন 'যথাবৎ ঐশ্বরেণ রূপেণ'। তারপর আবির্ভূত হইলেন কিরূপ?—

"তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং
চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং
পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্॥
মহার্হবৈদুর্য্যকিরীটকুণ্ডল
ত্বিষা পরিষ্বক্ত সহস্রকুন্তলম্।
উদ্দাম কাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভি
বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত॥"

দেবকীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলে বালক নাড়ী বিজড়িত হইত; বর্ণনায় সে কথা নাই। তারপর চতুর্ভুজ জীবন্ত শিশু কদাচিৎ সম্ভব হইলেও কাপড়পরা, অলঙ্কারপরা, আয়ুধধরা শিশুর জন্ম সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে প্রাকৃত জীবের মত ভূমিষ্ঠ হন নাই।

ঐ রূপ দেখিয়া শ্রীদেবকী কহিলেন,—

"উপসংহর বিশ্বাত্মন্নদো রূপমলৌকিকং।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্॥"

হে বিশ্বাত্মন্! শঙ্খচক্রগদাপদ্মের শোভায় শোভিত এই অদ্ভুতরূপ তিরোহিত কর। তখন শ্রীভগবান্ কি করিলেন?

"—ভগবানাত্মমায়য়া।
পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ॥"

ভগবান্ হরি দর্শনকারী পিতামাতার সমক্ষে নিজ মায়া-যোগে প্রাকৃত শিশুরূপ হইলেন। এই গেল শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা।

এখন আসুন, দেখি, যাঁহারা মহাপ্রভুর কৃপায় প্রকৃত ভাগবত-তত্ত্ববেত্তা হইয়াছিলেন, সেই গোস্বামিগণের তিলক-স্বরূপ শ্রীসরূপ কি ভাবে "জন্মলীলা" বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীলঘুভাগবতামৃত দৃষ্টিপাত করুন, 'প্রকটাপ্রকটলীলা' নবম শ্লোক হইতে ত্রয়োদশ শ্লোক আলোচনা করুন।

"যদ্বিলাসো মহাশ্রীশঃ স লীলাপুরুষোত্তমঃ।
আবির্ব্বুভূষুরত্রাবিষ্কৃত্য সঙ্কর্ষণং পুরঃ।
অন্তঃস্থিতা বিকর্ত্তব্য তদন্তর্ব্যূহ ঈশ্বরঃ।
হৃদয়ে প্রকটস্তস্য ভবত্যানকদুন্দুভেঃ।"৯॥

যে লীলাপুরুষোত্তমের মহানারায়ণ বিলাসমূর্ত্তি, সেই লীলাপুরুষোত্তম ঈশ্বর আবির্ভূত হইতে ইচ্ছা করিয়া অগ্রে সংকর্ষণকে আবিষ্কার পূর্ব্বক বাসুদেবাদি ব্যূহত্রয় আবিষ্কার কর্ত্তব্য বিবেচনায় বসুদেবের মনোমধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্য রাখিবেন, দেহ মধ্যে, মূল ধাতুরূপে নয়। তারপর গর্ভাধান শুনুন—

'ভূমির্ভারনিরাসায় দেবানামভিযাচ্ঞয়া
দ্বাপরান্তাবসানেঽস্মিন্নষ্টাবিংশে চতুর্য্যুগে।
ক্ষীরাব্ধিশায়ী যদ্রূপমনিরুদ্ধতয়া স্মৃতং
তদিদং হৃদয়স্থেন রূপেণানকদুন্দুভেঃ
ঐক্যং প্রাপ্য ততো গচ্ছেৎ প্রাকট্যং দেবকীহৃদি'॥১০॥

দেবগণের প্রার্থনানুসারে ভূমির ভার হরণার্থ বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্য্যুগে দ্বাপরাবসানে ক্ষীরসাগর-শায়ীর যে রূপ অনিরুদ্ধের বিলাসমূর্ত্তি বলিয়া স্মরণ করা হইয়াছে, সেই মূর্ত্তি বসুদেবের হৃদয়স্থ লীলাপুরুষোত্তমের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া বসুদেব হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রকটতা প্রাপ্ত হন। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ লইয়া, গর্ভেতে নহে। জরায়ুস্থিত বালক মাতৃভুক্ত দ্রব্যাদির সারাংশ চুষিয়া বাঁচিয়া থাকে। তিনি কি করিয়া সেই হৃদয়ে ছিলেন?

'প্রেমনন্দামৃতৈ স্তস্যা বাৎসল্যৈকস্বরূপিভিঃ।
লাল্যমানো হরিস্তত্র বর্দ্ধতে চন্দ্রমা ইব'॥ ১১।

তখন দেবকীর বাৎসল্যের এক স্বরূপ প্রেমানন্দামৃত কর্ত্তৃক লাল্যমান হইয়া হরি চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

সাধারণতঃ দশ মাস দশ দিন গর্ভবাস করিয়া প্রাকৃত শিশু প্রসবদ্বার দিয়া বহির্গত হয়। তিনি কি করিলেন?

"অথ ভাদ্রপদাষ্টম্যামসিতায়াং মহানিশি।
তস্যাহৃদন্তিরোভূয় কারায়া সূতি সদ্মনি
দেবকীশয়নে তত্র কৃষ্ণঃ প্রাদুর্ভবত্যসৌ।" ১২॥

অনন্তর ভাদ্র মাসের অসিতপক্ষীয় অষ্টমীর অর্দ্ধ রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ তদীয় হৃদয় হইতে অন্তর্ধান করিয়া বন্ধনালয়ের সূতিকাগৃহে দেবকীশয্যায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। তারপর সকলেই জানিলেন। তাহারা কি জানিলেন? দেবকীদেবীই বা কি ভাবিলেন?

"জনয়িত্রীপ্রভৃতিভিস্তাভিরিত্যবগম্যতে।
লৌকিকেন প্রকারেণ সুখং শিশুরজায়ত॥"১৩॥

দেবকী প্রভৃতি স্ত্রীগণ লৌকিক ব্যবহার অনুসারে জানিতে পারিলেন যে বিনা কষ্টেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। এই গেল শ্রীরূপের স্বকীয় অনুভূতি।

অন্যত্র তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন ভাগবতগণের মত বলিতেছেন:—

"কেচিদ্ভাগতাঃ প্রাহু রেবমত্র পুরাতনাঃ।২১।
ব্যূহঃ প্রাদুর্ভবেদাদ্যো গৃহেষ্বানকদুন্দুভেঃ।
গোষ্ঠেতু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ।২২।
গত্বা যদুবরো গোষ্ঠং তত্র সূতীগৃহং বিশন্।
কন্যামেব পরং বীক্ষ্য তামাদায়াব্রজৎ পুরং॥"২৩।

বসুদেবের গৃহে আদ্যব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব জন্মগ্রহণ করেন, আর গোকুলমধ্যে মায়াশক্তি দুর্গার সহিত শ্রীলীলাপুরুষোত্তম আবির্ভূত হয়েন। অনন্তর বসুদেব গোকুলমধ্যে গমন পূর্ব্বক তথায় সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া কেবল কন্যামাত্র দেখিতে পান। পরে তাহকেই গ্রহণ করতঃ মথুরায় আসিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীবসুদেবনন্দন শ্রীলীলাপুরুষোত্তমে গিয়া প্রবেশ করেন।

আপনারা হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, এত সব কথা আছে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব বলেন নাই কেন? শ্রীরূপ তাহার উত্তর দিয়াছেন—

"এহচ্চাতিরহস্যত্বান্নোক্তং তত্র কথাক্রমে।
কিন্তু কচিৎ প্রসঙ্গেন সূচ্যতে শ্রীশুকাদিভিঃ॥"

এ বিষয়টী অতি গোপনীয়, রহস্য পরিপূর্ণ। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে তৎলীলা-বর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত হয় নাই। তবে শ্রীশুকদেব প্রভৃতি কোনও কোনও স্থানে কথাপ্রসঙ্গে কিঞ্চিন্মাত্র সূচনা করিয়াছেন। গ্রন্থ-বিস্তারভয়ে সেই সকল স্থান নির্দ্দেশ করিতে বিরত থাকিলাম। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই অলৌকিক জন্মলীলার সকল কথা শুনিয়া তোমার আমার মত জীবের বিশ্বাস হউক বা না হউক, স্বামিপাদ শ্রীধর,

গোস্বামিবরেণ্য রূপ সনাতন ও শ্রীজীব যে শ্রীকৃষ্ণকে অযোনি-সম্ভব জানিতেন, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। কারণ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অযোনিসম্ভবত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা যখন সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন, তবে আমাদের এত ভয়ই বা কেন? বিশেষতঃ শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদগণের আনুগত্য ব্যতীত যখন ভজনরাজ্যে প্রবেশ করিবার আমাদের আর গত্যন্তর নাই, তখন বিশ্বাস করিতেই হইবে।

তারপর শ্রীগৌরাঙ্গের কথা। গ্রন্থকার অমিয় নিমাইকে অযোনিসম্ভব বলিতে চাহেন। তৎসম্বন্ধে প্রাচীন কোন গ্রন্থোক্ত বিশেষ প্রমাণ আমার নাই। এ প্রসঙ্গে কবির উক্তিটিকেও স্মরণ করাইয়া দিতে চাই "পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।" প্রাচীন গ্রন্থে নাই বলিয়াই যে সমীচীন নয়, আজ কেহ বলিতেছে বলিয়াই যে অগ্রহণীয়, এইরূপ বদ্ধমূলসংস্কার অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বিশেষতঃ এই সকল নিগূঢ় লীলাতত্ত্ব—ঠিক ঠিক যাঁর কথা, তিনি না বলিলে মানুষের জানিবার সাধ্য নাই। তাই শ্রীশ্রীব্রজচাতুরী শ্রীগৌরহরি আসিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আর আজ শ্রীগৌরমাধুরী শ্রীবন্ধুহরি জানাই-তেছেন, ইহাতে কোনরূপ বিস্ময়ের কারণ নাই। শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমুখের মহাবাক্য শ্রীশ্রীগৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মলীলা বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

"অতি মহাবেদ গোপ্য এসকল কথা" "দুর্জ্ঞেয় চৈতন্য খেলারে"—এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াও পরিষ্কার কথায় কেন যে লিখেন নাই, তাহা বুঝিতে পারি না। হয়তঃ তৎকালীন দেশকাল বিবেচনা করিয়াই তিনি ঐ রহস্য প্রকাশে বিরত রহিয়াছেন। তবে সদ্যোজাত শিশুর বর্ণনায় একস্থলে লিখিয়াছেন,—

"চন্দনে উজ্জ্বল বক্ষ পরিসর
দোলয়ে তাহা বনমাল।
চাঁদ সুশীতল শ্রীমুখমণ্ডল
আজানু বাহু বিশাল॥"

মাতৃগর্ভ হইতে সদ্যজাত শিশুর চন্দনচর্চ্চিত বক্ষ আর বনমালা শোভিত গলদেশ হয় কি? এস্থলে প্রকৃত তথ্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন। আর আবির্ভাবের সময়টি যে! আহা! কি সুন্দর! ভাবিলেই হৃদয়খানা আনন্দরসাপ্লুত হয়॥

"...নিরবধি চতুর্দ্দিকে হরি সংকীর্ত্তন॥
কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজন দুর্জ্জন।
সভে হরি হরি বোলে দেখিয়া গ্রহণ॥
হরিবোল্ হরিবোল্ সবে এই শুনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি॥
চতুর্দ্দিক পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
জয়শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ॥
হেনই সময় সর্ব্বজগত জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)।

শ্রীল কবিরাজগোস্বামী গর্ভাধানের বর্ণনা দিয়াছেন—

"জগন্নাথ কহে,—আমি স্বপন দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল॥
আমার হৃদয় হ'তে তোমার হৃদয়।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়॥"

(—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)।

শ্রীমৎ লোচনদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর "জন্মলীলা" বর্ণনা করিয়াছেন। অযোনিসম্ভব সম্বন্ধে তিনিও কিছু পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। তবে যে "অমিয়" পদের ভাষ্য রচনা করিতেছি, দাসঠাকুর সে অমিয়া ছানিয়া লুটিয়া লইয়াছেন। শ্রীদেহখানি যে প্রাকৃত নয়, সব টুকুই যে অমৃতময় তাহা বহুবার বলিয়াছেন।

"ঝলমল গোরা অঙ্গ কিরণ অমিঞা"
"নয়নে লাগিল সভার অমিয়া অঞ্জন"
"প্রতিঅঙ্গে অমিয়া সঞ্চরে রাশি রাশি।
নিরখিতে নয়নে হৃদয়ে কেনে বাসি॥"
"গৌরনাগরিমা গন্ধে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড।
প্রতি অঙ্গে রস রাশি অমিয়া অখণ্ড॥"

শাস্ত্রেও স্পষ্টোক্তি দেখিতে পাই—

'ন তস্য প্রাকৃতামূর্ত্তি র্মাংসমেদোঽস্থিসম্ভবা।
ন যোগীত্বাদীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোঽচ্যুতোবিভুঃ॥'

তাঁহার মূর্ত্তি প্রাকৃত মেদ-মাংস-অস্থি-সম্ভব নহে। তিনি ঈশ্বর, ঈশনশীল পুরুষ, সত্যরূপ অচ্যুত ও বিভু॥

এখন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-বন্ধুহরির মহাবাণী শুনুন।

"...মানুষের মাঝে মানুষ হইয়া আসিলেও মায়ার অতীত বস্তু। সুতরাং অপ্রাকৃত। 'প্রাকৃত মানুষ নহে নিমাই পণ্ডিত।' অযোনি-সম্ভব। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতার অঙ্গজ্যোতি হইতে মহাপ্রভুর আবির্ভাব।"

শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর এই বাণী হইতে শ্রীমহাপ্রভু গৌরহরি যে অযোনিসম্ভব তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না। শ্রীশ্রীকৃষ্ণরূপে যেদিন আসিয়াছিলেন, সেদিনও অযোনিজাত, শ্রীশ্রীগৌররূপে যেদিন আসিয়াছিলেন সেদিনও অযোনিজাত। আর আজ এই দুই লীলার মহামিলনশক্তি লইয়া এই শুভলগ্নে অপ্রাকৃত তরুণ শিশুটি মুর্শিদাবাদের গঙ্গার কূলে উদয় হইলেন। তিনি অযোনিসম্ভব না হইবেন কেন?

মূলে "অমিয়" পদটী প্রয়োগ দ্বারা ভাবুক গ্রন্থকার এই এতগুলি কথা বলিয়াছেন।

"হৃদয় সরোজ বিকশিত করিয়া" :—

এই বাক্যের ভাষ্য পূর্ব্বেই করিয়াছি। সম্প্রতি "করিয়া" এই অসমাপিকা ক্রিয়া প্রয়োগের নিগূঢ় তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ অলোচনা করিব।

বাঙ্গলা ভাষায় "ইয়া" প্রত্যয় সংস্কৃত ব্যাকরণের "ক্ত্বাচ্" প্রত্যয়ের অনুরূপ। ঐ প্রত্যয় সম্বন্ধে পাণিনিসূত্র,

যথা—"সমান কর্ত্তৃকয়োঃ পূর্ব্বকালে।" ৩।৪।২১।

দুই ক্রিয়ার কর্ত্তা এক হইলে ও এক ক্রিয়ার ঠিক অব্যবহিত পরে আর এক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রিয়ায় ক্ত্বাচ প্রত্যয় যোগ হয়। দীননাথ ও বামাদেবীর সুষুম্নাদি ত্রিতন্ত্রবিরাজিত হৃদয়সরোজদ্বয় বিকশিত করিলেন যিনি, গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়া আসিয়া অঙ্কদেশ আলোকিতও করিলেন তিনি। তবে দুইটি মূর্ত্তিতে একটু প্রভেদ আছে। গ্রন্থকার ইড়া বা পিঙ্গলা ব্যবহার না করিয়া সুষুম্না পদ প্রয়োগ দ্বারা তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুষুম্না যমুনার আর একটি নাম। তথাহি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে—শ্রীবৃন্দাবনতত্ত্ববর্ণনপ্রসঙ্গে,—

"কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী।"

হৃদয়ে, কালিন্দীতটবিহারী কালাচাঁদরূপে, আর বাহিরে অভিনব শিশুমূর্ত্তি শ্রীহরিপুরুষরূপে। গোপালের কথা ভাবিতে ভাবিতে যখন উভয়ে বাৎসল্যরসসাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন, তখনই হৃদয়ে বালগোপালরূপে দেখা দিয়া ঠিক অব্যবহিত পরমুহূর্ত্তে শ্রীহরিপুরুষরূপে ক্রোড়দেশে আরোহণ করেন। পূর্ব্বে শ্রীদীননাথ ও পরে শ্রীবামাদেবী যখন নয়ন উন্মিলন করিয়াছেন, তখন অন্তরের মূর্ত্তি বস্তুতঃ তিরোহিত হইয়াছে। তবে (after image এর মত) তখনও সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি যেন চোখের উপরে হাসিতেছিল। দীননাথ উভয়তঃ প্রাজ্ঞ। অন্তরের আলোকময় মূর্ত্তিখানি কিরূপে বাহিরের আলোতে মিশিয়ে গেল, তাহা তিনি বেশ দেখিতে পাইলেন। "করিয়া" পদ দ্বারা ইহাই জ্ঞাপিত হইয়াছে।

এ'কথায় আপত্তি করিয়া কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, এইরূপ হইবার কারণ কি? তজ্জন্য আসুন, সাত্বত-সংহিতা শ্রীভাগবতশাস্ত্রের একটি শ্লোকাস্বাদন করিয়া লই।

"ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দ্দনে।
দম্পত্যোর্নিতরামাসীদ্ গোপগোপীষু ভারত॥"

বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ, ধরানাম্নী ভার্য্যার সহিত ব্রহ্মার নিকট বর চাহিয়াছিলেন, 'ভগবান্, আমরা দুইজন ভূতলে জন্মগ্রহণ করিলে আমাদের দুই জনেরই যেন বিশ্বেশ্বর শ্রীহরিতে পরমা ভক্তি উৎপন্ন হয়।' বিরিঞ্চিদেব 'তথাস্তু' বলিয়া বরদান করেন। সেই মহাযশস্বী দ্রোণ ব্রজমণ্ডলে নন্দ ও দ্রোণভার্য্যা ধরাই যশোদা। সেই কারণে জনার্দ্দন ভগবান্ পুত্রীভূত হইলে, ব্রজগোপগোপীর মধ্যে এই দম্পতীর নিরতিশয় ভক্তি হইয়াছিল।

পুত্র শব্দের উত্তর 'চ্বি' প্রত্যয়যোগে পুত্রীশব্দ নিষ্পন্ন হয়। তাহার অর্থ এই যে, যিনি কখনও অন্যের পুত্র হয়েন না, সেই কৃষ্ণ নন্দযশোমতীর পুত্রভাবে সঞ্জাত হইয়াছিলেন।

কারণ শ্রীজীব লিখিয়াছেন,—

"বাৎসল্যাভিধপ্রেমবিশেষেণৈব শ্রীকৃষ্ণঃ পুত্রতয়োদেতি **ন তু স্বদেহাদাবির্ভাবেন**; হিরণ্যকশিপুসভাস্তম্ভে শ্রীনৃসিংহস্য, ব্রহ্মণি শ্রীবরাহস্য পিতৃত্বপ্রয়োগাৎ **ন চ গর্ভপ্রবেশেন** পরীক্ষিদ্রক্ষণার্থং তৎপ্রবিষ্টত্বাপি তন্মাতুত্তরামাতৃত্বাশ্রবণাৎ। তাদৃশ প্রেম্ণা তু তয়োঃ সমুদ্রিক্তশ্চ শ্রীব্রজেশ্বরয়োরেব। অতএব গর্ভে

প্রবেশাদিকং বিনাপি তয়োঃ পুত্রত্বং তস্য প্রসিদ্ধিঃ। ততঃ শ্রীনারদপ্রহ্লাদ ধ্রুবাদিষু দর্শনাৎ সর্ব্বসম্মতত্বাৎ তাদৃশপ্রেমবিষয়ত্বেন সাক্ষাৎ শ্রীভগবদাবির্ভাবাব্যবহিতপূর্ব্বপ্রচুরকালং ব্যাপ্য সন্তত তদাবেশ শ্রীব্রজেশ্বরয়োর্ রূপাবস্থমেব কল্পতে ব্রহ্মবর প্রার্থনয়াপি তদেব লভ্যতে ইতি সমান এব পন্থাঃ। বাৎসল্যং তত্রাধিক্যং যেন বিনা তস্য পুত্রভাবো ন সম্ভবতীত্যত্রৈব পুত্রতাং মন্যামহ ইতি পুত্রীভূত ইত্যস্য ভাবঃ॥" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ)

বাৎসল্য-নামক প্রেম-বিশেষের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। কিন্তু কাহারও দেহ হইতে নির্গত হইয়া পুত্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন না। যদি তাহাই হইত, তবে হিরণ্যকশিপুর সভাস্থিত স্তম্ভকে শ্রীনৃসিংহদেবের পিতা বল না কেন? তবে ব্রহ্মার নাসিকা হইতে আবির্ভূত শ্রীবরাহদেবের ব্রহ্মাতে পিতৃত্ব প্রয়োগ হয় না কেন? যদি বল, ইঁহারা তো গর্ভ হইতে আবির্ভূত হয়েন নাই, কাজেই ইঁহারা কাহারও পুত্র হইতে পারে না, যিনি গর্ভপ্রবেশ করেন, তিনিই পুত্র হইতে পারেন। এই কথাও বলিতে পার না, কারণ তাহা হইলে পরীক্ষিতের রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তাহাকে ইঁহার মাতা বল না কেন? সুতরাং বাৎসল্য-প্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাদিবিহীনরূপে নন্দ যশোমতীতে সম্পূর্ণরূপে উদিত হইয়াছিল। আজ আরও মধুর মধুর হইয়া সেই বাৎসল্য দীননাথ ও বামাদেবীর হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করিয়া রাখিয়াছে,তাঁহারা যেন সিন্ধুমাঝে ডুবিয়া গিয়াছেন। গর্ভ প্রবেশাদি ব্যতীতই যেমন শ্রীকৃষ্ণ যশোদানন্দন,ঠিক তদ্রূপ গর্ভাবাস না করিয়াই শ্রীহরিপুরুষ জগবন্ধু হইলেন বামাদেবী-অঙ্কশোভন। বহিঃ-প্রাকট্যের পূর্ব্বে ঐরূপভাবে মনে প্রকাশ আজ কেবল দীননাথ বামাদেবীরই হয় নাই, নন্দ-যশোমতীরও হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দেখা যায়। শ্রীনারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি মহাভাগবতগণ সম্বন্ধেও এইরূপ দেখা যায়। প্রথমে তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ তাহাদের ধ্যেয় বস্তুরূপে উদয় হইয়াছিলেন, পরে স্বরূপে বহিদৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। আবির্ভাবের এই রীতি সম্বন্ধে সর্ব্বসম্মতি দেখা যায়।

শ্রীভগবান্ নারদাদির যেমন প্রেমের বিষয়, ব্রজরাজ দম্পতীরও তেমন, জগন্নাথ দম্পতীরও তেমন, দীননাথ দম্পতীরও তেমন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবদাবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী-কালে সর্ব্বদা তাহাদের মনে শ্রীকৃষ্ণাবেশ হয়। গ্রন্থকার "করিয়া" পদ দ্বারা এই অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ইঙ্গিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিষয় সর্ব্বত্রই এক রীতি অর্থাৎ প্রেমবিশেষই তাহার আবির্ভাবের হেতু।

প্রেম-প্রভাবে প্রথমে মনে স্ফূর্ত্তি, পরে বহিঃ-সাক্ষাৎকার। শ্রীজীবের মতে "পুত্রীভূত" পদপ্রয়োগের এই তাৎপর্য্য। 'চি্ব' প্রত্যয় দ্বারা শ্রীশুকদেব যাহা জানাইয়াছেন, এস্থলে 'ইয়া' প্রত্যয় দ্বারা শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী তাহাই জানাইয়াছেন। বলিতে পারেন, উপানন্দ, কৃত্তিকা, ধনিষ্ঠা, অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী, গোলোকমণি দেবী, রাসমণি দেবী, দুঃখীরাম ঘোষ, দিগম্বরী দেবী সকলেই বাৎসল্য-রসের ভক্ত। ইহাদিগকে পিতামাতা বলি না কেন? একথার উত্তর এই যে যেরূপ বাৎসল্য-প্রেম ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণে পুত্রভাব সম্ভব হয় না, নন্দ-যশোমতীর হৃদয়ে সেইরূপ প্রেম প্রচুর, জগন্নাথ-শচী-দেবীর সেইরূপ প্রেম প্রচুরতর মধুরতর, দীননাথ-বামাদেবীর হৃদয়ে সেইরূপ প্রেম আরও গাঢ় আরও ঘনীভূত, প্রচুরতম, মধুরতম। এই জন্য শ্রীব্রজমণ্ডলের ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীব্রজ-রাজ দম্পতীকেই আমরা পিতামাতা বলি, এই জন্য শ্রীগৌড়-মণ্ডলের ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীমিশ্রদম্পতীতেই আমরা পিতৃত্ব-মাতৃত্ব আরোপ করি; এই জন্যই আজ শ্রীশ্রীবন্ধুধামগুলের ভক্তকুলের মধ্যে আমরা শ্রীন্যায়রত্ন দম্পতীকেই পিতামাতা বলিয়া মনে করিতেছি।

"পঞ্চতত্ত্বময়"

এই পদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছি। স্বরূপলক্ষণ নির্দ্দেশই এই পদপ্রয়োগের তাৎপর্য্য, এইরূপ সেখানে ব্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি রহস্যবিদ্ গ্রন্থকারের রচনা পরম চাতুর্য্যপূর্ণ, শুধু একটি উদ্দেশ্য লইয়াই একটি পদ প্রয়োগ করেন নাই। পঞ্চতত্ত্বময় পদ রচনার দ্বিতীয় আশয় অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিব। এই অলৌকিক জন্মকথা শুনিয়া সাধারণ মানুষ স্বতঃই জিজ্ঞাসা করিবে এই যে, সাধারণ মানুষের জন্ম হয় জননীর জরায়ু আশ্রয় করিয়া; শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম হইল মিশ্রবর ও শচীমাতার অঙ্গজ্যোতি আশ্রয় করিয়া; আর আজ শ্রীহরিপুরুষ আভির্ভূত হইলেন, গাভীর অশ্রু ও চন্দ্রের সুধা আশ্রয় করিয়া। উৎপত্তির আশ্রয় বা আধার সম্বন্ধে

এই পার্থক্য বেশ। কিন্তু দেহের উপাদান-কারণ সম্বন্ধে বিভিন্নতা কি? পিতৃশুক্র ও মাতৃশোণিত ব্যতীত দেহের উৎপত্তি কি কখনও সম্ভব? তত্ত্ববেত্তা গ্রন্থকার পঞ্চতত্ত্বময় কথাটি বলিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। কিরূপ উত্তর দিয়াছেন, তাহাই আস্বাদন করিব।

রজঃবীর্য্য সম্বন্ধ ব্যতীত দেহের জন্ম সম্ভব কিনা? তদুত্তরে স্বয়ং শ্রীত্রিকালগ্রন্থে লিখিয়াছেন। "মৃত্তিকাই জন্ম-মৃত্যুর কারণ; সুতরাং মায়া ও মিথুন অনাবশ্যক।" এই কথা শ্রীশ্রীপ্রভু সংসারের যাবতীয় জীব সম্বন্ধেই বলিয়াছেন। কৈমুতিক ন্যায়াশ্রয় করিয়া আমরা বলিতে পারি, সাধারণ মানুষ সম্বন্ধেই যখন তিনি এই কথা বলিয়াছেন, তখন যিনি জীবপাবন, তৎসম্বন্ধে আর অন্য কথা কি? এখন সংশয় হইতেছে এই, যে যদিও শ্রীত্রিকালগ্রন্থে মায়া ও মিথুন অনাবশ্যক এই কথা বলা হইয়াছে, তথাপি কামনাবদ্ধ জীব আমরা কিছুতেই ঐ কথাতে আস্থাবান্ হইতে পারি না। আসুন দেখি, প্রাচীন শাস্ত্র এসম্বন্ধে কি বলিয়াছেন।

ভারতীয় ষড়দর্শনের মধ্যে পদার্থতত্ত্ব-নির্ণয়ে বৈশেষিক দর্শনই সিদ্ধহস্ত। বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্যগ্রন্থে পৃথিবীতত্ত্ব নিরূপণাবসরে ভাষ্যকার পদার্থ ধর্ম্মবেত্তা আচার্য্য প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন :—

"শরীরং দ্বিবিধং যোনিজং অযোনিজঞ্চ। তত্রাযোনিজং অনপেক্ষশুক্রশোণিতং দেবর্ষীণাং শরীরং ধর্ম্মবিশেষসহিতেভ্যোঽণুভ্যো জায়তে। ক্ষুদ্রজন্তূনাং যাতনাশরীরাণ্য ধর্ম্মবিশেষসহিতেভ্যোঽণুভ্যো জায়ন্তে। শুক্রশোণিতসন্নিপাতজং যোনিজম্।" বৈশেষিক দর্শন।

কন্দলীকার দার্শনিকপ্রবর শ্রীধর টীকায় বলিয়াছেন ;—

'অন্বয়ব্যতিরেকাবধারিতকারণভাবস্য শুক্রশোণিতস্য অভাবে কথং শরীরোৎপত্তিরিত্যত আহ ধর্ম্মবিশেষ সহিতেভ্যো বিশিষ্যতে ইতি বিশেষঃ ধর্ম্ম এব বিশেষঃ ধর্ম্মবিশেষঃ প্রকৃষ্টোধর্ম্ম স্তৎসহিতেভ্যোঽণুভ্য ইতি।'

এই সকল শাস্ত্রবাক্য ও শ্রীশ্রীপ্রভুর বাণী হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে শুক্রশোণিত সম্পর্ক ব্যতীতও দেহোৎপত্তি সম্ভব। শ্রীশ্রীপ্রভু লিখিয়াছেন, মৃত্তিকাই জন্ম মৃত্যুর কারণ। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—পার্থিব পরমাণুই পার্থিব দেহের কারণ। একই কথা সাধারণতঃ সম্মিলিত শুক্রারম্ভক পরমাণু ও শোণিতারম্ভক পরমাণু জঠরানল সম্পর্কে দ্ব্যণুকাদিক্রমে জীবদেহ গঠন করে। এই দেহের বিভিন্ন প্রকারভেদ হইবার কারণ জীবাত্মার ভোগাদৃষ্ট। অদৃষ্ট অর্থ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। মহাপাতকাশ্রিত আত্মা অধর্ম্মবশতঃ যোনিসম্পর্ক ব্যতীতই পাপময় পরমাণু সংগ্রহ করিয়া দংশমশকাদি-দেহ তৈয়ার করিয়া লয়। জীবের মঙ্গলসাধনরূপ বিশিষ্ট ধর্ম্মাশ্রিত দেবর্ষিগণের পুণ্যাত্মা ভগবদিচ্ছায় শুক্রশোণিত সম্পর্ক ব্যতীতই সুপবিত্র পরমাণু সংগ্রহ করিয়া দেহ তৈয়ারী করতঃ তাহার আশ্রয়ে বাস করে। মোটকথা, আমরা বুঝিলাম, ধাতুসম্বন্ধ ভিন্নও দেহোৎপত্তি সম্ভব। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে অনেক কথা সময়ান্তরে আলোচনীয়। প্রকৃতস্থলে বক্তব্য বিষয় এই, যে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে অযোনিসম্ভব তাহাতে কোন সংশয় নাই। তবে তাঁহার শ্রীদেহের উপাদান কি, তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীত্রিকালগ্রন্থে লিখিয়াছেন—"পঞ্চমিলনে এক এক বিগ্রহ শরীর।" **শরীর** পদটী উল্লেখ করিয়া স্পষ্টই জানাইয়াছেন,—রাধাশ্যাম-বীরা কুন্দ ও ললিতা, এই পঞ্চ সম্মিলনে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীদেহ হইয়াছে। আর আজ এই শুভ সীতানবমীযোগে অপ্রাকৃত নবশিশুমূর্ত্তিতে শ্রীহরিপুরুষ প্রকাশমান হইলেন, তাঁহার শ্রীদেহের উপাদান কি, গ্রন্থকার "পঞ্চতত্ত্বময়" পদ দ্বারা তাহাই জানাইয়াছেন। গৌর-নিতাই-অদ্বৈত-শ্রীবাস-গদাধর, এই পঞ্চতত্ত্বের মহামিলনেই শ্রীশ্রীহরিপুরুষের মহাকায় উৎপন্ন হইল। কেহ কেহ আপত্তি তুলিবেন, "রাধাশ্যাম-বীরাকুন্দললিতাসুন্দরী" এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ, শ্রীদেহতত্ত্ব নহে। গৌর নিতাই অদ্বৈতাদি পঞ্চতত্ত্ব শ্রীহরিপুরুষের স্বরূপ, সে কথা অত্র ভাষ্যগ্রন্থেও পীতবর্ণ পঞ্চতত্ত্বময় পদের ব্যাখ্যাস্থলে কথিত হইয়াছে। তাহা আবার শ্রীদেহতত্ত্ব হইল কিরূপে? আর যে বস্তু নিত্য, তৎসম্বন্ধে উৎপন্ন হইল একথাই বা সঙ্গত হয় কিরূপে?

এই আপত্তির উত্তর দিতেই হইবে। কারণ একটু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পঞ্চতত্ত্বময় পদ দ্বারা স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আবার এখনই যদি বলি, উক্ত পদ দ্বারা শ্রীদেহতত্ত্ব বলা হইয়াছে, তবে নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাষী পাগল সাব্যস্ত হইব। কারণ, মানুষ জানে স্বরূপ-অর্থ যাহা চিরকাল স্থির থাকে, আর রূপ-অর্থ যাহা স্বরূপের আবরণ—কিছু সময়ে স্বরূপটী যে আশ্রয়ে বাস করে। কিন্তু এই ধারণা লইয়া যদি মানুষ

অগ্রসর হয়, তবে কেবল মাদৃশ অজ্ঞকে নহে, সুপ্রজ্ঞাসতী শ্রুতিদেবীর উক্তিকেও অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিতে হইবে। কারণ দেখুন শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন—

'তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং
পঞ্চপদং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং
সমরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি।'

(পূর্ব্বতাপনী)। ৩৫।

ব্রহ্মা বলিতেছেন 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষমূলে সতত বিরাজমান। তিনি পঞ্চপদাত্মক। আমি মরুদ্গণের সহিত উৎকৃষ্ট স্তুতি দ্বারা তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করি।'

প্রথম কথা এই যে, শ্রীকৃষ্ণরূপই ধ্যানধারণার মঙ্গল অর্থাৎ শোভন ও সুন্দর বিষয়। সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সর্ব্বকারণের কারণ সেই শ্রীকৃষ্ণরূপ। কিন্তু রূপ-সম্বন্ধে মানুষের ধারণা এই যে, তাহা নশ্বর। সেই রূপ যদি না থাকে তবে কোন্ বস্তুতে চিন্তা ধারণা করিবে? শ্রুতি তাই বলিয়াছেন; 'বৃন্দাবনে বৃক্ষমূলে সতত বিরাজমান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।'

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপটি ধ্যান না করিয়া বিগ্রহ অর্থাৎ দেহটী ধ্যান করিলেন কেন? যাহা বিগ্রহ তাহা সৎ বা সতত বিরাজমান কি করিয়া হয়? আর তাহা না হইলে একটি অনিত্য বস্তু ব্রহ্মার সতত ধ্যানধারণার বিষয়ই বা কি করিয়া হয়?

শ্রীএকাদশ স্কন্ধোক্ত একটি শ্লোক স্বামিপাদ শ্রীধরের সঙ্গে আস্বাদন করিয়া পরে রহস্য বলিব।

"লোকাভিরামং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলং
যোগধারণয়াগ্নেয্যাঽদগ্ধ্বা ধামাবিশৎস্বকং॥" ৫।৩১।১১

শ্রীকৃষ্ণ আগ্নেয়ী-যোগধারণার বলে লোকাভিরাম স্বীয় তনু দগ্ধ না করিয়াই স্বশরীরে সুমঙ্গল স্বীয়ধামে গমন করিলেন। ভাবার্থদীপিকায় শ্রীপাদ শ্রীধর লিখিতেছেন:—

"যোগিনামিব স্বচ্ছন্দমৃত্যুভ্রমং বারয়তি লোকাভিরামমিতি অয়মর্থঃ। যোগিনো হি স্বচ্ছন্দ-মৃত্যবঃ স্বতনুমাগ্নেয্যা যোগধারণয়া দগ্ধ্বা লোকান্তরং প্রবিশন্তি ভগবাংস্তু ন তথা কিন্তু অদগ্ধ্বৈব স্বতনুসহিত এব স্বকং ধামং বৈকুণ্ঠাখ্যং অবিশৎ। তত্রহেতুঃ। লোকাভিরামঃ অভিতোরমণং স্থিতির্যস্যাঃ তাং জগদাশ্রয়ত্বেন জগতোঽপি দাহপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ। কিন্তু ধারণয়া ধ্যানস্য চ মঙ্গলং শোভনং বিষয়ং ইতরথা তয়োর্নির্ব্বিষয়ত্বং স্যাৎ দৃশ্যতে চাদ্যাপ্যুপাসকানাং তথৈব তদ্রূপ সাক্ষাৎকারঃ ফলপ্রাপ্তিশ্চেতিভাবঃ।' (শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, এই শ্লোকে যোগীগণের মত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দমৃত্যু নিষেধ করিতেছেন। ইহার অর্থ এই যে, যোগীগণের মৃত্যু ইচ্ছাধীন; তাঁহারা আগ্নেয়ী-যোগ ধারণ দ্বারা নিজতনু দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করেন, কিন্তু শ্রীভগবান্ তাহা করেন না। তিনি দগ্ধ না করিয়া নিজতনু সহ স্বধামে গমন করিলেন। কারণ সেই তনুতে সর্ব্বতোভাবে লোকসকলের স্থিতি; সুতরাং তাহা জগতের আশ্রয়। তাহা দগ্ধ হইলে জগদ্দাহ উপস্থিত হয়। আর শ্রীকৃষ্ণের রূপ জীবের ধ্যানধারণার সর্ব্বোত্তম বস্তু। অদ্যাপি ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করেন এবং দর্শনের যে ফল তাহা লাভ করেন। সেই শ্রীদেহের নির্ব্বিষয়তা আপত্তি হয়।

পরিব্রাজকচূড়ামণি সরস্বতী শ্রীপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ লিখিয়াছেন—

"অন্তর্ধ্বান্তচয়ং সমস্ত জগতামুন্মূলয়ন্তী হঠাৎ
প্রেমানন্দরসাম্বুধিং নিরবধি প্রোদ্বেলয়ন্তীবলাৎ।
বিশ্বং শীতলয়ন্ত্যতীববিকলং তাপত্রয়েনানিশং
যুষ্মাকং হৃদয়ে চকাস্তু সততং চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা।"

—চন্দ্রামৃত। ১৭॥

'সমগ্র জগতের অন্ধকার দূরকারী, রসসমুদ্রের উদ্বেলয়িতা, ত্রিতাপনাশী, বিশ্বশীতলকারী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অঙ্গচ্ছটা তোমাদিগের হৃদয়ে সতত প্রকাশিত হউক' এই বলিয়া আচার্য্যপাদ শিষ্যবর্গকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। এই শ্রীদেহচ্ছটা যদি অনিত্য হয়, তবে শ্রীগৌররূপের সতত ধ্যানের বিষয়ের নির্ব্বিষয়ত্বাপত্তি হয়। এখন দেখুন, স্বরূপ ও দেহ সম্বন্ধে মানুষের যে ধারণা, তাহা লইয়া বিচার করিলে স্বামিপাদ শ্রীধর ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপ্রবোধানন্দকেও বিরুদ্ধভাষী পাগল বলিতে হয় কিনা।

আসল রহস্য এই যে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের ও শ্রীশ্রীহরিপুরুষের রূপ ও স্বরূপ সম্বন্ধে কোন ভেদ নাই। শ্রীহরিকথায় আছে "স্বরূপ রে সে রূপ রে"। শ্রীত্রিকালগ্রন্থে "পঞ্চমিলনে এক এক বিগ্রহশরীর" এই স্থলে শরীর পদটী

দ্বারা ঐ কথা বিশেষভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তম্। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।" শ্রীগৌরহরির অমিয় অঙ্গে রাধা-শ্যাম দুই মিলিত। অতএব স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীশ্রীমন্-মহাপ্রভুর শ্রীদেহ অযোনিসম্ভব। উহা নিত্যধামের নিত্য সিদ্ধ পঞ্চ বিগ্রহ হইতে উৎপন্ন। এই উৎপত্তির আশ্রয় জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর অঙ্গজ্যোতি। তথা শ্রীহরিপুরুষের শ্রীদেহ গৌর, নিতাই, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর—এই পঞ্চতত্ত্বময়। তথাহি শ্রীমহানামগ্রন্থে—

"অদ্বৈত গৌর গদাধর শ্রীবাস নিত্যানন্দ।
পঞ্চতত্ত্বময় বন্ধু—আনন্দকন্দ॥"
"পঞ্চবিংশতিতত্ত্বময় স্বরূপ।"
"মধুর পঞ্চতত্ত্বময়রূপ প্রেমরসখনি।"

'হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু'

"গুরু-গৌরাঙ্গ-গোপী-রাধা-শ্যাম সব মিলিয়া এক হরিনাম। হরিবোল্ বলিলে সবই বলা হয়।" এই হরি-শব্দবাচ্য পুরুষ যিনি তিনিই হরিপুরুষ। তাঁহারই প্রকাশ নাম শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু। তথাহি শ্রীত্রিকালগ্রন্থে—
"হরিনাম প্রভু জগবন্ধু॥

"রূপে"

অধর যিনি, তিনি আজ ধরা পরিতে ধরায় আসিলেন। অরূপ যিনি, তিনি আজ রূপ লইয়া আসিলেন রূপের দেশে। গ্রন্থকার তাই "রূপে" প্রয়োগ করিয়াছেন।

তথাহি পাদ্মে—

"অনামরূপ এবাসৌ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
অকর্ত্তেতি চ যো বেদৈঃ স্মৃতিভিশ্চাভি ধীয়তে॥"

বেদ পুরাণ উপপুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি যাহাকে অকর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন,সেই এই ভগবান্ হরি ঈশ্বর, অনাম এবং অরূপ। তথা শ্রীলঘুভাগবতামৃতে—

'অপ্রসিদ্ধে স্তদ্গুণানামনামসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অপ্রাকৃতত্বাদ্রূপস্যাপ্যরূপোঽসাবুদীর্য্যতে॥'

রসিক রঙ্গদা টীকা বলেন, অপ্রসিদ্ধেঃ অনন্তত্বেন সম্যক্ বক্তুমশক্যত্বাদিত্যর্থঃ। গুণ ও নামের অনন্তত্বপ্রযুক্ত এই হরি অনাম, তথা রূপের অপ্রাকৃতত্বহেতু অরূপ-নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। প্রকৃতির সম্বন্ধ হেতু হরির কর্ত্তৃত্ব নাই, এই কারণে শ্রুতিস্মৃতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ হরিকে অকর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

'সম্বন্ধেন প্রধানস্য হরের্নাস্ত্যেব কর্ত্তৃতা।
অকর্ত্তারমিতি প্রাহুঃ পুরাণং তং পুরাবিদঃ॥'

অতএব এই যে অরূপ বা অপ্রাকৃত-রূপ শ্রীহরি গঙ্গার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে দীননাথের অঙ্কে উদিত হইলেন, প্রাকৃত জীব তাঁহাতে দেখিতে পাইল কি করিয়া? ঐ যে শ্রীরূপ উত্তর দিয়াছেন—

'ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্ব শক্ত্যা স্বেচ্ছা প্রকাশয়া।
সোঽভিব্যক্তো ভবেন্নেত্রে ন নেত্রবিষয়স্ততঃ॥'

তিনি নেত্রের বিষয় নহেন। স্বেচ্ছা প্রকাশিকা স্বয়ং প্রকাশত্ব শক্তি দ্বারা নেত্রের বিষয় হইয়া থাকেন। অতএব কৃপাশক্তি দ্বারা লোকলোচনের দর্শন-পথগত হইলেন। "রূপে" শব্দটীর দ্বারা গ্রন্থকার ইহাই জানাইয়াছেন।

নয়ন মেলিয়া দীননাথ দেখিলেন, বাহিরের আলো ভিতরের আলো এক হইয়া গিয়াছে। ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না-ধিষ্ঠিত চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নির কিরণ মলিন ও নিষ্প্রভ করিয়া একটি দিব্য লাবণ্যময় নিরুপমকান্তি শিশু কোলের উপর দুলিতেছে। দীননাথ অনুভব করিলেন, পরশে প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পুলক শিহরণ খেলিতেছে। দীননাথ পণ্ডিত, আত্মসম্বরণ করিবার চেষ্টা করিয়া "এই নাও" বলিয়া বামা-দেবীর কোলে প্রত্যর্পণ করিতে করিতে দেখিলেন—আলোক ছটায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত, অঙ্গগন্ধে গগন পবন আমোদিত। অপার্থিবপরশে বামাদেবীর চক্ষু খুলিয়া গেল। লাবণ্য আভায় অন্তর বাহির প্রভাময় হইয়া গিয়াছে। বাহ্যজ্ঞান মাত্রও নাই, পূর্ণচন্দ্র দর্শনে উচ্ছলিত সিন্ধুর মত শ্রীমুখদর্শনে বাৎসল্যরস-সিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কত না কত না সোহাগে আদরেব ধন বুকে চাপিয়া ধরিলেন। মুহূর্ত্তে দেহমনপ্রাণ সুশীতল হইল। কি ছার মলয়চন্দন! এ পার্থিব জগতে সে স্পর্শের তুলনা কোথায়? সতত মায়াময় বস্তুস্পর্শে আমাদের দেহ ব্যাধিময়, তাই অপ্রাকৃত সে স্পর্শের অনুভব নাই। আজ সুনির্ম্মল সুরধুনী ধারার মত মধুর বাৎসল্য-রসসিঞ্চনে বামাদেবীর হৃদয়খানা সরস সুন্দর; তাই ঐ স্পর্শমাত্র আনন্দ-স্পন্দনে দুলিতে লাগিল।

ভক্ত গাহিয়াছেন—

'ছোঁয়া ছুঁইর ব্যাধি যাবে যবে তোর
বুঝিবি ও' ছোঁয়ার মরম।
ছোঁয়ার আরাম আনন্দ-স্পন্দনে
দুলিছে বন্ধুর ধরম।"

"আবির্ভূত হইলেন।"

শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর লিখিয়াছেন;—

"এ সব লীলার কভো নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ॥"

শ্রীল শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতে একটি শ্লোকে বলিলেন—"সম্ভূতং।" স্বামিপাদ শ্রীধর টীকায় লিখিলেন—"সুনিষ্পন্নং।"

শ্রীরূপ লিখিলেন, "অর্থঃ সম্ভূতমিত্যস্য সম্যক্ সত্যমিতি-রীতঃ" সম্ভূত অর্থ সম্যক্ সত্য। মূঢ়বুদ্ধি অজ্ঞ আমি, আবির্ভূত অর্থে কি লিখিব ভাবিয়া আকুল: হইতেছি।

যাহা ছিল, তাহা প্রকাশ হইল! না, তাহাও নহে। কারণ যদি ছিল, তবে প্রকাশ হয় নাই কেন?

যাহা ছিল না, তাহাই প্রকাশ হইল! না, তাহাও নহে। কারণ যাহা ছিল না, তাহা প্রকাশ হইল কোথা হইতে?

"জগৃহে পৌরুষং রূপং" শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকপাদের সারার্থদর্শিনী টীকা শুনুন। এই টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ। যিনি টীকারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন :—

"নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যমেকং
তত্ত্বং নিত্যালঙ্কৃতব্রহ্মসূত্রং।
নিত্যৈ র্ভক্তৈর্নিত্যয়া ভক্তিদেব্যা
ভাতং নিত্যং ধাম্নি নিত্যে ভজামঃ॥"

নিত্য ধামের সেই নিত্যানন্দাদ্বৈতযুক্ত নিত্যমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যদেবকে যিনি নিত্য কাল ভজনা করেন, সেই বিশ্বনাথ "রূপং জগৃহে" পদের টীকা করিতে গিয়া চিন্তায় পড়িলেন। 'রূপং জগৃহে' পদের অর্থ 'রূপ' গ্রহণ করিলেন'। প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ তুলিয়াছেন,—

"ননু জগৃহে ইতি চেদুচ্যতে তর্হি তদ্রূপং পূর্ব্বং নাসীদিত্যাগত্যা তদ্রূপস্যানিত্যত্বং প্রসক্তং।" ওহে, পুরুষরূপ গ্রহণ করিলেন, এই কথা যে বলিলে তাহাতে সেই পটী পূর্ব্বে ছিল না, আজ হইল, এই প্রকার অর্থ হওয়াতে সেই রূপটী অনিত্য হইয়া পড়িল যে! "অত আহ সম্যগ্‌ভূতং পরমসত্যং পূর্ব্বপূর্ব্বমপি সদৈব স্বরূপেণ স্থিতমেব তৎ জগৃহে, লোকস্বষ্টার্থমুপাদত্ত গ্রহণস্য বিদ্যমানবস্তুবিষয়ত্বাৎ। ঘটস্যাবিদ্যমানত্বে ঘটং জগ্রাহ ইতি প্রয়োগদর্শনাচ্চ।"

উত্তর শুন। তাহা ছিল না, তাহা নহে। পরম সত্য সেই রূপ ইতঃপূর্ব্বে সদ্রূপে স্বরূপে স্থিত ছিল, তাহা গ্রহণ করিলেন। যদি বলি তিনি ঘট গ্রহণ করিলেন, তবে কি বুঝিবে ঘট ছিল না, তখন তখন তৈয়ারী করিয়া গ্রহণ করিলেন, নাকি সত্য বিদ্যমান ঘট, তাহাই গ্রহণ করিলেন?

বেশ! তবে, তাহাই যদি হইল, তবে এতক্ষণ জন্মরহস্য বলিলে কি? গাভীর অশ্রু ও চাঁদের সুধা আশ্রয় করতঃ যে পরমলাবণ্যময় শিশুটী সুরধুনীতরঙ্গে দুলিতে দুলিতে মধুর মধুর পিতৃশান্তভাববিগ্রহ দীননাথের ক্রোড়দেশটী আলোকিত করিলেন, তিনি এমনি ছিলেন, তবে আজ নূতন হইল কি? আসুন তবে আবার বিশ্বনাথের ভাষায় উত্তর শুনুন। "রাজা সেনাস্তং দিগ্বিজিগীষয়া স্বসঙ্গে জগ্রাহ ইতিবৎ।" রাজাও আছেন, সৈন্যসামন্তও আছে, রাজার দিগ্বিজয় ইচ্ছাও সতত হৃদয়ে আছে। এই একরূপ থাকা; আজ কিন্তু আর এক রকম নূতন-থাকা হইল; সৈন্যসামন্ত, অশ্বগজ রথরথী স্বসঙ্গে লইয়া রাজা আজ দিগ্বিজয় আশায় সত্যি সত্যি বিদেশী রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। জয় রব পড়িয়া গেল, এখানে ওখানে বিজয় নিশান উড়িতে লাগিল। "আবির্ভূত হইলেন" অর্থ এই, সর্ব্বতত্ত্বময় হরি ছিলেন ও আছেন, তাঁহার এই নিত্যশিশুমূর্ত্তি নিত্যে নিত্যকাল ছিলেন ও আছেন, তাঁহার জগদুদ্ধারণ ইচ্ছাও ছিল ও আছে, শ্রীদীননাথ-বামাদেবী ছিলেন ও আছেন, গঙ্গাদেবীও ছিলেন ও আছেন; তবে আজ এই শুভ সীতানবমীযোগে কি হইল? ভক্তগণ অনুভব করিয়া লউন, আমার আর বলিবার সামর্থ্য নাই॥

শ্রীবন্ধু-নবমী।

দিব্য জ্ঞানরূপা সীতাঠাকুরাণী,
যে শুভ মুহূর্ত্তে উজাল ধরণী;
সেই শুভ আজি নবমী দিবসে,
কে তুমি গো দেব মানবের বেশে?
তপত কাঞ্চন জিনিয়া বরণ,
মুখে মৃদু হাসি বঙ্কিম নয়ন;
দেখি দূরে লাজে পালায় মদন;
শশী কাঁদে কাঁদে তারা অগণন।
ওঙা ওঙা শিশু বলে থেকে থে'কে,
অস্ফুট সে ধ্বনি নাহি বোঝে লোকে;
কিন্তু আজি এ কি তব মুখে শুনি,
অনাহত সেই বাঁশরীর ধ্বনি।
আহা মরি মরি পুনঃ একি হেরি,
তোমার মাঝারে কিশোর কিশোরী
দেখিতে দেখিতে তাহাও লুকাল,
সেই দু'য়ে এক গৌরাঙ্গ হইল।
বুঝেছি বুঝেছি ওঙা নহে ওম্,
যে নাদেতে স্থিত অধঃ উর্দ্ধ ব্যোম্;
ব্যষ্টি সমষ্টি মিলি মহাজ্যোতি,
তাহার উপরে তোমার বসতি।
নন্দের নন্দন আনন্দ মূরতি,
সতী সত্য তুমি পুরুষ প্রকৃতি;
ত্যজিয়ে গোকুল ওহে বাঁকাশ্যাম,
রচেছিলে হেথা নবদ্বীপ ধাম।
ব্রজগোপী বেশে তুমি শেষ-শেষ,
শেখাও মানবে রাধাপ্রেম শেষ;
নির্ব্বাপিত শিখা প্রজ্জ্বলিত আশে,
আরও দুইবার বলেছিলে শেষে;
তাই, ঘোরা যামিনী দে'খে গুণমণি,
এসেছ বলিতে ভেব না ভামিনি;
হরি হরি ব'লে নামে প্রাণ ঢাল।
আঁধার ঘুচিবে মিলিবেরে আলো॥

শ্রীশ্রীউৎসব।

গুরুগৃহে অধ্যয়ন শেষ করিয়া প্রহ্লাদ পিতৃদেবের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। বুকে ধরিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করতঃ শিরাঘ্রাণ করিয়া দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপু কহিলেন;—

'প্রহ্লাদানূচ্যতাং তাত স্বধীতং কিঞ্চিদুত্তমম্' ॥

বৎস! এতাবৎ কাল গুরুর নিকট হইতে যাহা শিক্ষা লাভ করিয়াছ, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম যে কথাটি তাহাই বল, শুনি। প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন, পিতঃ!

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ ২২।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্" ॥ ২৩।৭।৪

জীবের চরম পরম প্রয়োজন—শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেম। আর তৎপ্রাপ্তির উপায়—

'শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পূজন বন্দন।
পরিচর্য্যা দাস্য সখ্য আত্ম নিবেদন ॥" চৈঃ চঃ।

'এই নয়টি অঙ্গ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পিত হইলেই সব হইল। পিতঃ! যাহা পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে ইহাই সর্ব্বোত্তম পড়া।'

বস্তুতঃ, সাধনের এই নয়টি অঙ্গ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রেত। তন্মধ্যে শ্রবণ ও কীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু সহজসাধ্য নহে। দেহ ও মন দুইটি না হইলে শ্রবণ বা কীর্ত্তন হয় না আর সেই দুইয়ের সহযোগিতা সর্ব্বদা ঘটিয়া উঠে কই? তাই শ্রীগোস্বামিপাদ তৃতীয় অঙ্গটীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

স্মরণ, মনের কার্য্য। কেবল তাহাই নহে, শ্রীশ্রীঠাকুর নরোত্তম কহিয়াছেন "মনের স্মরণ প্রাণ"। কথাটি কেবল সুন্দর ও মধুর নহে, গভীর দার্শনিক তথ্য পরিপূর্ণও বটে। জীবের চঞ্চল চিত্ত দিবানিশি কেবল এটা ওটা চিন্তা করিয়া বেড়ায়, একটিবার তাহাকে মোড় ফিরাইয়া প্রাণের দেবতার শ্রীচরণস্মরণে নিযুক্ত করিয়া দাও, আর সে অমনি সকল ভুলিয়া শ্রীরাতুলচরণ হইতে শ্রীমুখারবিন্দ পর্য্যন্ত ভাবিতেই থাকুক। সময় নাই, অসময় নাই, দিন নাই, রাত নাই, স্থান নাই, অস্থান নাই, কেবল স্মরণ আর মনন, সেই হাসিরাশি, সেই সাধাবাঁশী, সেই গঞ্জন গমন, সেই করুণ নয়ন। স্মরণ করিতে করিতে মনঃপ্রাণ নব ভাবে নবরসে সুরসিত হইবে। কেবল নিজে নহে, বিশ্ব জগৎ সহ পরিতৃপ্ত হইবে।

ভজনের এই স্মরণাঙ্গ হইতে শ্রীশ্রীবৈষ্ণবগণের উৎসবের সৃষ্টি হইয়াছে। আজ শ্যামচাঁদ বিনোদিনীকে লইয়া দোলায় দুলিয়াছিলেন, তাই আজ দোল-উৎসব; আজ কালিয়া বঁধু রাসমঞ্চে নাচিয়া ছিলেন, তাই রাস-উৎসব; আজ শ্রীরঘুনাথের দণ্ড হইয়াছিল, তাই শ্রীরাঘব-ভবনে দণ্ড মহোৎসব। উৎসব বলিতেই সুখের, আর শ্রীশ্রীজন্মোৎসব যেন সেই সকল সুখের উৎস। ভক্তি-অঙ্গ-শিক্ষা-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতনকে শ্রীমুখে বলিতেছেন;—

"কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ ॥"

আজ ভাদ্রপদী কৃষ্ণা-নবমী; নন্দালয়ে নন্দোৎসবে আনন্দ উৎস ছুটিয়াছে। নিত্যধামে যিনি নিত্যকাল গুপ্ত ছিলেন, আজ নন্দালয়ে সেই আনন্দ-দুলাল প্রথম প্রকাশ হইয়াছেন, তাই সারা গোকুল গোপগোপীকুল সহ পরানন্দরসে ডুবিয়া রহিয়াছে। আজ মাঘী শুক্লাত্রয়োদশী, শ্রীহাড়াই-গৃহিণী পদ্মাবতীর কোল আলো করিয়া মহাভুজ নিতাই আমার এক চাকায় উদয় হইয়াছেন। অচিরে আনন্দের বন্যা উঠিবে, তাই কীর্ত্তন রাগে প্রেমের পরাগে ধূলিময় গৌড়মণ্ডলে ধূর্জ্জট পরিক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। আজ শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা কলঙ্কী চাঁদের গায়ে মালিন্য মাখাইয়া নিষ্কলঙ্ক গোরাচাঁদ আজ শচীর অঙ্কে উদয় হইয়াছেন। প্রতিপ্রাণে তাই পুলকস্পন্দন খেলিতেছে, প্রেমের প্লাবনে শান্তিপুর ডুবুডুবু হইয়া নদীয়াপুর ভাসিয়া যাইতেছে যেখানে, যেভাবে, যেদিন যে লীলাটী করিয়াছেন, সেই ভাবের ভক্তের কাছে সেইখানে সেইদিন সেইলীলাটী স্মরণীয়; কিন্তু **জন্মোৎসব বিশ্বজীবের।** তাই আজ বিশ্ববাসীর আনন্দ। নিখিল শাস্ত্র পুরাণ পড়িয়া পড়িয়া, শ্রীগুরুর মুখে শুনিয়া শুনিয়া, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করিয়া করিয়া মানুষ জানিয়াছে, **তিনি আছেন।** কিন্তু আজ এই জন্মদিনে বিশ্বজীব একটি নূতন বার্ত্তা পাইল, তিনি কেবল আছেন নহে, **তিনি আসেন।** এই মানবের দেশে মানবের বেশ ধরিয়া আসেন। আসেন, ধার্ম্মিকের জন্য; আসেন ধর্ম্মের জন্য; আসেন, আমাদের মত মায়ান্ধ পাপীতাপীকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য। কল্পে কল্পে আসেন, যুগে যুগে আসেন। আসেন, আর্ত্তভক্তের ব্যাকুল ক্রন্দনে; আসেন, ভক্তসিংহ অদ্বৈতের তুলসীদলে আবাহনে, আবার 'ইচ্ছাধীন-অবতার কি ভয়রে' বলিয়া অভয় হস্ত দুটি তুলিয়া তুলিয়া ছুটিয়া আসেন; যখনে ইচ্ছা তখনে। তাই আজ শ্রীশ্রীজন্মোৎসবে সারা দেশময় আনন্দ, আনন্দসিন্ধু মাঝে ভক্তবৃন্দ—

'কেহ ডোবে কেহ সাঁতারিয়ে খেলে রসের উদগার তুলি'

আজ শ্রীশ্রীবৈশাখী সীতানবমী। আজ আমার প্রভু আসিয়াছেন। ধন্য বঙ্গাব্দ ১২৭৮! শতধন্য ধাম শ্রীশ্রীধাম, তাহাপাড়া। ধন্য ধন্য শ্রীশ্রীদীননাথ? ধন্য ধন্য শ্রীশ্রীবামাদেবী!

শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, প্রত্যক্ষ, স্মরণের পক্ষে বাধক।

বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। ত্রিশবছর যে কি আনন্দে কাটিয়া গিয়াছে তাহা ভক্তগণ বলিয়া ফুরাইতে পারেন না। ঐ পদ্মমুখের মধুরবাণী শ্রবণ আর যুক্তকরে গলবাসে আদেশ পালন। অহর্নিশি ঐ সঙ্গ, ঐ প্রসঙ্গ, ঐ খেলাধুলা, ঐ রঙ্গরস। ভক্তগণ যেন একটি স্বপ্নরাজ্যে বাস করিতেন। হঠাৎ ১৩০৯ সনে মৌনব্রত গ্রহণ করেন। প্রথম প্রথম শ্রীহস্তে লিখিয়া উপদেশ দিতেন ও কত কথা জানাইতেন। ১৩১৪ সনে তাহাও বন্ধ হইল। তখন কেবল প্রাণমাতান শ্রীঅঙ্গগন্ধ, আর হৃদয়জুড়ান গলার সাড়া—ইহাই ছিল ভক্তগণের অবলম্বন। তাই সেইবার হ'তে উৎসব দেখা দিল।

সেবাইত শ্রীকৃষ্ণদাস, উদ্যোগী শ্রীনবদ্বীপ, অগ্রণী শ্রীরমেশচন্দ্র। উৎসব অষ্ট প্রহর বটে, কিন্তু আনন্দ যেন মূর্ত্তি ধরিয়া শ্রীঅঙ্গনে বিরাজ করিল। এখানে তুমুল কীর্ত্তন, ওখানে পাঠ. এখানে ভাগবত কথা, ওখানে শাক্তবগণের ইষ্টগোষ্ঠী, সেখানে জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে অগণিত নরনারীর মহাপ্রসাদে পরিতুষ্টি। সেদিন শ্রীঅঙ্গনের একটী অপূর্ব্ব শ্রী হইয়াছিল। আনন্দে আনন্দময় নিজেই আত্মহারা হইয়া ভোগ গ্রহণের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

এই ভাবে পর পর ছয় বৎসর কাটিল। ১৩২০ সনে বীরভক্ত বাদল শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সময় হইতে উৎসব অভূতপূর্ব্বভাবে অনুষ্ঠিত হয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে সপ্তদিবস তুমুল সংকীর্ত্তন চলিতে লাগিল। অসংখ্য নরনারী একত্রিত হইয়া শ্রীঅঙ্গনের পবিত্র রজে গড়াগড়ি দিয়া ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইতে লাগিল। সেই শুভ দিনে সকলের প্রাণেই এক মহাভাবের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। ঐ শুনুন, প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত মুগ্ধ হইয়া গাহিতেছেন ;—

'মধুর লগন, প্রেমেতে মগন, সুর নর আদি সবে।
স্থাবর জঙ্গম, সাগর সঙ্গম, বিভোর বঁধুর ভাবে ॥
যত পশু পাখী, নাচে থাকি থাকি, আঁখিতে আঁখি রাখি।
প্রকৃতি হাসিছে, সুষমা ঝরিছে, প্রেমসুধারস মাখি ॥
বোবায় গাহিছে, খোড়ায় নাচিছে, অন্ধ দেখিছে চেয়ে।
হা বন্ধু হা বন্ধু. বন্ধু প্রাণ বন্ধু, ছুটিছে সকলে গে'য়ে ॥

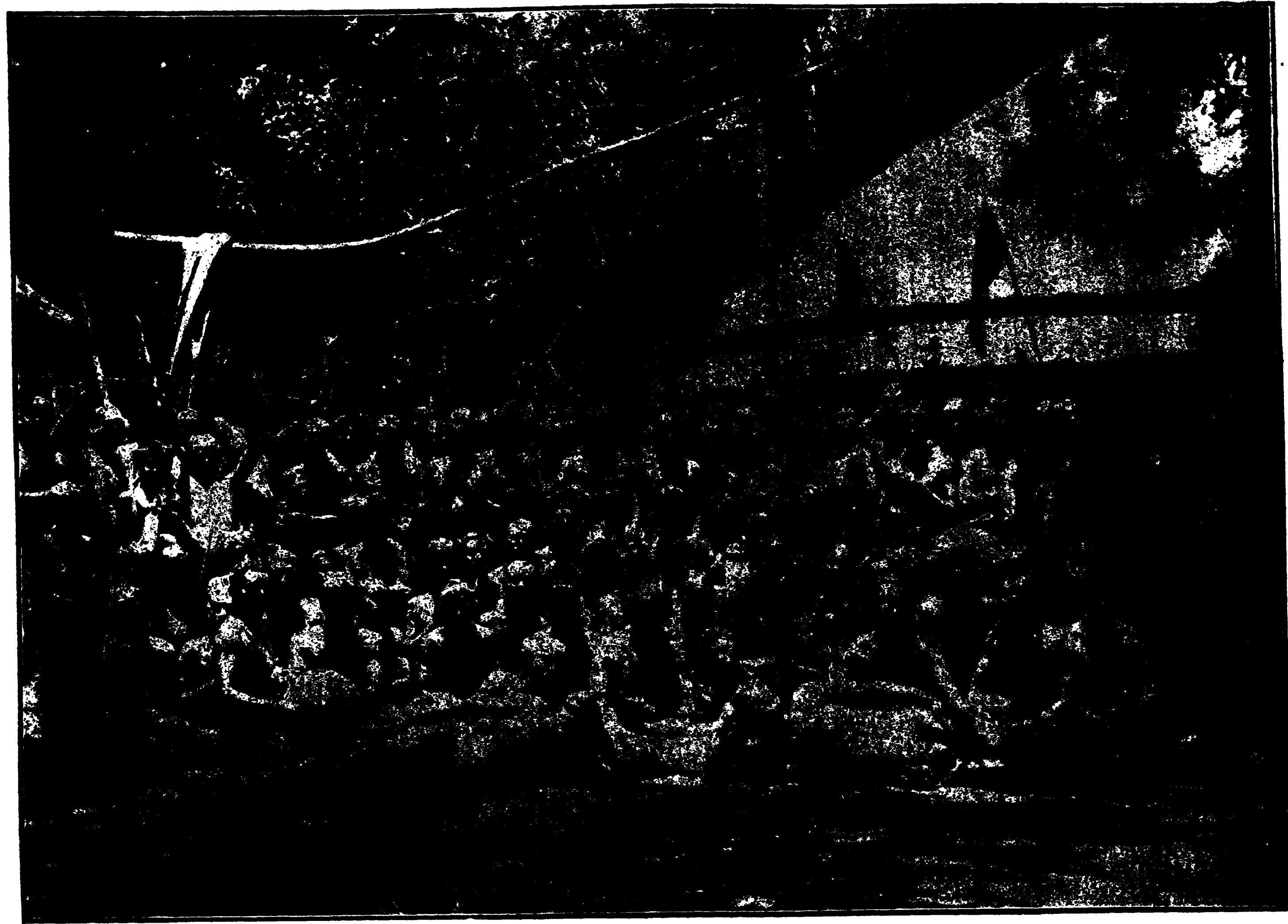
উৎসবান্তে নগর সংকীর্ত্তন। তারপর কাদামাটী কীর্ত্তন। তারপর জলকেলী। যাহারা সাক্ষাৎ না দেখিয়াছেন, তাহাদিগকে সে আনন্দের কথা লিখিয়া বুঝাইবার সামর্থ্য আমার নাই। পার্শ্বে একখানি চিত্র রহিয়াছে, ওখানি (অনুমান) ১৩২২ সনের কাদামাটীর চিত্র। চিত্রের এক দিকে শ্রীকৃষ্ণদাস অপর দিকে ভক্তকুলমণি ডাক্তার শ্রীসুধন্ব সরকার শায়িত। মধ্যস্থলে শ্রীরামসুন্দর। চতুর্দ্দিকে অগনিত ভক্ত, সবাই রজঃ মণ্ডিততনু। সবাই তন্ময়, জাতিগত সম্প্রদায়গত পার্থক্য, বিদ্যাবুদ্ধি বা বয়োগত বৈষম্য সব ভুল হইয়া গিয়াছে। সপ্ত দিবস কীর্ত্তন নর্ত্তনে শ্রীঅঙ্গনের রজঃরাণী ধরণীবাস ছাড়িয়া বাতাসে ভর করিয়া আকাশ পানে দেবলোকাভিমুখে ছুটিয়াছেন। 'মহীতলং ব্যাসং, কুর্ব্বন্ কুর্ব্বন্ ব্যোমেব ভূতলম্'। ভক্তগণ যেন সেই অতুল অমূল্য রজঃকে ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছেন না, তাই অশ্রুনীরে কুণ্ডনীর মিলাইয়া সারা আঙ্গিনা কর্দ্দমাক্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাতে লুণ্ঠন করিতেছেন আর গাহিতেছেন ;—

'আয়, হরিনামে, মাতি প্রেমে ধুলাতে লুটাইরে!'
'আয়, হরি রসে ভক্তিবশে মাতিয়ে মাতাইরে॥"

এইভাবে ১৩২৮ সন পর্য্যন্ত উৎসব শেষ হইয়াছে। যদিও উৎসবাদির সময় প্রাণারাম প্রভুর দর্শন বড় একটা কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না, তথাপি মহাউদ্ধারণ বন্ধুসুন্দরের মনোমঞ্জন শ্রীঅঙ্গগন্ধ ও রক্তরূপে বিদ্যুৎ-লতিকাবৎ এক ঝলক দর্শন প্রাপ্তির আশায় সহস্র সহস্র নরনারী ছুটিয়া আসিত। ১৩২৯ সনে সকলের সে আশাও ফুরাইল। সকলেই জানিল তাহাদের প্রাণারাম প্রভু সাময়িক সম্পূর্ণ রূপে লোকলোচনের অন্তরালে লুকাইয়াছেন। তাই ভক্তগণ স্ব স্ব ভবনে উৎসবানুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। দেশকে দেশ উৎসবানন্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। এদিকে শ্রীঅঙ্গনের উৎসবও দ্বিগুণাকার ধারণ করিল। শ্রীশ্রীমন্দির পরিক্রমণ করতঃ একটি কীর্ত্তন ধারা—সে নিরবচ্ছিন্নভাবে অপ্রতিহত গতিতে চলিতে লাগিল, আর শ্রীঅঙ্গন প্রাঙ্গণে সপ্তদিবস আর একটী ধারা. গঙ্গা যমুনার মত উভয়ে বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া বহিতে লাগিল। এইভাবে ১৩৩৬ সন পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইয়াছে। এবার আবার উৎসবের ধারা ফিরিবে বলিয়া আশা আছে। নবনটবর প্রভু যেমন নিত্য-নূতন, ভক্তগণও তেমনি তাহাদের প্রাণের দেবতাকে লইয়া নিত্য নূতন খেলা খেলেন।

ফরিদপুর সহরবাসী ভক্তগণ এবার অগ্রগামী হইয়াছেন। বুঝিবা তাহাদের সেই অতীত স্মৃতি পুনরায় জাগিয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী মৈত্রকুলতিলক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ও অক্ষয়.কুমার, মাননীয় মজুমদার কুলমণি শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র। বিদ্যাবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, বয়স সকল দিক দিয়াই সহর মধ্যে ইহারা বৃদ্ধ। তরুণ ভক্তমধ্যে অরুণ-সম ইন্দুভূষণ,নিত্যগোপাল, কুমার ধীরেন,মঙ্গল, প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ। ভক্ত চক্রবর্ত্তী শ্রীসুরেশ চন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ইহাদের যেরূপ উদ্যম ও ঐকান্তিকতা পরিস্ফুট হইতেছে, তদ্দর্শনে আমরা, এবারকার উৎসবে, আনন্দ আরও আরও অধিকতর ও প্রচুরতররূপে আস্বাদন করিব, এই আশায় দিন গণিতেছি।

"জয় জগদ্বন্ধু"



"ব্রজঃ মণ্ডিত তনু,—প্রণতি লুণ্ঠন। প্রদক্ষিণ-কীর্ত্তন,—শ্রীলীলা-গীয়ন॥"

হরিনাম লও ভাই, আর অন্য গতি নাই

হের প্রলয় এল প্রায়।

(যদি সৃষ্টি রাখ ভাই) (হরিনাম প্রচার কর)



প্রকাশকের নিবেদন :—

মহাউদ্ধারণ মহাধর্ম্মগ্রন্থ 'আঙ্গিনা' বৎসরে চারিখণ্ডে বিভক্ত হইয়া বাহির হইবে। প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিনয়াবনত—গোপীবন্ধু দাস।

কন্তার প্রিণ্টার—সরকার প্রেস—২৫নং গোপাল বসু লেন, কলিকাতা।



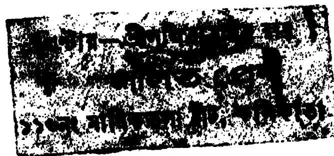
(মহাধর্ম্ম মহাউদ্ধারণ গ্রন্থ)



বান্ধব-দাসানুদাস
মহানামব্রত
সম্পাদিত।

শ্রীশ্রীমহানাম সম্প্রদায় সেবক
গোপীবন্ধুদাস
কর্ত্তৃক—

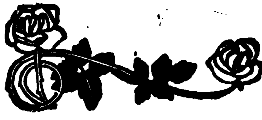
ফরিদপুর
শ্রীশ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন হইতে প্রকাশিত।



মহাভাবে বিভোর



শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু সুন্দ



আঙ্গিনা



প্রথম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা | শ্রাবণ

হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।
চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীট পতন ॥
(প্রভু প্রভু প্রভু হে) (অনন্তানন্তময়)

শ্রীশ্রীঝুলন পূর্ণিমা
শ্রীহরিপুরুষাব্দ—৬০
১৩৩৭

বন্ধু-লীলা-সুধানিধিঃ।

বিলোক্য পাপাকুললোকদৌস্থ্যং
তদুদ্ধৃতৌ বদ্ধমতি র্দয়াতঃ।
বঙ্গেষু যঃ পুরুষ আবিরাস্তে
তং শ্রীজগদ্বন্ধু হরিং ভজামি ॥ ১ ॥

বিধায় সৌন্দর্য্যনিধান মদ্ভুতং
জগজ্জনাসেচনকং মনঃ প্রিয়ম্।
বপুর্বিনির্দ্ধূত সমস্ত পাতকং
পুরশ্চকাস্ত্যস্থ মুরং দ্বিষন্ হরিঃ ॥ ২ ॥

সুবর্ণ বর্ণাঞ্চিত চারু গাত্রঃ
সুনেত্র বিত্রাসিত পদ্মপত্রঃ।
কটাক্ষ বিক্ষোভিত মারগর্ব্বঃ
সোঽয়ং হরি র্মর্ত্ত্য তনু বিভাতি ॥ ৩ ॥

অয়ং চতুর্হস্তমিতায়তাকৃতি-
শ্চন্দ্রামৃতেনেব বিসৃষ্ট বিগ্রহঃ।
সংসার কীটত্ব নিপাত কারকঃ
প্রভুর্জগদ্বন্ধুরনাদ্যনন্তকঃ ॥ ৪ ॥

ফরীদপুর্য্যামুররীকৃতস্থিতিঃ
শ্রীঅঙ্গনাহ্বেঽতি বিবিক্তধামনি।
অশ্রান্ত সংকীর্ত্তিত কৃষ্ণনামভি
র্দিশশ্চতস্রো ধ্বনয়ন্ ব্যরাজত ॥ ৫ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাম স্বামী।
প্রতাপগড়, আলোয়ার।

"জয়ং গবন্ধু"

রসোদ্গার।

বুক খানির ভিতরে এসে হেসে হেসে ঘেসে ঘেসে
চুপি চুপি কেরে তুই চুমো খাস্ ভাই।
পুনঃ কি এলি মনি নীল-পীত-মণি মণি,
জগবন্ধু জগমণি হাদে রে সুধাই॥
দগধ মন মুগধ চাঁদ স্নাত মলয় মোদ
একলে ও কুলহরা রূপগাঁথা গাই।
বনলতা সুশোভন গজ মতি নিন্দন
চালিতা কুসুম ঘোম্টা কুঞ্জপানে ধাই॥

(তাহে) ভৃঙ্গ সহ ভৃঙ্গবধূ লুটিছে পরাগ-মধু,
সে মহানাম মধু পিয়ে সাগর নাচাই।
তা-তা-থৈ তা-তা-থৈ তা-থৈ তা-থৈ-থৈ
মহোদ্ধারণ-ধারায় সাঁতার খেলাই॥
পৌণে চারিহস্তময় প্রেমরস উগরয়,
এ হেন অঙ্গন রঙ্গে সাধ গড়ি যাই।
একে শিশু শিশুমতি তাহে মতিছন্ন-মতি,
বলে আর বৈকুণ্ঠ-বৈভবে কাজ নাই

চারিহস্ত।

ভক্তি—ক্ষীর, মধুর অথচ তরল। জ্ঞান—মিশ্রী, মধুর অথচ ঘন। মিশ্রী দুগ্ধ সম্মিলনে দ্রব ও অদৃশ্য হয়; কিন্তু ক্ষীরের (দুগ্ধের) মাধুর্য্য বৃদ্ধি না করিয়া লুকায় না। তাদৃগ্ধর্ম্মানুবর্ত্তি জ্ঞানঘনবস্তু বিশুদ্ধ ভক্তি-ক্ষীর সংযোগে নিজমূর্ত্তি লুকাইয়া ফেলে, অথচ ভক্তির ঔজ্জ্বল্য মাধুর্য্যাদি বিবর্দ্ধিত করে। সুতরাং জ্ঞানের আলস্যই ভক্তির পুষ্টিসাধক। জ্ঞান ভক্তির ঈদৃশ অপূর্ব্ব পাকময় পূর্ণমাধুর্য্যপুর নিরুপমোজ্জ্বল রসায়ন বস্তুই শ্রীগৌরচন্দ্র—জ্ঞান ভক্তির সরবৎ-সুধা। জ্ঞান উহাতে প্রচ্ছন্ন বা অলস; ভক্তি উহাতে প্রকাশস্বরূপা, নিরলসা এবং তরঙ্গময়ী। অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ রাধাসুধাপ্রেম-পীযূষে লুক্কায়িত—"অন্তঃ কৃষ্ণো বহির্গৌরঃ।" জ্ঞানশূন্যা কেবলা ভক্তির পরামূর্ত্তি—শ্রীগৌরাঙ্গ।

ইক্ষুদণ্ড—জ্ঞান; তদ্রস—ভক্তি। ইক্ষু পক্ক হইলে, তদ্রস সুরস সুমধুর হয়। সেই রস আস্বাদন করিতে, ইক্ষু-দণ্ড চর্ব্বণ করিতে হয়। রস পান করা হইলে, ইক্ষুদণ্ড ছোবড়া হয় ও পরিত্যক্ত হয়। তদ্রূপ জ্ঞানদণ্ডে (Stalk) সঞ্জাত রসই ভক্তি। তদাস্বাদনে জ্ঞান অনাদৃত ও পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু জ্ঞান ছাড়িয়া ভক্তির উদ্ভব অসম্ভব। এই জ্ঞানশূন্যা ভক্তির পরামূর্ত্তি—শ্রীগৌরাঙ্গ।

(ক + খ)^{৩} = ক^{৩} + ৩ ক^{২}খ + ৩ কখ^{২} + খ^{৩} গণিতের এই বীজশক্তিতে পরিলক্ষিত হয় যে 'ক' বা জ্ঞানের শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া অবশেষে শেষ সংখ্যায় ('খ^{৩}"তে) শূন্যে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ জ্ঞান কমিতে কমিতে শেষ সংখ্যায় শূন্য হইয়াছে। আবার "খ" ভক্তি প্রথম সংখ্যায় শূন্য থাকিয়া শেষ 'খ^{৩}" তে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথম সংখ্যায় ("ক^{৩}"তে) জ্ঞান পূর্ণ, ভক্তি শূন্য আবার শেষ সংখ্যায় ভক্তি পূর্ণ, জ্ঞান শূন্য। এই গাণিতিক সত্যানুযায়ী ভক্তির উদয় বা জয় যতই হইতে থাকে, জ্ঞান ততই ক্ষয় পাইতে থাকে এবং পূর্ণভক্তিতে জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। এই লুপ্ত জ্ঞানভক্তির পরামূর্ত্তি—শ্রীগৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গ (গৌরী যাহার অঙ্গে, অথবা গা + ও + রঙ্গ = যিনি গান ও রঙ্গ বা নৃত্যের)।

এই জ্ঞানশূন্য কেবলা ভক্তিলীলারসে নিমগ্ন থাকিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ একদা ভাবিলেন, এই ভাবে চিরদিন চলিবে না, ভারতক্ষেত্রের কল্যাণ করে—

"আর দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তণারম্ভে ।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥" (শ্রীচৈঃ ভাঃ)

"অবিলম্বে" অর্থাৎ এই কলিতেই বিলম্ব না করিয়া, হে মাতঃ! তোমার কোলে আবির্ভূত হইব।—কারণ, জ্ঞানশূন্যা কেবলা ভক্তির প্রচার ভারতে বেশীদিন চলিবে না। প্রকৃত্যানুযায়ী মানবসমাজকে সুগঠিত করিতে হইবে। সর্ব্বত্র অধিকারী সুদুর্লভ। জ্ঞান কর্ম্মাদির লোপ হইলে শুদ্ধভক্তির প্রতিষ্ঠা থাকিতে পারে না। কেবলা ভক্তির অনুষ্ঠানলক্ষ্যে সাধারণ জীব অন্ধ, উদ্‌ভ্রান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল হইবে—রাগপথে বাঘ বাসা করিবে। অতএব আমি অতঃপর চারি হস্ত হইয়া আবির্ভূত হইব অর্থাৎ কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি এই চতুর্দ্দলে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করিব। এই ভাবে লোক সমাজে নবযুগ আনিয়া দিব। কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান এবং ভক্তি আমার চারিহস্তের লীলাকমল হইবে। আমার চারিহস্তে এই চারি প্রদেয় বস্তু শোভা পাইবে এবং সে সব অধিকারবিচারে বিতরণ করিব। নচেৎ এমন কাল আসিতেছে যে মানবসমাজ ধ্বংসোন্মুখ হইবে। তজ্জন্য সেই অবতারে আমার এক নাম হইবে "চারিহস্ত"।

আমার চারিহস্ত—চারি তত্ত্ব। প্রথমতত্ত্ব-কর্ম্ম, শ্রীবাস-পণ্ডিত (লক্ষ্মীর সংসার),—ইনি গার্হস্থ্য বিধিনিয়মাদির প্রতিপালক। দ্বিতীয় তত্ত্ব—যোগ, শ্রীনিত্যানন্দ। ইনি ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিয়া প্রেমযোগ দান করিবেন। তৃতীয় তত্ত্ব—জ্ঞান, শ্রীঅদ্বৈত। ইনি ওঙ্কারস্ফূর্ত্তিদানে জীবের চৈতন্য জন্মাইবেন এবং বিদ্যাদান করিবেন। চতুর্থ তত্ত্ব—ভক্তি, শ্রীগদাধর, ইনি সেবাভক্তি শিক্ষা দিবেন। আমি পঞ্চতত্ত্বের সীমা।

আমি চারিহস্ত হইব। চারিহস্তে চারি রসের প্রচার হইবে।—শ্রীবাসে দাস্য, শ্রীনিত্যানন্দে সখ্য, শ্রীঅদ্বৈতে বাৎসল্য এবং শ্রীগদাধরে সেবা পরকান্তারস প্রচারিত হইবে। এই ভবিষ্যলীলায় আমার নাম হইবে "চারিহস্ত"। পঞ্চমে স্বয়ং অবধি।

"প্রভু তুমি কৃপা ক'রে প্রতি জীবাধারে
স্থাপ পঞ্চরস ভাণ্ড।
সে রস সুধায় নিশিতে দিবায়
মত্ত রাখ এ ব্রহ্মাণ্ড॥"
(অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ—"নির্ঝরিণী")

চন্দ্রপুত্র।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মগোপাল—পরমেশ্বর। তিনি গো বা কিরণের পালক। তিনি গোলোকের কর্ত্তা। এই অদ্বয়জ্ঞান কিরণামৃত হইতে গো বা চক্ষুর উৎপত্তি। জ্ঞান হইতে চক্ষু ফোটে। গো হইতে গো এর উদ্ভব। জ্ঞানকিরণ দ্বারা চক্ষুর নির্ম্মাণ হয়। চক্ষু দিব্য বস্তু। সেই চক্ষু হইতে সূর্য্যের সৃষ্টি।

"চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যোঽজায়েত।"
(ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তম্)

সহস্র শীর্ষা পুরুষের মন হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি। এবং চক্ষু হইতে সূর্য্যদেবের উৎপত্তি হইয়াছে।—তদ্দ্বারা সূর্য্যাপেক্ষা চন্দ্রের সারবত্তা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল। "তেজসঃ সলিলম্" ইতি বেদান্তোপনিষদি শ্রুতম্। অতএব তেজের আধার সূর্য্য হইতে জলনিধি—সমুদ্রের উৎপত্তি বটে, বৃক্ষ হইতে ফল উৎপন্ন হয়, ফল বৃক্ষের সারাংশ। দুগ্ধ হইতে সর্পিঃ (ঘৃত) উৎপন্ন হয়, ঘৃত দুগ্ধের সারাংশ। তদ্রূপ জ্ঞান সারাংশ চক্ষুঃ, চক্ষুর সারাংশ সূর্য্য এবং সূর্য্যের সারাংশ সমুদ্র।

অনন্তর সমুদ্রের সারাংশ সুধা (অমৃত)। সুধা-সারাংশ সমুদ্রোত্থ সুধাকর চন্দ্র। ইন্দ্রিয়গণের সারাংশ মন এবং মনেরই সারাংশ চন্দ্রদেব। জীবের আত্মা বা সারভাগ হইতে পুত্র জন্মে। এজন্য পুত্র আত্মজ বলিয়া অভিহিত হয়। এখন ভাবিয়া দেখুন, আনন্দনিধি সুধাময় চন্দ্রের সারাংশ "চন্দ্রপুত্র"।

অতএব "চন্দ্রপুত্র" তত্ত্বতঃ কি?—তিনি উক্ত বংশানুক্রমে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব পরব্রহ্মের সারাংশ ভূত।—প্রেমবিভব-বিগ্রহ আমি শ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু। আমি চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র।

আনুষঙ্গিক সমাচার।

জগন্মাণিক সোণার চাঁদ শ্রীমন্মহাপ্রভু মানবচিত্তে চিত্তে ত্রিরসাত্মক ভক্তিভাব জাগ্রত ও উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। এই তিনই রাগময়। শ্রীভগবৎ প্রীতিকাম সখ্যভাব, পুত্রভাব এবং পতিভাব। পরমেশ্বরে সখ্যভাব এবং পুত্রভাব তেমন স্বাভাবিক নয়। কিন্তু মাতৃভাব ও পতিভাব সহজ। গৌর ভক্তগণ ব্রজানুরাগবশে প্রায় সকলেই পতিজ্ঞানে কৃষ্ণ ভজনরীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুরু পরম্পরায় ইহাই প্রশস্ত বলিয়া লক্ষিত হয়। কিন্তু কালপ্রভাবে ও বিষয়-বৈগুণ্যদোষে কৃষ্ণপ্রেম কামের ছাঁচে গঠিত হইল। গৌর-নিতাইর সুদুর্লভ কৃপা ব্যতিরেকে কৃষ্ণপতি-লাভ দুরূহ ও আশাতীত।

এই পরম কৃপার অভাবে, শিক্ষিত হিন্দুগণ উপনিষদ্ কক্ষে করিয়া ব্রাহ্মসঙ্ঘ রচনা করিলেন। উপনিষদের ব্রহ্ম হইলেন, এই নবসঙ্ঘের মস্তক এবং খৃষ্টোপাসনারীতি হইল উহার দেহ। এই পিণ্ডমুণ্ডসংগঠিত ধর্ম্মের আদর্শ হইলেন শ্রীযীশু।

"————————একদল মুণ্ড নিল কাটি
যোজিলেক অঙ্গে বিদেশীর কাটি তার শির,
করিল জীবন্ত————"
(কালীহৈয়ার "হৃদশ্রু")

ব্রাহ্মধর্ম্মের সৃষ্টি হইল। ব্রহ্মের বিগ্রহবাদ ও অবতারবাদ উঠিয়া গেল। সুতরাং ব্রজের ত্রিধা মধুররস আর স্থান পাইল না। Father পিতঃ! এবং Lord প্রভো! এই দুই হইলেন প্রণবের পর সাধারণ বাচক। শ্রীভগবানের অনাদিসিদ্ধ মূল নামত্রয় হরি-রাম-কৃষ্ণ পরাহত হইল। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্ঞান প্রগাঢ় বটে, কিন্তু প্রাণ স্নিগ্ধতাশূন্য, রুক্ষ। তৎপ্রমাণ, যথাঃ—

"পরমহংসদেবের ঈশ্বরের মাতৃভাব ব্রাহ্ম সমাজে সঞ্চারিত হয়। সরল শিশুর ন্যায় ঈশ্বরকে সুমধুর "মা" নামে সম্বোধন এবং তাঁহার নিকট শিশুর মত প্রার্থনা ও আব্দার করা, এই অবস্থাটী পরমহংস হইতে আচার্য্যদেব (শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন) বিশেষরূপে প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম শুষ্কতর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম্ম ছিল। পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সরস করিয়া ফেলে।" (নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্রসেন লিখিত পরমহংসদেবের উপদেশ ও জীবনী, ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা, ১৮০৯শক, ১লা আশ্বিন ১৯ঃ পৃষ্ঠা)

"A new dispensation has come down upon our Brahma Samaj which proclaims a new programme to India. Its chief merit is its freshness and its one watchword is—God, the mother of India."

পরমহংসদেব শ্রীভগবানের মাতৃভাব জাগ্রত করিয়া দিয়া সর্ব্বসম্প্রদায়ী হিন্দুদিগকে ভক্তির মাধুর্য্য গুণভূষণে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। সখীভাবের উচ্চতম সোপানে নির্ব্বিরোধে আরোহণ করিতে হইলে মাতৃভাবের পক্কতা চাহি, নচেৎ সাধকচিত্তে কলুষকীট প্রবেশ করে। সখ্যাদি ভাবচেয়ে মাতৃভাবের ঘনিষ্টতা ও সাহসিকতা বেশী। জন্মিয়াই আমরা মাতৃস্নেহপীযুষের আস্বাদন পাই এবং "মা" শব্দের মধুরতায় উপলব্ধি করি। সুতরাং শ্রীভগবানের মাতৃভাব অতি সহজ। ভজনপক্ষে মাতৃভাবের দীক্ষাটি অতি সফলা।

অতঃপর আবির্ভূত হইয়া শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু দেখাইলেন—মাতৃভাব সত্য, সুমধুর ও জাগ্রত হইলেও তদুত্তর আরও লব্ধব্য থাকিয়া যায়। মাতৃভাব সসীম। উহা—ভক্তি, কিন্তু উহা ভাবভক্তির চরম মহাপ্রেমের সীমায় গড়ায় না। পরমহংসদেব মহাভাবে ডুবিয়া তাহা বুঝিয়াছেন। তাই আমাদের মহোদ্ধারণ প্রভু ব্রজের ভজনরীতি-পদ্ধতিশিক্ষার পুনঃ প্রচার দ্বারা দাস্যাদি রস চতুষ্টয়ের প্রবাহ বহাইলেন, গৌরনিতাইর প্রেমমাধুর্য্য সুধাসমুদ্র মহানামের তুফান তুলিয়া উথলাইয়া দিলেন, মাতৃভাবের গণ্ডীতে কাহাকেও থাকিতে দিলেন না। প্রেমই ভক্তির পরিণাম ও পরিপাক। "কন্যারূপেতে বাঁধছেন আসি ঘরের বেড়া" এস্থলে রামপ্রসাদের মাতৃভাব বাৎসল্যে পরিণত হইল। অতএব বাৎসল্যাদি রস মাতৃভাবের উপরে। হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু দাস্যকে ভিত্তিরূপে পুনঃ প্রতিষ্টিত করিয়া গাওয়াইলেন—"প্রভু প্রভু প্রভুহে, অনন্তানন্তময়।" কিন্তু ইহা স্বীকার্য্য যে মাতৃভাব চেয়ে

প্রভুভাবে ঐশ্বর্য্য বেশী। উভয়ই ঐশ্বর্য্যময়। সখ্যে না পৌঁছা পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্যই খেলে। তবে ইহাও মানিতে হইবে যে পুত্রের চেয়ে দাসদাসীর সেবা পারিপাট্য ভাল। সেবা মাত্রই দাস্যমূলক। দাস্য বিলুপ্ত হইলে ভক্তির বিলোপ ঘটে। দাস্য প্রেমভক্তির মেরুদণ্ড। প্রেমের অবধি গোপীভাবে ও দাস্য তাহার চমৎকারিত্ব ফলায়।

শ্রীশ্রীনিতাইচাঁদের সখ্য প্রেমমাধুর্য্যও দাস্যসংযোগে সুফলিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঅদ্বৈতচাঁদের বাৎসল্যও দাস্যের রঙে উজ্জ্বল হইয়াছে। দাস্যে রাগের উৎপত্তি। মাতৃভাবে রাগ সঙ্কীর্ণ। এজন্য উহা ব্রজের রস মধ্যে ধৃত নয়। শ্রীশ্রীমহোদ্ধারণ প্রভু দাস্য-ফুল ফুটাইয়া প্রেম-মধু-দানে শ্রীশ্রীনদীয়ানাগরের প্রচারিত রাগমার্গের সম্প্রসারণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধর্ম্মের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ একমাত্র তাঁহারই হস্তে। এজন্য তিনি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের ঘরে বীরচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হইলেন এবারও তিনি সেই গৌরেন্দু অভিন্ন শচীমাতা শ্রীবামাদেবীর বাৎসল্যসিন্ধুতে সমুদিত হইয়া উজ্জ্বল প্রেমকিরণে বঙ্গ প্রোদ্ভাসিত করিলেন।

ব্রজানুচরিত ধর্ম্ম বিশিষ্ট ধর্ম্মন্যাস। সর্ব্বধর্ম্মই সলিল-সরোবর—ব্রজের ভাব তদানুগত কমল ইহা মানিতে হইবে। গৌরত্যাগী হইলে কলির জীবের গতি নাই, ইহা পরম সিদ্ধান্ত। শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু গৌরচন্দ্রের উদ্বেলিত প্রেমবন্যার অবসাদ দর্শনে প্রসাদদানে আবার শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন। বৈষ্ণবসমাজের জাতিভেদ দানব অতি প্রকাণ্ড বপুঃ। কেশবের "Kill the monster" বস্তুতঃ প্রভু জগদ্বন্ধুর গণে বিশেষরূপ কার্য্যে পরিণত দৃষ্ট হয়।

শ্রীকালীহরদাস বসু ভক্তিসাগর
হাঁসাড়া, ঢাকা।

কীর্ত্তনের অপূর্ব্ব শক্তি।

"গ্যাস জড় পদার্থ নয়—আত্মার সমষ্টি"

মানিকগঞ্জের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যখন ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন, সেই সময় একবার শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর পরম ভক্ত রমেশচন্দ্রের একটী ভাড়াটীয়া বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করিতেছিলেন; শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্কটাপন্ন অসুখের সংবাদ লইয়া নবদ্বীপ দাস মহাশয় ঢাকায় গমন করিলেন, এ সময়ে যাহাতে শ্রীচরণ দর্শন দেন এজন্য প্রভুকে বিশেষ অনুরোধ করণার্থ নবদ্বীপ দাস মহাশয়কে বলিয়া দেওয়া ছিল। দাস মহাশয়ও সুরেশ বাবুর অসুখের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া যাহাতে প্রভু আসেন সে জন্য খুব কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঢাকার ভক্তেরা তাহাদের প্রাণারাম প্রভুকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন না; ভক্তবর পূর্ণ বাবু বলিলেন, "আমাকে না জানাইয়া যেন প্রভুকে যাইতে দেওয়া না হয়"। পূর্ণ বাবু তৎকালে মেসে (Mess) এ অবস্থান করিতেন। রমেশ বাবু প্রভৃতি ভক্তগণ উক্ত ভাড়াটীয়া বাড়ীর এক অংশে অবস্থান করিতেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে প্রভু রমেশ বাবু প্রমুখ সকলকে বুঝাইলেন যে সুরেশ তো তাহাদেরই একজন সঙ্গী ও বন্ধু; সুতরাং এ সময় তাঁহাকে দর্শন দিবার জন্য তাঁহার ফরিদপুর যাওয়াই সঙ্গত। তখন কেহই প্রভুর এ কথা অন্যথা করিতে পারিলেন না, ফরিদ-পুরস্থ ভাইটীর প্রতি সকলেরই স্নেহের সঞ্চার হইল এবং প্রভুর যাওয়া বিষয়ে একমত হইয়া ভোর ট্রেনে উঠাইয়া দিতে যাইবেন স্থির হইল।

যেই প্রভু বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলেন, অমনি গাড়ীর চাকা মাটিতে দাবিয়া গেল। একা রমেশ বাবুর পক্ষে অত বড় একটা বড় গাড়ী উঠাইয়া দেওয়ার মত সামর্থ ছিল না।

কিন্তু কি করেন? অন্য সাহায্যকারী কোথায় পাবেন এবং কাহাকেই বা ডাকিবেন, এইরূপ ইতস্ততঃ করিয়া নিজেই একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে অগ্রসর হইলেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, গাড়ী ধরা মাত্র বিনা কষ্টেই গাড়ী-খানা উঠাইতে সক্ষমহইলেন। তখন প্রভুর অলৌকিক

শক্তির কথা মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন।

তারপর তাঁহার মনে বড়ই উদ্বেগ হইতে লাগিল; কারণ পূর্ণ বাবুকে সংবাদ দেওয়া গেল না। প্রভু ট্রেনে ফাষ্ট ক্লাশ (1st class) গাড়ীতে উঠিলেন, রমেশবাবু ও নবদ্বীপদাস প্রভৃতি থার্ড ক্লাশে (3rd class) উঠিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া নবদ্বীপদাস মহাশয় করতাল সহ প্রভাতিকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তুমুল ভাবে কীর্ত্তন চলিতে থাকিল, গাড়ী কিয়দ্দুর গিয়া থামিয়া পড়িল। ড্রাইভার খুব চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু এঞ্জিন আর অগ্রসর হয় না, শেষে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল—দেখা গেল Boiler (বয়লার) ফাটে নাই, কলকব্জা খারাপ হয় নাই, কেহ শিকল টানে নাই। ইঞ্জিনিয়ার আসিল, সমস্ত পরীক্ষা করিয়া আশ্চর্য্য হইল। গাড়ী বন্ধ হইবার কোন কারণ খুজিয়া পাইল না। এদিকে রমেশবাবু আসিয়া প্রভুকে খবর দিলেন "গাড়ী বন্ধ হইয়া গিয়াছে আর চলিতেছে না।"

প্রভু বলিলেন—"নবদ্বীপের কীর্ত্তন বন্ধকর।"

"গ্যাস জড় পদার্থ নয়, গ্যাসের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আত্মা আছে, তুমুল কীর্ত্তনে আত্মাগুলি উদ্ধার হইয়া যাইতেছে, কাজেই গ্যাসে কোন শক্তি প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। তুমি সত্বর যাও নবদ্বীপকে কীর্ত্তন বন্ধ করিতে বল। গ্যাস জড় পদার্থ নহে, আত্মার সমষ্টি।"

রমেশবাবু যাইয়া নবদ্বীপদাসের করতাল ধরিলেন, কীর্ত্তনে বাধা দেওয়ায় নবদ্বীপদাস মহাশয় প্রথমে একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে যখন শুনিলেন প্রভু স্বয়ং নিষেধ করিয়াছেন, তখন আর কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করিলেন না। কীর্ত্তন বন্ধ হওয়া মাত্র ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিল। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া রমেশবাবু ও ভক্তগণ স্তম্ভিত হইলেন এবং প্রভু বন্ধুর শ্রীমুখে এমন গভীর বিজ্ঞান সম্মত অচিন্ত্যপূর্ব্ব নব তথ্য শ্রবণে প্রাণে প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অতঃপর রমেশবাবু প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত যাইয়া প্রভুকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিয়া ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে পূর্ণবাবু রাত্রের ঘটনা কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিলেন, প্রভু তো নিশ্চয়ই ফরিদপুরে যান নাই; সুতরাং নিত্য যে প্রকার বিকাল বেলা ছুটীর পর প্রভুর সহিত দেখা করিতে আসিতেন, আজও সেই প্রকার আসিলেন। আসার সময় প্রভুর জন্য কিছু খাবার নিয়া আসিয়া রমেশবাবুর হস্তে প্রদান করিলেন। হঠাৎ প্রভুর গমন সংবাদ দিলে পূর্ণবাবু মহা অসন্তুষ্ট হইবেন মনে করিয়া রমেশ বাবু ভয়ে ভয়ে সেবার দ্রব্য গুলি প্রভু যে কোঠায় ছিলেন, সেই কোঠায় নিয়া ভোগ দিলেন।

পূর্ণবাবু কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে রমেশবাবু ধীরে ধীরে প্রভুর ফরিদপুর যাওয়ার জন্য ভক্তবৃন্দের নিকট অনুমতি গ্রহণ, ঘোড়ার গাড়ী উত্তোলনও ট্রেণবন্ধের কথা সবিস্তার বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া পূর্ণবাবু আনন্দে ও বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন।

তারপর রমেশবাবু প্রভুর কক্ষে যাইয়া যাহা দর্শন করিলেন, তাহাতে একেবারে অবাক হইয়া গেলেন এবং পূর্ণ বাবুকে হাত দ্বারা আহ্বান করিলেন।

পূর্ণ বাবু যাইয়া দেখেন তাহার প্রদত্ত ভোগের দ্রব্যাদি সমস্তই প্রভু গ্রহণ করিয়াছেন, সে ঘরে কিছুই নাই অথচ ঘরে অপূর্ব্ব পদ্মগন্ধ পাওয়া যাইতেছে; মনে হইল আধ মিনিট পূর্ব্বেও প্রভু যেন এ ঘরে বিরাজমান ছিলেন।

ধন্য শ্রীপূর্ণচন্দ্র! ধন্য শ্রীসুরেশচন্দ্র! ধন্য বন্ধুভক্তের বন্ধু প্রীতি। আজ কীর্ত্তনানন্দরূপী কীর্ত্তনের অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশ করতঃ ঢাকা হইতে ফরিদপুর চলিয়াছেন, ভক্তের প্রাণের আবেগ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য। শ্রীশ্রীহরিনামে **"চতুর্দ্দশ ভুবনের মহামাঙ্গল্য বিধান"** কেবল জানাইয়াই নিরস্ত হয়েন নাই আজ প্রত্যক্ষ দেখাইয়া বিশ্বজগৎকে বিস্মিত করিলেন। জয় জগদ্বন্ধু! জয় হরিনাম!! জয় শ্রীহরি সংকীর্ত্তন!!!

অংহঃ সংহর দখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল লোকস্য।
তরণিরিব তিমির জলধেং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্ণাম॥

শ্রীবন্ধু গৌরবানন্দ ব্রহ্মচারী।
(ডাক্তার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ণিত)

তত্ত্বানুশীলন।

পূর্ণচৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বর হইতে বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সর্ব্বতঃ বিপ্রসৃত চেতনাত্মক জীবনিবহ দেহেন্দ্রিয়াদির সংযোগে বিবিধরূপে বিষয়ভোগ করিয়া জাগতিক ব্যবহারের পরিপালন করিতেছে। জীব-চৈতন্য দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সহিত মিলিত হইয়া আমি ইত্যাকার শব্দ ও তজ্জনিত প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞানের আলম্বন-রূপে প্রতীত হয়। জীব যে দেহাদি হইতে পৃথক্, তাহা 'আমার দেহ' 'আমার ইন্দ্রিয়' 'আমার মন' ইত্যাদিশব্দ দ্বারা নিঃসন্দেহ ব্যক্ত হয়। জীবের শরীর তিন প্রকার—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। এই অন্নময় দেহ-ই 'স্থূল-শরীর' পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি—এই সপ্তদশটি লইয়া 'সূক্ষ্ম-শরীর'। আর এই দেহদ্বয়ের উৎপত্তির কারণীভূত যে অজ্ঞান—যাহা মায়া, অবিদ্যা, প্রধান, প্রকৃতি, অব্যক্ত প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হয়,—যে অজ্ঞানের অনুভব সুষুপ্তিতে হয়,—তাহা-ই 'কারণ শরীর'। এই ত্রিবিধ শরীর-ই আবার 'পঞ্চ কোশ' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। পিতৃভুক্ত অন্নের পরিণাম-স্বরূপ যে শুক্র তাহা হইতে উৎপন্ন ও অন্নদ্বারা-ই বর্দ্ধিত এই দৃশ্যমান স্থূল-দেহ 'অন্নময় কোশ' ১। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান—এই পঞ্চ প্রাণ, ও বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু (অপান-দ্বার), উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় 'প্রাণময় কোশ' ২। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্, জিহ্বা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মন 'মনোময় কোশ' ৩। উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি 'বিজ্ঞানময় কোশ' ৪। কারণশরীর অবিদ্যায় যে মলিন-সত্ত্ব অর্থাৎ রজস্তমোমিশ্রিত সত্ত্বগুণ আছে, তাহা-ই প্রিয়, মোদ, প্রমোদ—নাম্নী আনন্দ বৃত্তির সহিত 'আনন্দময় কোশ' ৫। ইষ্ট বস্তুর দর্শনে 'প্রিয়'-সংজ্ঞিকা আনন্দবৃত্তি উৎপন্ন হয়; ইষ্ট বস্তুর লাভে 'মোদ,' এবং ইষ্ট বস্তুর ভোগে 'প্রমোদ' হয়। অজ্ঞানাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি (বাহ্য বিষয় পরিহার করিয়া) অন্তর্মুখী হইলে তাহাতে আত্মানন্দ প্রতিফলিত হয়; ইহাকে-ই 'আনন্দ' কহে। সাত্ত্বিক-বৃত্তি নির্ম্মল বলিয়া তাহাতে-ই আনন্দ স্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব পতিত হয়। এই আনন্দ বস্তুবিশেষের সংযোগে প্রিয়, মোদ, প্রমোদ এই ত্রিবিধ আখ্যা ধারণ করে। আত্মানন্দ প্রতিবিম্ব সংযুক্ত অন্তঃকরণ সুষুপ্তিতে অজ্ঞানে লীন হয়, তখন সুখ ও অজ্ঞান এই দুইয়ের অনুভূতি হয়। অন্নময়াদি পাঁচটি আত্মার স্বরূপ আবৃত করে বলিয়া 'কোশ' শব্দে উক্ত হয়। ত্রিবিধ শরীর বা পঞ্চকোশের সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ একীভাব প্রাপ্ত হইয়া আত্মা 'জীব' বা 'প্রাণধারক'-রূপে ভোগ করিয়া থাকে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি জীবের ভোগস্থান। জীব জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয় গোচর বিবিধ বাহ্য পদার্থের অনুভব করিয়া (বিশ্ব শরীর-বর্ত্তী বলিয়া) 'বিশ্ব'; স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎ কাল সঞ্চিত মনোবাসনা দ্বারা উপস্থাপিত অলীক বিষয়ের অনুভব করিয়া (তেজোময় অর্থাৎ বাসনাময় অন্তঃকরণ উপহিত বলিয়া) 'তৈজস'; এবং সুষুপ্ত্যবস্থায় চৈতন্য প্রকাশিত অতিসূক্ষ্ম অজ্ঞান বৃত্তি-দ্বারা আনন্দের অনুভব করিয়া (রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা অভিভূত-সত্ত্ব-প্রধান অজ্ঞানরূপ উপাধিযুক্ত বলিয়া 'প্রায়েন অজ্ঞঃ' এই ব্যুৎপত্ত্যনুসারে) 'প্রাজ্ঞ' এই সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। এইরূপে উক্ত শরীরত্রয় বা পঞ্চকোশ-ই জীবের সংসার গতির একমাত্র কারণ। দেহেন্দ্রিয়াদি-দ্বারা যে শুভ বা অশুভ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, চৈতন্যমাত্র জীব অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে সে সকলের কর্ত্তা ও তৎফল ভোক্তা কল্পনা করিয়া থাকে। তজ্জন্য তত্তৎকর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত তাহাকে উচ্চাবচ দেহ ধারণ করিতে হয়। ধর্ম্মাধর্ম্মের বাসনা মনে সঞ্চিত থাকে। সেই অনন্তজন্মোপচিত মানসিক-বাসনানুসারে কর্ত্তৃত্বাভিমানী জীব চতুরশীতিলক্ষ-যোনিতে পরিভ্রান্ত হয়। এবং বিধ বিবিধ দেহপ্রাপ্তি-ই জীবের 'সংসার' বা 'বন্ধ'।

কর্ম্মের প্রতি মন-ই মুখ্য প্রযোজক। কেন না দেহ ও ইন্দ্রিয়-দ্বারা কর্ম্ম হইলে-ও মন তাহাতে সংযুক্ত না হইলে যথার্থরূপে কর্ম্ম হয় না। ইহা—"অন্যত্রমনা অভূবম্, নাদর্শম্; অন্যত্রমনা

অভূবম্, নাশ্রৌষম্ ইতি মনসাহ্যেব পশ্যতি, মনসা শৃণোতি" (বৃহদারণ্যক ১।৫।৩) অর্থাৎ 'আমার মন অন্যত্র ছিল', আমি দেখি নাই; আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি শুনি নাই' ইত্যাকার-প্রতীতি-নিবন্ধন মন-দ্বারা-ই দর্শন করে, মন-দ্বারা-ই শ্রবণ করে—এই শ্রুতি বাক্যে স্পষ্ট হয়। অতএব যাহার অবধান (কোন বিষয়ে বিশিষ্টরূপে সংযোগ) বা অনবধানে (অসংযোগে) ইন্দ্রিয়-দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি বা অনুপলব্ধি হয়, তাহা-ই মন';—ইহা-ই মনের পৃথক্ অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রমাণ। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ-প্রভৃতি মনের ধর্ম্ম। তথা চ শ্রুতি—"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতির ধৃতি র্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেত সর্ব্বং মন এব" (বৃহদারণ্যক ১।৫।৩) অর্থাৎ কাম (স্ত্র্যাদিবিষয়সম্বন্ধাভিলাষ) সঙ্কল্প ('ইহা নীল' 'ইহা শুক্ল' এই প্রকার বিষয় বিশেষের অবধারণ), বিচিকিৎসা (সংশয়জ্ঞান), শ্রদ্ধা (শাস্ত্রীয় অদৃষ্ট বিষয়ে আস্তিক্যবুদ্ধি), অশ্রদ্ধা (তাহার বিপরীত), ধৃতি (দেহাদির অবসাদে তাহার বিধারণ), অধৃতি (তদ্-বিপরীত), হ্রী (লজ্জা), ধী (প্রজ্ঞা), ভী (ভয়)—এ সমস্ত-ই 'মন' (অর্থাৎ বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদ-নিবন্ধন মনের বৃত্তি বলিয়া মন হইতে অভিন্ন)। মন ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া বাহ্যবিষয়দেশে গমন করতঃ বিষয়ের আকার ধারণ করে; যেরূপ কুল্যার জল প্রণালী-দ্বারা প্রবেশ করতঃ ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হইয়া তদাকার ধারণ করে;—ইহাকে-ই মনের 'বৃত্তি' বা বিষয়াকারে পরিণাম কহে। মন যখন এইরূপে বাহ্যবিষয়াকারে পরিণত হয়, তখন তাহার সহিত আত্মচৈতন্য-ও যেন তৎসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মন কোন বিষয়ে আসক্ত হইলে তাহার সহিত আত্মা-ও আসক্ত-বৎ প্রতীত হয়। সুতরাং মনের বিষয়াসক্তি-ই জীবের 'বন্ধ'; আর বিষয়াসক্তি-ত্যাগ-ই 'মুক্তি'।

"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং, মুক্ত্যৈ নির্ব্বিষং স্মৃতম্॥
শাট্যায়নীয়োপনিষৎ ১।

অর্থাৎ মন-ই মনুষ্যের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ। বিষয়ে অনুরক্ত মন বন্ধ, এবং বিষয়ানুরাগবিহীন মন মুক্তির প্রযোজক বলিয়া কথিত হয়।

"চিত্তমেব হি সংসারস্তৎ প্রযত্নেন শোধয়েৎ।
যচ্চিত্তস্তন্ময়ো মর্ত্ত্যো, গুহ্যমেতৎ সনাতনম্॥"
শাট্যায়নীয়োপনিষৎ ২।

অর্থাৎ অন্তঃকরণ-ই সংসার; অতএব তাহাকে প্রযত্ন সহকারে বিশোধিত (বাসনামলরহিত) করা কর্ত্তব্য। যেহেতু অন্তঃকরণ যে পুত্রদারাদিবিষয়ে আসক্ত হয়, জীব-ও তৎস্বরূপ-ই হইয়া থাকে—ইহা অনাদিসিদ্ধ রহস্য।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া চিত্ত-ও ত্রিগুণাত্মক। যখন চিত্তে সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হয়, তখন জ্ঞান, বৈরাগ্য, ক্ষমা, উদারতা-প্রভৃতি গুণ আবির্ভূত হয়; রজোগুণের প্রাবল্য হইলে, কাম, ক্রোধ, লোভ, যত্ন প্রভৃতি প্রকটিত হয়; এবং তমোগুণের প্রাবল্যে আলস্য, ভ্রান্তি, তন্দ্রা (ঈষন্নিদ্রা), ভয়-প্রভৃতি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ স্থির ও প্রকাশক; রজোগুণ চঞ্চল ও প্রবৃত্তিজনক; এবং তমোগুণ আবরণাত্মক ও মোহকারক। চিত্তের রজস্তমোভাব অপনীত হইয়া সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হইলে চিত্ত 'শুদ্ধ' হয়। তখন চিত্ত চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া স্থির ও শান্ত হয়। তাদৃশ চিত্তে আত্মার আনন্দ-স্বরূপ নির্বিঘ্নরূপে প্রতিফলিত হয়। বিবিধ দৃশ্যাকারে পরিণতি ত্যাগ করিয়া যখন চিত্ত অন্তর্মুখ, সুতরাং আত্মাকারাকারিত হয়, তখন চিত্তের বাহ্য বিকল্প নিবৃত্ত হওয়ায় তজ্জনিত জীবের কল্পিত সংসার-ও অপগত হয়। ইহা-ই 'মুক্তি'। চিত্তের আত্মাকারা বৃত্তি উৎপন্ন হইলে, তদ্-দ্বারা আত্মস্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান বিদুরিত হয়; তখন স্বপ্রকাশ আত্মা স্বতঃ-ই স্ফুরিত হয়। ঘটাকারা বৃত্তি-দ্বারা ঘটগত অজ্ঞান নষ্ট হইলে, পশ্চাৎ সেই বৃত্তিতে অবচ্ছিন্নচৈতন্য-দ্বারা ঘট উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু আত্মবিষয়ে অজ্ঞান বিনাশার্থ আত্মাকার-বৃত্তি মাত্র অপেক্ষিত (ইহাকে 'বৃত্তিব্যাপ্তি' কহে; অর্থাৎ আত্মা এতদ্‌বৃত্তির বিষয় হয় বলিয়া 'বৃত্তি ব্যাপ্য'); আত্মা স্বয়ং প্রকাশ-স্বরূপ বলিয়া তাহাতে বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যের কোন-ই উপযোগ নাই (সুতরাং আত্মাতে 'ফলব্যাপ্যত্ব' নাই; 'ফল' -শব্দের অর্থ 'চিদাভাস'; আত্মা চিদাভাসের প্রকাশ্য হয় না বলিয়া 'ফলব্যাপ্য' নহে); প্রত্যুত সূর্য্যপ্রকাশে দীপালোকের ন্যায় তখন চিদাভাস (বৃত্তিতে প্রতিফলিত

চৈতন্য) আত্মস্বরূপে-ই লীন হয় সুতরাং তদবস্থায় আত্ম-চৈতন্য স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইয়া কৈবল্যপদভাক্ হয়। এইরূপে জীব যখন নিজের অসঙ্গ স্বরূপ জানিতে পারে, তখন আর অনাত্মধর্ম্ম আপনাতে আরোপিত করিয়া সুখদুঃখাদির অভিমানে বিমুগ্ধ হয় না। তখন সে দেহেন্দ্রিয়াদির সাক্ষিরূপে নিরবচ্ছিন্ন স্বাত্মানন্দ অনুভব করিতে থাকে। ইহা-ই 'পরম-পুরুষার্থ'। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাম স্বামী।

হিন্দোলন লীলা।

শ্রীশ্রীভগবানের জন্ম কর্ম্মের নাম লীলা। মানুষ এই ত্রিগুণের দেশে বাস করে, তাই কর্ম্ম করা মানুষের স্বভাব, মানুষের এই কাজকর্ম্মের নাম ঘটনা, শ্রীভগবান ত্রিগুণাতীত তাঁহার কোন কর্ম্ম নাই, তবু কি জানি কোন্ এক অজানা-কারণে তিনি সতত কর্ম্ম-পরায়ণ, তাই তার এই জন্ম কর্ম্মের নাম লীলা। এই লীলা ও ঘটনাতে কিছু প্রভেদ আছে, একটি ঘটনা জানিলেই জানা হয়। অমুক সনে শিবাজী মারাঠা রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এইটি ঐতিহাসিক ঘটনা, ইতিহাস জানিলেই জানা হয়। আর অমুক সময় শ্রীশ্রীগৌর নিতাই নদীয়ায় প্রেমরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, জানিলেই জানা হইল না। শ্রীমুখে তাই অর্জ্জুনকে কহিয়া-ছেন,"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ"। শ্রীহরির জন্মকর্ম্ম দিব্য, তাহা তত্ত্বতঃ জানিতে হইবে। ঘটনা অনিত্য, গত হইয়া গেলে কেবল স্মৃতি থাকে, লীলা তত্ত্বতঃ নিত্য, (eternal as principles) হইয়া গেলেও হইয়া যায় না, সরস হৃদয় প্রত্যহ তাহার আস্বাদন ঘটে। ঘটনা দিনের পর দিন বিস্মৃতির তলে ডুবিয়া যায়, লীলা প্রতি-পদে পদে উজ্জ্বলতর ও মধুরতর হইয়া উঠে। ঘটনা জৈব-কর্ম্ম, তাহার ফল বন্ধন ; লীলা শ্রীভগবদ্বিলাস. তাহার ফল উদ্ধারণ—জীবের অনাদি কর্ম্মবন্ধ-বিমোচন। এই লীলা কিন্তু অন্তর্মুখী হইয়া আস্বাদন করিতে হয়। জীব বহিরিন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ব, তাই লীলা আস্বাদন তাদের পক্ষে বড়ই দুরূহ ব্যাপার।

আজ শ্রাবণী পূর্ণিমা। আজ জোৎস্নাস্নাত গভীর নিশি যোগে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র রসময়ী বিনোদিনীকে লইয়া বৃন্দাবন-বিপিনে হিন্দোলনে ঝুলন খেলা খেলিয়াছিলেন। এই লীলা তত্ত্বতঃ আস্বাদন করিতে হইবে। ঐ যে ভক্ত রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছেন ;—

"হেলন দোলন প্রেম খেলন
কীর্ত্তন কোঁদল মাধুর্য্য গুপ্তি।"

এই মাধুর্য্যগুপ্তিই লীলা-তোরণের অর্গল। ভাঙ্গিয়া গেলেই অনন্ত তত্ত্বরহস্য খুলিয়া যায়। একটি আম্রের বীজ তোমার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলাম, এটি অমৃতের বীজ, তুমি অমনি মুখে পুরিয়া দিয়া কোন রস না পাইয়া ছুড়িয়া ফেলিলে, বীজ বাগানের কোণে পড়িয়া রহিল। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটিয়া গেল, একদিন দৈবাৎ বাগানের দিকে গিয়া দেখিতে পাইলে. কচি কচি পল্লবে সুশোভিত একটি বৃক্ষ তোমার বাগানখানাকে অপূর্ব্ব শোভায় সাজাইয়া দিয়াছে। এই নয়ন তৃপ্তিকর পল্লবের সৌন্দর্য্য কোথায় ছিল? তারপর আরও দিন কতক চলিয়া গেল, আর একদিন বাগানে গিয়া কি দেখিতে পাইলে? অসংখ্য মঞ্জরী গন্ধে বাগান আমোদিত হইয়াছে, কত ভ্রমর গাইতেছে, পাতার আড়ালে কত কোকিল কুহুরবে রাগিনী তুলিয়াছে। সেদিন পাতার শোভায় চোখ্ জুড়াইয়াছিল, আজ গানে ও ঘ্রাণে কর্ণযুগ ও নাসারন্ধ্র পরিতৃপ্ত হইল। এই সুষমা রাশি কোথায় ছিল? তারপর আরও দিন কতক পরে গিয়া কি দেখিলে? ফলভারাবনত একটি অমৃত বৃক্ষ, আজ একেবারে রসনা তৃপ্তি, উদরপূর্ত্তি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া লইলে। এত মধুরিমা কোথায় ছিল? সৎকার্য্যবাদী দার্শনিককে

জিজ্ঞাসা কর, সে তোমাকে বলিয়া দিবে, এই সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সব ঐ বীজেতেই অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থায় বিদ্যমান ছিল—ইহাকেই বলে মাধুর্য্য-গুপ্তি।

অনন্ত মাধুর্য্য সিন্ধুস্বরূপ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র, ঐ গুপ্তি আর স্ফূর্ত্তিই তাঁর লীলা। যখন স্ফূর্ত্ত (manifest) তখনই প্রপঞ্চধামে প্রকটন, যখন গুপ্ত (unmanifest) তখনই নিত্য ধামে আস্বাদন। এমন কেন হয়? রসিক যারা তারা বলেন এই তার সাধের ব্যবসায়। যখন যেমন উদ্দীপন, তখন তেমন প্রকটন। বিশাল বারিধি বক্ষ আজ প্রশান্ত। আকাশের তারা গুলি তাহাতে ঐ মালার মত শোভিতেছে। ক্রমে ঋতু ফিরিয়া আসিল, গগনে জলদ জাগিল, পবন বহিল, সাগর নাচিয়া উঠিল, হেলিয়া দুলিয়া বেলা ভূমিকে চুম্বন করিয়া সোহাগে গলিয়া পড়িল।

একে তো শ্রীবৃন্দাবন ধাম, তাহাতে বর্ষাকাল। সৌন্দর্য্য-রাণী যেন আপনাকে খুলিয়া মেলিয়া ঢলিয়া পড়িয়াছেন।

নব ঘন কানন শোভন কুঞ্জ।
বিকশিত কুসুম মধুকর গুঞ্জ॥
নবনব পল্লবে শোভিত ডাল।
শারী শুকপিক গাওয়ে রসাল॥

শ্রীবৃন্দাবনের বর্ষার শোভা অপূর্ব্ব। শ্রীল শুকদেব স্ফুটনোন্মুখ গুপ্ত মাধুরী কর্ণিকার ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত করতঃ অতি চমৎকার ভাবে এই বর্ষার বর্ণনা করিয়াছেন। যথা শ্রীদশমে—

অষ্টৌ মাসান্নিপীতং যদ্ভূম্যা উদময়ং বসু।
স্বগোভি র্মোক্তু মারেভে পর্জ্জন্যঃ কাল আগতে॥
১০।২০।৪

আট মাস ধরিয়া সূর্য্যদেব অবনীর জলময় ধন আকর্ষণ করিয়াছেন। আজ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া সেই রস মোচন করিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের কৃষ্ণচন্দ্রও স্বীয় অনন্ত রস মাধুর্য্য আকর্ষণ করতঃ আপনাতে আপনি আবৃত রাখিয়াছিলেন, আজ সময় বুঝিয়া বিকর্ষণ-লীলা আরম্ভ করিলেন। তত্রৈব—

ধনুর্ব্বিয়তি মাহেন্দ্রং নির্গুণঞ্চ গুণিন্যভাৎ।
ব্যক্তে গুণব্যতিকরেঽগুণবান্ পুরুষোযথা॥

গগনের গায়ে সাতরঙের রামধনু উঠিল। রামধনুর কোন গুণ* নাই, অথচ সে উদয় হয় আকাশের উপরে। আকাশের কিন্তু শব্দ-গুণ আছে, বিশেষতঃ বর্ষাকালে গর্জ্জিত শব্দ-গুণ তো আছেই। তদ্রূপ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ মায়া-গুণাতীত, অথচ সত্ত্বাদি গুণযুক্ত এই ব্যক্ত প্রপঞ্চে প্রকট হইয়া তিনি অতি উপাদেয় লীলাভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ চতুর্দ্দিকে শোভারাশি দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীগোস্বামিগণ কহিলেন এই শোভা তাঁহারই হ্লাদিনী-শক্তির বিকাশ ("স্বলীলাযোগ্যাযোগ্যতাপাদনার্থমাত্মশক্ত্যা হ্লাদিনী নাম্ন্যা উপবৃংহিতম্"—শ্রীজীব)। তখন শ্রীভগবান ঐ শোভাকে পূজা করিলেন (ভগবান্ পূজয়াঞ্চক্রে) অর্থাৎ সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের খনি তিনি, আপনারই ঐ সৌন্দর্য্য আপনি সমাদর করিয়া আপনাকেই তাহাতে হারাইয়া ফেলিলেন। বনবিহারী বনমালী অমনি অধরে মুরলী ধরিলেন। গুপ্ত-মাধুর্য্যের দ্বার খুলিয়া গেল। তোরণে দাড়াইয়া পদকর্ত্তা গান ধরিল,—

"আষাঢ় গত পুন, মাস শাওণি,
সুখোদয় যমুনা তীর।
চাঁদনি রজনী, সুখময় সুখোদয়,
মন্দ মন্দ মলয় সমীর॥"

আমরা জানি যার অনুদয় ছিল, তারই উদয় হয়, আজ কিন্তু বড় রহস্য হইল। সুখময়ের সুখোদয় হইল। ইহাই তত্ত্বজ্ঞ রসিক ভক্তের আস্বাদন। নিত্য সুখের আকর তিনি, আজ তার দশদিকে উদ্দীপনবিভাব। কলনাদিনী কালিন্দীতটে বংশীবট মূলে ত্রিভঙ্গিমঠামে দাঁড়াইয়া শ্যামসখা বাঁশের বাঁশরী বাজাইয়া দিলেন। অমনি

"উথলহ কালিন্দীতীর"

সখ্যমনা যমুনার শ্যামলিম জলরাশি ফুলিয়া উঠিল। ধবলিম বীচিমালা আরক্তিম চরণ চুম্বন করিয়া নাচিতে

* গুণ—ধনুকের ছিলা।

লাগিল। বিহ্বল গোপবালা যূথে যূথে ছুটিয়া আসিল। কালিয়া বধুর রূপের ঝলকে তাঁহাদের হৃদয় দোলা দুলিতে লাগিল। কত রাশি রাশি লতাপাতা তুলিয়া, বিবিধ কুসুম চয়ন করিয়া তারা পদ্মাকারে এক অভিনব হিন্দোলা রচনা করিলেন। তদুপরি রাধামাধব অধিরোহন করিলেন।

বিবিধ কুসুমে সবে রচিয়া হিন্দোলা।
দোলায় যুগল সখি আনন্দে বিহ্বলা॥

তখন বনদেবীও প্রেমানন্দে জয় জয় রোল তুলিয়াদিলেন।

'হংস সারস সুরস শবদিত,'
'দাদুরী ঘন ঘন রোল।'

আবার,—

"হরিগুণ গায়ত চৌদিশে।
শুকপিককুল হিয়া অধিক উল্লাসে॥"

তখন শ্রীরাধামাধব হিন্দোলনে দুলিতে লাগিলেন।

হিন্দোলনে মিলন রাধামাধব।
বেষ্টন নর্ত্তন সখাগণ সব॥ (হরিকথা)

লীলারঙ্গ দেখিয়া—ভক্তগণের বিস্ময়ের পর বিস্ময় হইতে লাগিল, কৃষ্ণদাস কহিলেন,—'প্রথমতঃ কালিন্দীকূলে কাল মেঘের উদয়, ইহাই চমৎকার, তাহাতে সেই মেঘ আবার নরশরীরধারী, ইহা আরও চমৎকার, বিদ্যুৎ সকল সেই মেঘকে দোলাইতেছে, ইহা পূর্ব্বাপেক্ষাও চমৎকার, তারপর ঐ সৌদামিনী সেই মেঘ হইতে পৃথক হইয়া সবিলাসাঙ্গে শোভা পাইতেছে, আর সুগন্ধ জলধারা ঢালিয়া মেঘকে সিঞ্চন করিতেছে, ইহা তদপেক্ষাও চমৎকার, তারপর ঐ মেঘে আবার বৃন্দা প্রভৃতির লোচন-চাতক সর্ব্বদা অমৃত পান করিতেছে। ইহা চমৎকারিত্বের চূড়ান্ত। উপমার পর উপমা তুলিয়া চতুর ভক্ত সে শোভারাশি দেখিতে লাগিলেন। তথা শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে।

অনাচ্ছন্নেহম্ভোদৈ র্দিবসকরবিম্বোপরি স চেৎ
নবাম্ভোদব্যূহঃ প্রকট চপলাভিঃ সুবলিতঃ।
মহাবাত্যোদ্‌ভ্রান্তঃ সতত মভবিষ্যত্তত ইতঃ।
তদা তত্থাধারে রূপমিতি মলম্পত্ত কবয়ঃ॥১৪।৭৪

ভানু মণ্ডলের উপরিভাগ যদি মেঘমণ্ডলদ্বারা আচ্ছাদিত না হয়; এবং স্থিরতর বিদ্যুৎমণ্ডলে যদি অভিনব জলধর মণ্ডল সংযুক্ত হয়—ও মহাবায়ু সমূহে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ নিয়ত পরিভ্রমণ করে তবেই এই সখীবেষ্টিত হিন্দোলিকোপবিষ্ট অঘারি শ্রীকৃষ্ণের উপমাস্থল হইতে পারে॥ তখন আরও আশ্চর্য্য হইল। এক কৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বামে লইয়া হিন্দোলে দুলিতে লাগিলেন আর দুই দুইটী সখীর মধ্যে এক একটি কৃষ্ণ অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একপুনশ্চিত্র মভূদমুষাং।
দ্বয়োর্দ্বয়োরাস হরিঃ স মধ্যে॥

এইবার গুপ্ত মাধুরী ষোলআনা ফুটিয়া উঠিল। অহো! মাধুর্য্যের কথা আর কি বলিব—যেন একখানি আকাশ গামী পর্ব্বতে প্রফুল্ল স্বর্ণলতা দ্বারা বেষ্টিতাঙ্গ একটি তমাল তরু শোভা পাইতেছে, আর চারিদিকে অসংখ্য কনককদলী সংযুক্ত-তাপিঞ্ছতরু মণ্ডলীহইয়া পরিবেষ্টন করিতেছে *। এই প্রকারে লীলারূপ সলিল সমূহের ধারাপাতে বিশ্বকে সেচন করিতে লাগিলেন। সে রসস্নাত ভক্তকুল জয় জয় উচ্চারণ করিলেন।

লীলাকীলা লালীধারা পাতৈঃ সিঞ্চন্ বিশ্বং
শ্রীবৃন্দারণ্যেহসৌ জীয়াদেবং দোলালীলাখেলঃ॥

মধুর শ্রীহিন্দোলন লীলার জয় হউক। মধুর শ্রীবৃন্দাবন ধাম জয়যুক্ত হউক।

রঙ্গলালের এই রঙ্গের খেলা নিত্য সত্য। কঞ্জনয়না কালিন্দী কূলে বংশী বটমূলে এই হিন্দোলন লীলা নিত্যকাল চলিতেছে। ক্ষুদ্র দৃষ্টি জীব কিন্তু কিছুকাল পরে আর দেখিতে পাইল না। অনন্ত প্রপঞ্চ-মঞ্চ পরিভ্রমণ করিয়া লীলারস-শেখর আবার কলিসন্ধ্যায় নদীয়া নগরে সর্ব্বনয়ন গোচর

---

* তাপিঞ্ছশ্চেৎ খচর কনকক্ষ্মাভৃদুখোঽভবিষ্যৎ
প্রোৎফুল্লাঙ্গ্যা পুরটলতয়া বেষ্টিতাঙ্গঃ পরীতঃ।
তাপিঞ্ছানাং কনককদলী সংযুজাংমণ্ডলীভিঃ
সাম্যং শৌরে র্জগতি স তদা তাদৃশস্থাপ্যবাপস্থৎ॥১৪।৭৩
গোবিন্দলীলামৃত।

হইলেন। সেই হিন্দোলন এই, এখনও শেষ হয় নাই, ঐযে—

ঝুলত গৌরচন্দ্র অপরূপ দ্বিজ মণিয়া।
বিধির অবধি রূপ নিরুপম কষিত কাঞ্চন জিনিয়া॥
ঝুলায়ত ভক্তবৃন্দ গৌরচন্দ্র বেড়িয়া।
আনন্দ সঘন জয় জয় রব উথলে নগর নদীয়া॥

অনিবার্য্য গৃহকর্ম্ম ফেলিয়া নগরবাসী পুরুষ-নারী আলু-থালু বেশে ছুটিয়াছে। তারা শারদশশী বিনিন্দিত সেই মুখ খানি দেখিয়া জীবন যৌবন ধন্য করিবে।

নয়ন কমল মুখ নিরমল শরত চাঁদ জিনিয়া।
নগরের লোক ধায় একমুখ হরি হরি ধ্বনি শুনিয়া॥

পতিত পাবনী সুরধনীর আজ আর আনন্দের সীমা নাই।

ধন্য কলিযুগ, গোরা অবতার, সুরধনি ধনি ধনিয়া।
গোরাচাঁদ বিনে, আন নাহি মনে,বাসু ঘোষ কহে জানিয়া॥

আসুন ভক্তগণ! ঐ গোরাচাঁদ চরণে জীবন সমর্পণ করিয়া আমরাও বলি জয় নিতাই গৌরাঙ্গ! জয় জয় ঝুলন রঙ্গ!! ঐ রসরঙ্গে কুত্রাপি ভঙ্গ নাই, অনাদি অনন্ত অফুরন্ত। নিত্য ধামে অনাদিকাল হইতে, দুটী ভাই ছিলেন একক। তখন কি রসে ডগমগ ছিলেন, তা কেমন করিয়া জানিব? কে জানে কেন ইচ্ছা জাগিল, 'অনন্ত বিশ্ব সঙ্গে খেলিব।' ঐ ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই স্পন্দন উঠিয়াছে। যমুনাতটে সেই স্পন্দনের মূর্ত্তিখানি আমরা দেখিয়াছি। নদীয়ার মাঠে সে মূর্ত্তির সঙ্গে নাচন কুন্দনে আমরা খেলিয়াছি, আজ এই মহাউদ্ধারণ পটে হৃদয় হৃদয় প্রেমের হিল্লোলে দুলিতেছে, অণুতে অনন্ত সত্তা জাগিয়া উঠিয়াছে। মহানাম হিন্দোলে গোলোক রতন দুলিতেছেন। ভাবময় আঙ্গিনাগগনে রাগময় মাদল গর্জ্জনে জলস্থল বায়ুমণ্ডল দুলিতেছে। নয়ন থাকেতো খুলিয়া দেখ, সারা বিশ্ব জুড়িয়া সে আন্দোলনের ঢেউ খেলিতেছে। কুঞ্জ দ্বারে গড়াগড়ি দিয়া মহানাম-মালা লইয়া ভক্ত কুঞ্জ সেই হিন্দোলনে দুলিয়াছে।

"চালিতা বৃক্ষদোলে আনন্দ হিল্লোলে
গায় পঞ্চবটী জয় মহাউদ্ধারণ রে।"

বনবিহারী বন্ধু হরির অই হেলন দোলনে ভক্ত-কোকিল জাগরণ গাহিয়া জগৎ নাচাইয়া তুলিয়াছে। মহানামের মলয় হিল্লোলে অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতি দুলিতেছে; অই কুসুম-কোমল অঙ্গের অতুল অমূল্য গন্ধে অন্ধ হইয়া জীবকুল ঐ একই বক্ষে হেলিয়া ঢলিয়া ছুটিয়াছে। "বন্ধু বোল" বোল বলিয়া, প্রেমভক্তির রোল তুলিয়া, আপনি আপনাহারা হইয়া বনচারী ছন্ন-ভক্ত প্রাণ মাতান গান ধরিয়াছে,—

"বিজনে কোকিল ডাকে,
দোলে ফুল শাখী শাখে,
মলয় হিল্লোলে বিলায় গন্ধ অতুলন।
জয় জগদ্বন্ধু জয় বলরে বদন॥"

—•—

এবারকার জন্মোৎসব।

বহুদিন জন্মোৎসবের আনন্দ উপভোগ করি নাই। প্রাণের ভিতর একটা ভাবের ক্ষুধা, নর্ত্তনলিপ্সা, জন্মোৎসবের তারিখ নিকটে আসিলেই প্রতিবৎসর জাগিয়া উঠিত। জন্মোৎসবের ভিতর যাহা পাইয়াছি, যাহা দেখিয়াছি, শ্রবণরসায়ণ যাহা কিছু শুনিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ে রাখিতে পারি নাই বলিয়াই যেই জন্মোৎসবের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে, বঙ্গ জননীর ক্রোড়বিচ্যুত প্রবাসী বাঙ্গালী বান্ধবের হৃদয় মথিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছুটিয়াছে এবং প্রাণের ভিতর প্রাণটী গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে। সেই ১৩২৮ সনের জন্মোৎসবের স্মৃতির মাধুর্য্যে মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, সেই 'আঁধার ঘর আলো করা মাণিকের' জ্যোতির ঝলক তড়িৎপ্রভার মত এখনও মনের অন্ধকার কক্ষে উঁকি মারিতেছে।

তাই জন্মোৎসবে যোগ দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা প্রাণে

আসিলেও, আর সেই ধামপুন্দর সোণার নাগরের প্রকট বিগ্রহ দেখিতে পাইব না বলিয়া, এ কয় বৎসর মনটা জন্মোৎসব দেখিতে ইচ্ছা থাকা সত্বেও দমিয়া যাইত। সর্ব্বদা মনে মনে বলিতাম কি দেখিয়াছি! আর কি দেখিব? উৎসবের পরে ভাগ্যবান্ ভাইদের নিকট উৎসবের বিবরণ শুনিতাম, শুনিতাম, তেমন করিয়া দেশ দেশান্তরের নরনারী পাগল হইয়া ছুটিয়া আসে কি না? এক কক্ষে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ও ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের নরনারী অসঙ্কোচে শ্রীশ্রীবন্ধুর লীলা মাধুরী কীর্ত্তন করিয়া যামিনী জাগিয়া পোহায় কি না? শ্রীঅঙ্গনের কোণে কোণে, বাহিরের প্রাঙ্গনে কুণ্ডতীরে, চালিতাতলায়, লাইব্রেরীঘরে, ভক্তাবাসে, ফরিদপুর সহরের পান্থশালায়, চৌধুরী বাবুদের বাগান বাড়ীতে তেমন করিয়া ভক্তকুল প্রেমে আকুল হইয়া বন্ধুগীতি গাহিয়া বেড়ায় কি না? শুনিতাম, মনে হইত জন্মোৎসব হয় বটে, কিন্তু বোধহয় তেমনটী এখন আর হয় না। ১৩২৮ সনের ১লা আশ্বিন তারিখে প্রভু লোকলোচনের অগোচর হইয়াছেন, এবং তদবধি সাধারণ লোকের প্রাণে প্রভুকে দর্শন করিবার আর্ত্তিজনিত জন্মোৎসবে যোগদান করিবার যে স্পৃহা, তাহার অভাব ঘটিয়াছে; দূর দূরান্তর হইতে যে সকল ভক্ত শ্রীশ্রীহরিপুরুষের অপ্রাকৃত বিগ্রহ দর্শনের লালসায় ব্যাকুল হইয়া জন্মোৎসবে আসিতেন, তাঁহারা প্রভুর অদর্শনাবস্থায় শ্রীঅঙ্গন যাত্রায় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু এ সকল কারণ সত্বেও এবার যেন প্রাণের ভিতর জন্মোৎসব দর্শন করিবার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল।

ইচ্ছা হইল, আট বৎসর ধরিয়া অবিরাম অহোরাত্র মহানাম যজ্ঞ চলিতেছে, নামরূপী প্রভু সেই মহানামের সঙ্গে মহারসের রসাস্বাদনে বিভোর; আনন্দের এই অনুকূল অবস্থায় জন্মোৎসবে কি আনন্দ ওঠে একবার দেখা চাই, হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু! আর সেই জগদ্বন্ধুর মহানাম, শ্রীশ্রীবন্ধুর মহাধাম শ্রীঅঙ্গনে অহোরাত্র অষ্ট বর্ষাধিক কাল যাবত একান্তরাগে গীয়মান হইতেছেন; সেই কীর্ত্তন মহাযজ্ঞে নিয়ত কলির জীবের পাপতাপের আহুতি পড়িতেছে। নামধারী মহানামেব্রতী বালক ও যুবকদল, অনাহারে অনিদ্রায় ভোগদেহকে জীর্ণ ও শীর্ণ করিয়া লইয়া ধামযোগ্য দেহগঠন করিতেছেন, এই যে ঘটনাপরম্পরা, আনন্দ ব্রহ্মের উপাসনায় তাহাদের কোনও স্থান আছে কি না, মহাউদ্ধারণ লীলায় এই যে ভক্তনিগ্রহ, এই কঠোর তপস্যায় আনন্দের ক্ষেত্র আরও উর্ব্বরতা লাভ করে নাকি তাহা দেখিতে হইবে। গ্রাম্যবার্ত্তা নিয়ে তো জীবনই কাটাইয়া দিলাম, যা হউক এইবার কয়েকদিনের জন্য পাশবিক ব্যবসার ফাঁদ হইতে নিজেকে কয়েকদিনের জন্য সবলে মুক্ত করিয়া একবার ব্রজের ধূলি গায় মাখিবার আশায় সর্ব্বধামসমষ্টি শ্রীশ্রীগোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনে ছুটিয়া পালাইবার জন্য কৃত-সংকল্প হইলাম।

যেই-ই আমার মনে এই সাধু সংকল্পের উদয় হইল, অমনি মদীয় গুরুদেব শ্রীলশ্রীপাদ মহেন্দ্রজী অযাচিত কৃপায় আমাকে আকর্ষণ করিলেন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উৎসব সমিতির কর্ম্মকর্ত্তাদের স্বাক্ষরসম্বলিত নিমন্ত্রণ লিপি আসিয়া পৌছিল। পত্র পড়িয়া দেখিলাম এবার নূতন লোক উৎসবের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এতদিন সুধু কাঙ্গাল ও নিঃস্ব বৈরাগীরা-ই প্রভুর জন্মোৎসবের ভার বহন করিয়া আসিতেছিলেন, এবার দেখিলাম ফরিদপুর সহরের গণ্যমান্য হিন্দুনেতাগণ প্রভুর জন্মোৎসবে আসরে নামিয়াছেন। ব্যাপারটি খুব বড় নহে, কিন্তু এই জীবাধমের মত, শ্রীশ্রীবন্ধু লীলায়, একটা প্রকাণ্ড মহা-উদ্ধারণ লীলার ক্রমবিকাশ ও একটা বিরাট পরিণতি যাঁহাদের লক্ষ্যের বিষয়, তাঁহারা এই ঘটনাটীকে মহা-উদ্ধারণ লীলার ইতিহাসে একেবারে অকিঞ্চিৎকর বা অর্থবিহীন বলিয়া মনে করেন না, তাঁহারা আমার সঙ্গে সোল্লাসে বলিয়া উঠিবেন,—"জয়জগদ্বন্ধু হরি!" "প্রভু তোমার লীলা দেখি!" আরও বলিবেন—

"কারুণ্যেক্ষণে হের কীট ইন্দ্রজাল।
বন্ধুবাঞ্ছা শুভদৃষ্টি প্রভু দয়াল॥"

শ্রীশ্রীহরিকথা।

মহাউদ্ধারণের টান সমানভাবে চ'লেছে, তাহা না

হইলে ইঁহারা আসিলেন কেন? ইঁহাদের অন্তরে শ্রীশ্রী প্রভুবন্ধুসুন্দরের জন্মোৎসব একটি গৌরবময় জাতীয় অনুষ্ঠান, এই জ্ঞান জন্মাইয়া দিয়া যিনি ইহাদিগকে শ্রীঅঙ্গনে আনিয়া মিলাইয়া দিলেন, একদিন তিনি সমগ্র জগতের জীবকে এমনই করিয়া জগতের আঙ্গিনায় প্রেমের ভূমিতে, শ্রীশ্রীনামের ছত্রতলে মিলাইয়া দিবেন, সে দিন তাঁহার মহা-উদ্ধারণলীলার মহাপ্রকাশের দিন! যাহাই হউক এবার বড়লোকদের নিমন্ত্রণ পাইয়া ছাপ্পান্ন ভোগের মহাপ্রসাদের লোভেই হউক অথবা কীর্ত্তন করিয়া বড় লোকের আরও একটা সার্টিফিকেট্ পাওয়ার লোভেই হউক "সস্ত্রীকং ধর্ম্মমাচরেৎ" বাণীর মর্য্যাদা রাখিয়া স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ শ্রীঅঙ্গনে ছুটিলাম। গত ২৩শে বৈশাখ মঙ্গলবার শ্রীশ্রীবন্ধুহরির এই জগতে অবতীর্ণ হওয়ার তিথি শ্রীসীতানবমী ছিলেন। সেই দিন মঙ্গল প্রভাতে ফরিদপুর রেলষ্টেশনে অবতরণ করিয়া দেখি হরতাল। সঙ্গে বাক্স, পেটরা যা' কিছু ছিল, তাহা শ্রীঅঙ্গন পর্য্যন্ত পৌঁছান আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই বুঝিয়াই হয় তো পরমদয়াল প্রভু প্রাণপ্রিয় বান্ধব-শ্রীমান নিত্যসেবক ভায়াজী, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু দাদা, শ্রীমান্ ভক্তদাস ভায়া ও শ্রীযুক্ত মঙ্গল দাদা, ইহাদিগকে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া রাখিয়াছিলেন। উহারা শ্রীযুত রামদাস বাবাজী দাদামহাশয়কে ষ্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া নিতে আসিয়াছিলেন কিন্তু তিনি সে গাড়ীতে না আসাতে তাঁহাদের সে আপ্যায়ন ও আদরটা ভাগ্যক্রমে আমারই জুটিয়া গেল। তারপর শ্রীমান্ ভক্তদাস (জুড়ান ভাই) ও নিত্যসেবকজী এবং ৩টী হরতাল ক্ষেত্রের স্বেচ্ছাসেবকের সহায়তায় শ্রীঅঙ্গনে পৌঁছিলাম।

শ্রীঅঙ্গনে যাইয়া দেখিলাম উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, পাকা নাটমন্দিরে এখনও ছাদ দেওয়া হয় নাই বলিয়া টীনের ছাদ তৈয়ার করিয়া উপরে ছাউনী দেওয়া হইয়াছে। সেই নাটমন্দিরে উৎসবের সংকল্পিত সাময়িক ৫৬ প্রহর নামযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছেন। বন্দনা ও প্রদক্ষিণাদি সেবা সমাপ্ত করিয়া এই আনন্দের ভাণ্ডারী গুরু মতিচ্ছন্নের চরণবন্দনা করিয়া তথায় দুই অধিকারী মহাজনকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের চরণধূলি পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। তন্মধ্যে একটী ভক্তিসাগর শ্রীল শ্রীযুক্ত কালীহরদাস বসু এবং অপরটী শ্রীল শ্রীযুত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভাগবতভূষণ মহাশয়। দুই জনই ভক্তিশাস্ত্রে পরম সুপণ্ডিত এবং প্রভুর মর্ম্মী ভক্ত। ক্রমে ক্রমে একটী একটী করিয়া স্মৃতির কমল ফুটিয়া উঠিল, জয় পাড়ায় মধুদাদা, পালংগঞ্জের মাখনদাদা, মুন্সীগঞ্জের জনার্দ্দনদাদা, সন্ন্যাসী বলভদ্র, ইত্যাদি সকলের সঙ্গেই বন্দনালিঙ্গন হইল; মহা-নামপ্রচারের বিজয়েতিহাস মনে পড়িয়া গেল, মুন্সীগঞ্জের আশ্রমপ্রতিষ্ঠা, জয়পাড়ায় ৫৬ মাদল, পালংগঞ্জে গুরু মতিচ্ছন্নের পদার্পণ ইত্যাদি মধুর স্মৃতি জীবন্ত হইয়া প্রাণের পুরে আবার জাকিয়া বসিল।

সব ভুলিলাম, ঘর, সংসার, বিষয়কাম সমস্ত ভুলিয়া সুধু আনন্দ লুটিতে লাগিলাম! মরি! মরি! মানুষ যদি সেই আনন্দ জীবন ভরিয়া আস্বাদন করিতে পারে, তবে সে অন্য পদার্থ কামনা করিবে কেন? আনন্দ ঘন গৌরকিশোর এবার পঞ্চতত্ত্বময় হইয়া ও সর্ব্বশক্তি সঙ্গে লইয়া, একাধারে সমস্তলীলার ঘনীভূত রস আস্বাদন করিতেছেন, মহানামের মহাযজ্ঞ সেথায় সুদীর্ঘ অষ্টবর্ষ যাবত অহোরাত্র চলিতেছে; শ্রীঅঙ্গনের বাতাস আনন্দ ব্যজন করিতেছে, শ্রীঅঙ্গনের রজ আনন্দ বিকীরণ করিতেছে, শ্রীঅঙ্গনবাসী বান্ধবগণের সঙ্গে আনন্দ, শ্রীঅঙ্গনের কুসুম-গন্ধে সেই আনন্দ, শ্রীঅঙ্গনের চাঁপিতারাণীর সুশীতল ছায়ায় সেই আনন্দ, শ্রীঅঙ্গনের কুঞ্জনীরে সেই আনন্দ, শ্রীঅঙ্গন-পালক মহেন্দ্রজীর হাসিতে সেই আনন্দ, আরাত্রিকের ধুপ-গন্ধে সেই আনন্দ, প্রেমদাসের আরতিকীর্ত্তনে সেই আনন্দ মহাপ্রসাদ ও মহামহাপ্রসাদের সেবায় সেই আনন্দ, মঙ্গল-আরতির ঘণ্টানাদে সেই আনন্দ, মহানামযজ্ঞের মহারোলে সেই আনন্দ, সেই আনন্দে বিভোর হইয়া মহানামের সাধুগণ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পাগল হইয়া নাচিতেছেন; সন্ধ্যায় আরতিতে সেই আনন্দে পাগল হইয়া ঢাকের শব্দকে পরাস্ত করিয়া পাষণ্ডের প্রাণ বিকল করিয়া শ্রীখোল বাজিতেছে, সেই আনন্দে তালে তালে করতাল বাজিতেছে, হরিপুরুষের বিলাস মঞ্চ প্রদক্ষিণ করিয়া আনন্দ ছড়াইয়া বিলাইয়া ভক্তগণ নাচিতেছেন! সব আনন্দময়! আনন্দ-

ময়ের শুভজন্মোৎসবে আনন্দের কাঙ্গাল জীব আনন্দ লুটিতে আসিয়াছে! নর, নারী, বালক, বৃদ্ধ, শিশু,যুবা সকলে মিলিয়া আনন্দের বাজার মিলাইয়াছে, সবারই মুখ আনন্দোজ্জ্বল, সবারই গতি নর্ত্তনশীল, সবারই ভাষণ কবিত্বময়!

এবার সার্ব্বজনীন জন্মোৎসব হইয়াছিল বলিয়া লীলাকীর্ত্তন রসকীর্ত্তন ও শ্রীযুত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন মহাশয়ের ভাগবতী বক্তৃতা এবং প্রাণের বান্ধব হারাণ দাদার ভাগবত পাঠ ইত্যাদি বহুবিধ অনুষ্ঠান এবার উৎসবের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। মনোহরসাহী পদকীর্ত্তনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন উথলীনিবাসী শ্রীযুত প্রাণাধিক-গোস্বামিপাদ, তিনি 'দানলীলা'—'কলহান্তরিতা' ও 'কুঞ্জভঙ্গ' এই তিন পালা, তিন দিন কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অপর কীর্ত্তনীয়া ছিলেন প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ ও অশেষ কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীল শ্রীযুত নবদ্বীপচন্দ্রদাস মহাশয় (নাওভুবীর শ্রীযুত ভুবন ঘোষ মহাশয়) যাঁহার নিকট শ্রীশ্রীপ্রভু স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ-করিয়াছিলেন ও আত্মপরিচয় দান করিয়াছিলেন, বহুদিন হইতে প্রাণবন্ধুর মর্ম্মী নর্ম্মসখা নবদ্বীপ দাস মহাশয়ের নাম শুনিয়া আসিতেছিলাম। তিনি ভাগবতের প্রসিদ্ধবক্তা শ্রীল শ্রীযুত প্রাণগোপাল গোস্বামিপাদের পরমমিত্র এবং উক্ত গোস্বামিপাদের শিষ্যগণ তাঁহাকে কাকাগোঁসাই বলিয়া ডাকেন এ সংবাদও জানিতাম। হরিদ্বার কুম্ভমেলায় তাঁহার অবস্থান স্থলে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও আলাপ করিবার সৌভাগ্য হয় নাই, কিন্তু এবার প্রভু আমার সে আশা সম্পূর্ণরূপে সফল করিয়াছেন। শ্রীঅঙ্গনে এবার উৎসব উপলক্ষে যে সপ্তাহাধিক কাল অবস্থান করিয়াছিলাম, তখন পরমবান্ধব ও মিতে নবদ্বীপ দাস মহাশয়ের সঙ্গলাভে ধন্য হইয়াছি এবং তাঁহার রসাল প্রসঙ্গে ও মধুর রসিকতায় স্নিগ্ধ হইয়াছি। ভাবুক এবং রসিক হওয়া যে ভাগবত ভক্তের লক্ষণ তাহার পূর্ণ বিকাশ নবদ্বীপ দাদার ভিতর দেখিয়াছি। সর্ব্বোপরি মুগ্ধ হইয়াছি তাঁহার অপূর্ব্ব কণ্ঠের বীণার ঝঙ্কার শুনিয়া, সে যেন বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। হরিপুরুষের কৃপাসুধায় সিক্ত হইয়া সে যে মাধুর্য্যলাভ করিয়াছে তাহা এ জগতে দুর্ল্লভ। নবদ্বীপ দাদার সঙ্গে প্রভুর বড় আদরের "মধুমঙ্গল" শ্রীল শ্রীযুক্ত হরিচরণ আচার্য্যপাদ দাদামহাশয়ের নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁহাকে কোকিলকণ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। উক্ত দুই পরমাধিকারী বান্ধবের নামোচ্চারণেরপরে শ্রীশ্রীবন্ধু হরির কৃপাসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুত সতীশ দাস ও মনমোহন দাস মোহান্ত দাদাদের "শ্রীশ্রীহরি কথা" পদকীর্ত্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের শ্রীখোলবাদকগণ অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া ভক্তগণের পরমানন্দ দান করেন। সতীশ দাদার কণ্ঠও অতি মনোহর। সকলের নীচে মতিচ্ছন্নের কৃপাস্নিগ্ধ এই জীবাধমও আনন্দে উল্লাসে পাগল হইয়া "পাষণ্ডদলন" "নিমাইসন্ন্যাস" ও "ভূতিবরহ ও দূতী সংবাদ বা মাথুর" এই তিন পালা কীর্ত্তন এবং এক দিবস শ্রীশ্রীহরিপুরুষতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছিল, কিন্তু আমাদের শিক্ষাকে ম্লান করিয়া "গরাণহাটী" সুরে ও তালে রাসরসিয়া চিত্তবিনোদন অপূর্ব্ব "রাসলীলা" গান করিয়াছিলেন, বন্ধু কৃপার বিশাল আধার শ্রীপাদগোপী-বন্ধুদাসজী, গভীর রাত্রে অন্তরঙ্গ বান্ধবগণকে গোপীবন্ধুদাস দাদা যে অমৃত আস্বাদন করাইয়াছিলেন, সে যেন শুকমুখ নির্গত হইয়া শ্রীচৈতন্যের রসের সিরায় পাক হইয়া আসাতে মধুরং মধুরং মধুরং হইয়া, ভক্তমাত্রের দ্বারা আস্বাদিত হইয়াছিল। এই যে কীর্ত্তন রসের বাদল বন্যা, এ তো নিত্যই হইতেছে, কিন্তু তথাপি লীলাকীর্ত্তন ও আস্বাদনের সহিত অলঙ্কৃত হইয়া মহানামযজ্ঞ-উৎসবের কতিপয় দিবস অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। নামের বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের ভিতর দিয়া প্রেমের বন্যা বহিয়া যাইতেছিল। পদকীর্ত্তন জমিয়া উঠিল, অমনি ঘন ঘন চতুর্দ্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি, মণ্ডা, বাতাসা বৃষ্টি, ঘন ঘন শ্রোতৃমণ্ডলে হরিধ্বনি, বালকবৃদ্ধ সকলে মিলিয়া তালে তালে হরি ব'লে নাচা এবং দুর্য্যোগ ও বর্ষার বর্ষণ স্বত্বেও মহিলা কুলের কুল ছাড়িয়া ভগবৎপ্রেমের অকূল সাগরে ভাসিয়া আসা দেখিয়া প্রাণ আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিত, সেথায় আর কিছুই নাই শুধুই নামপ্রেমের বেপারীগণ গাইয়া গাইয়া ডাকিয়া চলিয়াছে, চাই নাম, চাই প্রেম, সে ব্যাপারে জগদ্বন্ধু হরির পালন ও পোষণকারিণী জগদ্ধাত্রীরূপা অতি বৃদ্ধা শ্রীযুতা

দিগম্বরী দেবীও আছেন। তাঁহারই সঙ্গে পঞ্চম বর্ষীয় শিশু বালক ও বর্ষত্রয় বয়স্কা বালিকাও মুগ্ধহইয়া শ্রীঅঙ্গনের প্রাঙ্গনে গড়াগড়ি যাইতেছে।

একদিকে তো নামপ্রেম অকাতরে বিতরণ, অপরদিকে **জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে এক পংক্তিতে** বসিয়া মহা-প্রসাদ ভক্ষণ। মহাউদ্ধারণের জন্মোৎসবে শ্রীঅঙ্গনের শ্রীক্ষেত্রে কেহই কাহার ও জাতির অধিকার দাবি করিতেছে না বা জন্মের সুযোগ খুজিতেছে না, নির্ব্বিকার চিত্তে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নমঃশূদ্র ও মুসলমান পর্য্যন্ত এক পংক্তিতে বসিয়া মহাপ্রসাদ পাইতেছে। সেখানে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিতেছেন, সত্যাগ্রহী ও শুদ্ধসত্ত্ব যুবকগণ, "**শান্তি সমিতির**" প্রেমাস্পদ সদস্যগণ। তাঁহারা জাত্‌পাত্‌ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নবীন ভারতে যে বিরাট জাতি বা nation গড়িতে চাহেন, তাহার একটা বাস্তব ও মনোরম অভিনয়, শ্রীঅঙ্গনের জন্মোৎসবে মহাপ্রসাদ বিতরণে তাহারা দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন এবং কবে ভারতের সর্ব্বত্র এমনই করিয়া ভেদমূলক জাতিবিরোধের মুণ্ডপাত হইবে এই সমস্যা পূরণ করিবার এক প্রবীণ উপায় এই নাম ও প্রেমের মহোৎসব, এই নিশ্চয় করিয়াই যেন তাঁহারা অক্লান্তভাবে পাচকবৃত্তি, বাহকবৃত্তি ও মহাপ্রসাদ বিতরণের যাবতীয় শ্রমসাধ্য কার্য্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। "শান্তি সমিতির" এই উদ্যম অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রাহা বি, এল মহাশয় তাঁহার উক্ত কার্য্যের শৃঙ্খলা ও তৎপরতার জন্য অজস্র ধন্যবাদের পাত্র' শ্রীশ্রীপ্রভু তাঁহাকে চিরকুশলে রাখিয়া শান্তির অধিকারী করুন—তাঁহার চরণে আমরা ইহাই প্রার্থনা করি।

ভাণ্ডার ঘরে শ্রীমান্ উদ্ধারণ দাস শতমূর্ত্তি ধরিয়া খাটিতে-ছিলেন, মনে হইতেছিল যেন খাঁটিসোনায় মাটী লাগিয়াছে কিন্তু ঘসিলে পরে ভিতরের সে জ্যোতি নিশ্চয় প্রকাশ পাইবে। টেপাখোলার ভক্তগণ মহাপ্রসাদ বিতরণে অকৃপণ ভাবে যে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের উপযুক্ত-ই হইয়াছে। শুনিলাম এক একদিন এক এক জন ভক্ত মহোৎসবের প্রসাদ বিতরণের সম্পূর্ণব্যয় বহন করিয়াছেন। যাহারা সে কার্য্য করিয়াছেন তাঁহাদের অর্থোপার্জ্জন সার্থক হইয়াছে। যে কয়দিন উৎসব চলিয়াছে কেমন করিয়া যে দিবসের পর নিশি অতীত হইয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতেও পারি নাই। নিদ্রা তো আসিবার সময়ই পায় নাই, কেমন করিয়া শয্যাশ্রয় করিব। ৮টা হইতে ১০টা ১১টা রাত্রি পর্য্যন্ত আরতি হইত, তারপর আবার লীলাকীর্ত্তন, তারপর মহেন্দ্রজীর পাদান্তে উপবেশন করিয়া প্রসঙ্গ। যাঁহার কথা কহিতাম, তিনি **অনন্তা-নন্তময়**, সুতরাং তাঁহার প্রসঙ্গের শেষ হইতে না হইতেই রজনী শেষ হইয়া যাইত। মঙ্গলারতির পরে জাগরণ ও প্রভাতী তারপর শ্রীমতী কীর্ত্তন নাট মন্দিরে যখন আরম্ভ হইত এবং পূজনীয় কেদার কাহা ও কামিনী দাদা প্রমুখ প্রাচীন ভক্তেরা যখন মধুর কণ্ঠে গৌরকীর্ত্তন এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন গাহিতেন তখন যেন প্রাণের ভিতর সুধা বৃষ্টি হইয়া যাইত। একদিন দেখি "ভক্তিসাগরে" (প্রবীণ-ভক্ত কালীহর দাস বসু মহাশয়) তরঙ্গ উঠিয়াছে। কামিনী দাদা নাটমন্দিরে শ্রীমতি সংকীর্ত্তনের—"বল্ হরিবল শ্রীকরতাল বাজায়ে মধুর মাদল রে—' এই গান মধুর কণ্ঠে মাতোয়ারা হইয়া গাহিতেছেন আর ভক্তিসাগর মহাশয় প্রেমে আউলাইয়া পড়িতেছেন এবং নানারূপ অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছেন। দূর হইতে সে নৃত্যদর্শন করিয়া আকৃষ্ট হইয়া নিকটে গেলাম, দেখিয়া বাধ্য হইয়া সে কীর্ত্তনে যোগ দিয়া কৃতার্থ হইলাম। পূজ্যপাদ কুলদা বাবু দুই দিবস বক্তৃতা দিয়া রাধাতত্ত্ব ও গৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে মধুর ভাষায় আলোচনা করিলেন। পূজনীয় রামদাস দাদা আসিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াও আসিয়া পৌছিলেন না; মনে হয় শ্রীশ্রীপ্রভু এখনও তাঁহাকে শ্রীঅঙ্গন ভূমিতে আকর্ষণ করেন নাই, তাই রামদাসজী প্রতিশ্রুতি দিয়াও জন্মোৎসবের বিপুল আনন্দে যোগদান করিতে পারিলেন না।

এইবার উৎসব কমিটির কর্ম্মকর্ত্তাদের কথা বলিব। প্রথমতঃ রায় বাহাদুর কামিনীকুমার রায় মহাশয়ের কথা বলিব। তিনি প্রবীণ হইয়াও নবীনের উৎসাহে মাতিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া জন্মোৎসবের জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন এবং প্রত্যহ কীর্ত্তনের আসরে বসিয়া আনন্দ লুটিয়াছেন। বড় চতুর ভক্ত। প্রভু এই রাজের দ্বারা আরও কি বড় কাজ

করাইবেন তাহা প্রভুই জানেন কিন্তু প্রভু যে তাঁহাকে কৃপাদানে কৃতার্থ করিয়াছেন তাহা তাঁহার ঢল ঢল ভাবটী দেখিয়াই মনে হইয়াছে। তারপর শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সরকার মহাশয়দ্বয়ের কথা উল্লেখযোগ্য ইন্দু দাদা প্রভুর অতি নিজজন আর সতীশ বাবুর যেন অবধূত ভাব। যেদিন লীলা প্রকাশ হইবে, সেদিন ইন্দুদাদা ও সতীশ দাদাকে বন্ধুর অন্তঃপুরে দেখিতে পাইব সে ভরসা আমাদের আছে। উকীলদের সম্বন্ধে পরমহংসদেব বলিয়া ছিলেন "ইহাদের উদ্ধার হইবে না।" আর পরমদয়াল বন্ধু হরি বলিলেন, "যত আইন পরীক্ষা সব সংসারের পথকর।" এবার মহাউদ্ধারণের লীলায় উকীলদের ও উদ্ধারণ লাভ হইবে, রণজিৎদাদাকে প্রভু এই জন্যই উকীল করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে সকল উকীলই মহাউদ্ধারণের চরণতলে লুটাইয়া পড়িবে। মথুর বাবুকে পূর্ব্বেই ভক্ত বলিয়া জানিতাম তিনি যে আসিয়া জুটিয়াছেন এ তো হওয়ারই কথা। সুরেশ দাদার তো আনন্দ আর ধরেই না তিনি গদগদ কণ্ঠে বলিতেছিলেন "এইবার লক্ষলক্ষলোকের আসিবার উপায় প্রভু করিয়া দিলেন, কেননা এবার যাহার যাহা কিছু ভাবের পণ্য ও পরমার্থের সম্ভার সব লইয়া শ্রীঅঙ্গনে জন্মোৎসবে বেচাকিনার সুযোগ প্রভু ঘটাইয়া দিয়াছেন, এইবার হইতে শৈব, গাণপত্য ইত্যাদি হিন্দুর যত সম্প্রদায় সুধু তাহাই নহে, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন ও বৌদ্ধ সকলেই আসিয়া মহাবতারীর জন্মোৎসবে যোগদান করিয়া নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী তাঁহার উপাসনা করুক্, এবারকার জন্মোৎসব সেই আহ্বান জগদ্বাসীর নিকট পৌছাইয়া দিয়াছে।

অক্লান্ত কর্ম্মিদের মধ্যে প্রভুর নৈষ্ঠিক ভক্ত মঙ্গলদাদা ও নেপালদাদার কথা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য, পরমার্থের সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ তাহা নেপাল দাদার ব্যবহারে এইবার বুঝিয়াছি। আমি তো আনন্দের ষোল আনা লাভ করিবার জন্য পত্নী ও সন্তানদিগকে ভক্তাবাসে ছাড়িয়া সুধু কীর্ত্তন আর প্রসঙ্গে মাতিয়া রহিয়াছি, ওদিকে নেপাল দাদা যাইয়া আমার ছেলেপিলের খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম ইত্যাদির বন্দোবস্ত স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া করিয়া দিয়াছেন, সে জন্য আমাদের কোন চিন্তাই করিতে হয় নাই। তার উপর কৃপার আহ্বান, নেপাল দাদা ও তাঁহার মাতৃদেবী আমার স্ত্রীপুত্রগণকে গৃহে নিয়া আদর করিবার জন্য কত বার আসিয়া বলিয়াছেন। উকীল বন্ধুদের ভিতর অনেকে বিশেষতঃ যতীন ভায়া প্রভুর পরমভক্ত। ইন্দুবাবু প্রমুখ সকল বান্ধবগণই অজস্রভাবে আমাকে কৃপা করিয়া স্নিগ্ধ করিয়াছেন। এবারে জন্মোৎসবে যাইয়া যে পরম সম্পদ্ লাভ করিয়াছি তাহার তুলনা জগতে নাই; এবং সেই সম্পদ্ লাভের জন্য এবার জন্মোৎসবের কমিটির কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদের চরণে আমার অজস্র প্রণাম। তাঁহারা প্রতি বৎসর এইরূপ কৃপা করিয়া সংসার-দাবদগ্ধ প্রাণে অন্ততঃ সপ্তাহকালের জন্য এই শান্তি ধারা সিঞ্চনের উপায় করিয়া দেন তো চিরকাল তাঁহাদের হইয়া থাকিব।

সে যাহা হউক, দেখিতে দেখিতে, নাচিতে নাচিতে, বিপুল আনন্দের ঝড়বৃষ্টির ভিতর দিয়া উৎসব সমাপ্ত হইয়া গেল, তারপর মোহান্ত-বিদায়ের পালা। "মোহান্ত বিদায়ের" করুণ কাহিনী গৌরলীলায় শুনিয়া ও শুনাইয়া বহুদিন কাঁদিয়াছি। আমার প্রাণারাম প্রভুর প্রকট-বিহারাবস্থায় জন্মোৎসবে আসিয়া বা অন্যান্য আশ্রমে সাময়িক মহানাম যজ্ঞোৎসবে সম্মিলিত হইয়া সেই মোহান্ত বিদায় পালা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, প্রভু লুকাইলে পরে প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে সেই মোহান্ত বিদায়ের স্মৃতি গোপনে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম; এই আশায় যে আমার প্রাণবন্ধুর লীলার মহাপ্রকাশের দিনে আবার সেই পালা দেখিব আর বুক ভাসাইব, কিন্তু এবার প্রভুর অযাচিত কৃপায় তৎপূর্ব্বেই আবার সেই বিদায় পালা গাহিতে বসিলাম, কত দিক্ হইতে প্রভুর কত ভক্ত আসিয়াছিলেন যাওয়ার বেলা কোলাকুলি করিয়া নয়ন-জলে পরস্পরকে অভিষিক্ত করিয়া বিদায় দিলাম। শ্রীঅঙ্গনের ভক্তগোষ্ঠী ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভাঙ্গা হাটে গুরু মতিচ্ছন্নকে একাকী বসাইয়া রাখিয়া, আমরা বিষয়ের কীট আবার বিষয় রাজ্যে আসিয়া পৌছিলাম। কিন্তু এখনও যখন সেই আনন্দের তুফান বওয়া জন্মোৎসবের কথা মনে করি, তখনও প্রাণে একটা অপূর্ব্ব শিহরণ অনুভব করি। জয় জগদ্বন্ধু হরি! জয় মহাউদ্ধারণ লীলা!

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ ভাগবত-তত্ত্ববিশারদ, পাটনা।

জন্ম রহস্য।

শ্রীমহানাম মধু-ভাষ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"শ্রুত আছি।"

এই অপূর্ব্ব রহস্যময়ী জন্মকথা শ্রবণ করিয়া সংশয়োদয় মানবচিত্তে স্বাভাবিক, কারণ আমাদের দৈনন্দিনদৃষ্ট ঘটনাবলী হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। সুতরাং এ সম্বন্ধে প্রমাণ কি বা সাক্ষী কে এইরূপ জিজ্ঞাসা নিতান্ত অযুক্তিকর নহে। প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ভক্ত আছেন। প্রথম শ্রেণীর ভক্তগণ অতি উচ্চাধিকারী। "তুমি প্রভু আমি দাস" এ ছাড়া তাঁহাদের মুখে আর কোন ভাষা নাই, মনে কোন সংশয় নাই, হৃদয়ে কোন প্রশ্ন নাই, তারা সুন্দর, সরল একমাত্র মহানামই তাহাদের সম্বল। এই ভক্তগণের শ্রীচরণ ধূলি আমাদের শিরোভূষণ। ইঁহাদের কিছু জানিবার দরকার নাই, জানাইবার দরকার নাই, বুঝিবার দরকার নাই, বুঝাইবার দরকার নাই। কাজেই তাঁহাদের সম্বন্ধে গ্রন্থকারের কোনও প্রয়াস নাই, ভাষ্যকারেরও কোনও আয়াস নাই। কেবল করপুটে কৃপাভিক্ষা ছাড়া আর ইঁহাদের নিকট আমাদের অন্য নিবেদন নাই।

দ্বিতীয় স্তরের ভক্ত যারা, তারাও প্রভুগতপ্রাণ—কিন্তু অত সুন্দর হইবার সৌভাগ্য তাহারা লাভ করেন নাই। তাহারা বলেন যে 'যদিও নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন "শ্রীভগবানের ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়া শুধু শাস্ত্রের প্রমাণে জানবি কি" তথাপি আবার শ্রীহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন "ভক্তি শাস্ত্র ভাগবত, সার কর অবিরত রে", শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন, "সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য হৃদয়ে করিয়ে ঐক্য।" অতএব আমরা তাঁহাকে জানিব একমাত্র তাঁরই অযাচিত কৃপাহইতে, কিন্তু আস্বাদন করিব সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্য ও ভক্তিগ্রন্থ ভাগবত হইতে। শ্রবণ মঙ্গল তাঁরই কথাগাথা আমরা আলোচনা করিব তাঁরই সাধের উদ্ধারণ ও মহাউদ্ধারণ গ্রন্থরাজি লইয়া। অমৃত তিনি, তাঁকে অনুভব করিব ছানিয়া, মধুসিন্ধু তিনি, তাঁকে আস্বাদন করিব ডুবিয়া, ভাসিয়া, হৃদয় ভরিয়া, সংশয় সন্দেহ যত হৃদয় হইতে দূর করিয়া, বিচারালোকে উদ্ভাসিত হইয়া।'

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তগণের জন্যই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার প্রমাণের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তবে কতকগুলি যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করিয়া কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইব বা কাহারও তত্ত্বনির্ণয়ে সহায়ক হইব এই আশায় এই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি,ইহা যেন কেহ মনে না করেন। তবে শ্রবণের পর মননের বিধান যখন শ্রুতিতেই উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন এই প্রকার মননের ফলে সেই মনোমোহনের মোহন মাধুর্য্য কিঞ্চিন্মাত্রও যদি অনুমিত হয়, তবে এই মরদেহেই অমৃতত্বলাভে কৃত কৃতার্থ হইব, ইহাই চিরন্তন আশা।

অনুমানাদি প্রমাণের কথা গ্রন্থকার "জন্ম" "অমিয়" প্রভৃতি পদ প্রয়োগ দ্বারা ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়াছি। 'শ্রুত আছি' পদের দ্বারা শ্রুতি বা শব্দ প্রমাণের কথা স্পষ্টতরই বলিয়াছেন। কারণ তর্কাদির অগোচর এই সকল অবিচিন্ত্য তত্ত্ব একমাত্র শ্রুতিপ্রমাণ বলেই জ্ঞাতব্য। গোস্বামিপাদ শ্রীল রূপ গ্রন্থপ্রারম্ভে লিখিয়াছেন।

"নির্বন্ধং যুক্তিবিচারে ময়াত্র পরিমুক্তা।
প্রধানত্বাৎ প্রমাণেষু শব্দ এব প্রমাণ্যতে॥"

"আমি যুক্তিবিস্তার বিষয়ে আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া প্রমাণ সকলে শব্দের প্রধানত্ব হেতু শব্দকেই প্রমাণরূপে স্বীকার করিতেছি।" কারণ জীব মাত্রেরই ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই চারিটি দোষ আছে।

অতএব অলৌকিক অবিচিন্ত্যস্বভাব বস্তু স্পর্শে অযোগ্যত্ব হেতু পুরুষকৃত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টারূপ অষ্টবিধ প্রমাণ দোষযুক্ত। অতএব ইহারা পরমার্থ প্রমাকরণ হইতে পারে না। অতএব প্রমাণ কি? শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভকার লিখিতেছেন;—

"অনাদি সিদ্ধ সর্ব্বপুরুষ পরম্পরাসু সর্ব্ব-লৌকিকালৌকিক জ্ঞান নিদানত্বাৎ অপ্রাকৃত বচন লক্ষনো বেদ এব অস্মাকম্ সর্ব্বাতীত সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাচিন্ত্যাশ্চর্য্যস্বভাবং বস্তুবিবদিষতাং প্রমাণম্।"

সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য, আশ্চর্য্য স্বভাববিশিষ্ট বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানাভিলাষী আমাদিগের প্রমাণ, সর্ব্বজ্ঞান নিদান বেদ। এই বেদের লক্ষণ কি? গোস্বামিপাদ শ্রীজীবের ভাষায় "অপ্রাকৃত বচন লক্ষণো বেদঃ"। যে শব্দরাশি অপ্রাকৃত অতএব ভ্রমপ্রমাদাদি প্রাকৃত দোষ বিরহিত তাহাই বেদ। সেই বেদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। গোস্বামিপাদের লক্ষণানুসারে ঋগাদি চারি সংখ্যাতেই বেদকে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। যে শব্দরাশিতে প্রাকৃত ভাবের স্পর্শমাত্র নাই তাহাই বেদ, তাহাই আপ্ত-বাক্য, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। বেদান্ত সূত্রকর্ত্তার "শাস্ত্র যোনিত্বাৎ" সূত্রে শাস্ত্র শব্দের তাৎপর্য্যও ইহাই। শ্রীশ্রীপ্রভু-বন্ধুহরি এই নবযুগে আরও "পঞ্চগ্রন্থ"কে বেদতুল্য বা তদপেক্ষা অধিক পূজ্য বলিয়াছেন। তদপেক্ষা অধিক বলিলাম, কেননা, শ্রীগীতাগ্রন্থে "যাবানর্থ উদপানে" শ্লোকে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের বেদে নিষ্প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীপঞ্চগ্রন্থের আশ্রয় চিরকালই গ্রহণীয়। তাই শ্রীশ্রীপ্রভু নিজে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' স্বয়ং বুকে করিয়া রাখিতেন। কারণ উক্ত শ্রীগ্রন্থ-"পঞ্চগ্রন্থের" অন্যতম। অপর চারিখানির নাম যথাক্রমে "শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীশ্রীগোবিন্দ লীলামৃত ও শ্রীশ্রীউজ্জ্বল নীলমণি"। অল্পকথায় যাহা কর্ম্মফলভোগী শরীরধারী জীবরচিত নহে তাহাই অপৌরুষেয় বেদ। অবতার পুরুষের বাক্য, ভক্তজনের বাণী সবই বেদ। কারণ তাহা প্রমাদাদি দোষদুষ্ট নহে।

শ্রীশ্রীগীতা যেমন শ্রীপদ্মনাভের মুখপদ্মবিনিসৃতা বলিয়া প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম, শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টক ও তেমনি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের মুখপদ্ম বিগলিত বলিয়া অপ্রাকৃত শাস্ত্র শিরোমণি। শ্রীশ্রীপ্রভু-বন্ধু-হরির শ্রীহস্ত লিখিত শ্রীগ্রন্থরাজি ও শ্রীমুখোক্ত মহাবাণীসমূহ অপ্রাকৃত মহামহাবেদ। তাই শ্রীপাদ গ্রন্থ-কার স্বকীয় গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করে উক্ত গ্রন্থ-রাজিকে 'ভগ্নি' সম্বোধনে এই দেখুন কি বলিতেছেন।

"জয় বিদ্যানিষ্ঠা সতী উদ্ধারণ গ্রন্থ কুলরাণী।
মহাধর্ম্ম মহাউদ্ধারণপ্রভুলেখনী ভগিনী॥
পরাতত্ত্ব সুধাসরিৎ ও রাঙ্গা পায়ের ঘামে জানি।
কুমারীভাব কল্লোল তুলে কাঁদাও কত বেদবেদান্তে ধনি॥

"শ্রুত আছি" বলিয়াও এই মহাবেদ মহাপ্রমাণের কথা বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীবন্ধুর মুখারবিন্দ বিগলিত অমিয়বাণী ও শ্রীলেখনীপ্রসূত উদ্ধারণ ও মহাউদ্ধারণ গ্রন্থরাজি ও শ্রীশ্রী বন্ধুলীলাসরসীতে সন্তরণকারী ভক্তবৃন্দের বাক্য সুধা লহরী, শ্রীশ্রীপঞ্চগ্রন্থ ও শ্রীদশমস্কন্ধ ইহাই বন্ধু ভক্তগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়। কেবল এই জন্মরহস্য বিচারে নহে। যাবতীয় লীলাতত্ত্বের রহস্যদ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে ইহা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নাই। এই সুদৃঢ় আশ্রয়ে স্থিত হইয়া স্বকীয় অনুভূতি বলেই তিনি এই অপূর্ব্ব রহস্যময়ী জন্মকথা প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব ইহা অভ্রান্ত।

কিন্তু দুঃখের কথা এই যে ঐ সকল গ্রন্থরাজির ভাব-ভাষা শ্রীমুখের বাক্‌চাতুর্য্য ও অধিকারী ভক্তজনের ভঙ্গি ও ইঙ্গিত বুঝিবার মত অধিকারী সাধারণ জীব নয়। বেদান্ত দর্শনের প্রথম সূত্রের প্রথম পদটি "অথ" তাহার শারীরক ভাষ্য বা শ্রীভাষ্যের প্রতি দৃক্‌পাত করিলে আমরা উক্ত অধিকারীর কি কি গুণ থাকা আবশ্যক জানিতে পারিয়া আপনাদিগকে বেশ অনধিকারী বলিয়া বুঝিতে পারি। এইরূপ অনধিকারীর সংখ্যাই জগতে অধিক। মনে করিবেন না কেবল পাণ্ডিত্য হইলেই শাস্ত্র পাঠে অধিকারী হয়। শিক্ষা,

কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ বেদের এই ষড়ঙ্গ। এই ষড়ঙ্গ যথাযথ আয়ত্ত করিয়াও শাস্ত্রে অধিকার হয় না। তাই পরম কারুনিক জৈমিনি ঋষি অনন্য সাধারণ ধী-শক্তির পরিচয় দিয়া মীমাংসা নামক একখানি দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ণ করিয়াছেন। এই দর্শনের সম্যক্ জ্ঞান না লইয়া বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে সূক্তের পর সূক্তে, মন্ত্রের পর মন্ত্রে এত বিরুদ্ধ ভাবের কথাদৃষ্ট হইবে যে ভক্তি সহকারে বেদপাঠ করা আর ভাগ্যে ঘটিবে না। মহর্ষি জৈমিনি ঐ সকল আপাত বিরোধী বাক্যাবলীর যেরূপ সুন্দর সুযুক্তিপূর্ণ সমাধান করিয়াছেন তাহা দেখিলে যুগপৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে হৃদয় আপ্লুত হয় এবং উক্ত ঋষিবরের নিকটে আমরা যে কতঋণী ভাবিয়া প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরপুর হয়। কিন্তু এখন দুঃখের কথা এই যে বেদ চতুষ্টয়ে প্রবেশ পথে মন্ত্র সমূহের আপাত বিরোধীরূপ যে কণ্টক ছিল, মুনিশ্রেষ্ঠ জৈমিনি স্বকীয় মীমাংসা সূত্র দ্বারা তাহা দূর করিয়া সহজ সরল ও সুগম করিয়া দিয়াছেন বটে কিন্তু শ্রীজীবের সংজ্ঞানুসারে যে সকল উদ্ধারণ ও মহাউদ্ধারণ গ্রন্থরাজি বা মহাবাণী সমূহের বেদত্ব প্রতি পাদন করিয়াছি, তাহাতে মাদৃশ অনধিকারী জীবের প্রবেশ পথে যে সকল বাধা আছে তাহা দূর করিবার জন্য আর একখানি মীমাংসা দর্শনের সৃষ্টি হয় নাই। ইহাই সুনির্ম্মল ধর্ম্মে নানা প্রকার অবিলতা প্রবেশ করিবার অন্যতম কারণ। প্রত্যেক ধর্ম্মই ধর্ম্ম যাজকগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। এই প্রচারকগণ প্রায়শঃ অতি উচ্চাধিকারী থাকেন। কাজেই পরবর্ত্তী লোক প্রচারকগণের আপাত বিরোধী বাক্যাবলীর সমাধান করিতে না পারিয়া বিপথগামী হয়। অতএব প্রত্যেক ধর্ম্মের তত্ত্বমোপযোগী মীমাংসার প্রয়োজনীয়তা আছে ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীশ্রীভক্তি গ্রন্থরাজির অধিকারীর কথা বলিতে গিয়া প্রভুবন্ধু কহিয়াছেন—

"ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত, সারকর অবিরত রে
অনাসক্তি শুদ্ধাভক্তি ভাবসুনির্ম্মল রে"

বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া, হৃদয়ে শুদ্ধাভক্তি লইয়া শান্ত সুনির্ম্মল ভাবে ডুবিয়া ভক্তি শাস্ত্র পাঠে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অন্যত্র একটি ভক্তকে শ্রীমদ্‌ভাগবত ও শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা পাঠ করিতে বলিয়া তাহাতে অধিকারীর কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যথা—

"শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিও।
প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা মুখস্থ করিও॥"

এই কথা লিখিয়াই, কি হইলে তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে অধিকারী হইবে, বলিতেছেন। যথা—

"হৃদয়ে গৌরচন্দ্র জপিও।
স্বরূপ দামোদরে আত্মসমর্পণ করিও।
গৌর-গদাধর ধ্যান করিও॥"

এইরূপ অধিকার হইলে তবে ভক্তিশাস্ত্রের রস মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারা যায় ও নানাপ্রকার আপাতবিরোধী বাক্য সমূহের গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু আমরা তাদৃশ অধিকারী নহি। অথচ শ্রীশ্রীভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিবার বাসনাও আছে কাজেই আমাদের অবস্থা সেই কবিরা ভাষায় বলিলে—

নেত্র নাই বাঞ্ছা হেরি বিধুর বদন।
কর্ণ নাই চাই শুনি ভ্রমর গুঞ্জন॥

কাজেই পদে পদে পদস্খলন সম্ভাবনা, আমি মূঢ়বুদ্ধি অজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত। তথাপি কৃপা আজ্ঞা শিরোধারণ করত এই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, শাস্ত্রজ্ঞ বান্ধবগণ অজ্ঞ বলিয়া কৃপাবর্ষণ করতঃ ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিলে ধন্য হইব।

মহর্ষি জৈমিনি প্রবর্ত্তিত বিচার প্রণালী এই রূপ :—

তিনি সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মের একটি সংজ্ঞা করিয়াছেন, এবং সমগ্র বেদের সেই ধর্ম্মে প্রমাণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। "চোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ।" ইহাই জৈমিনি কৃত ধর্ম্মের লক্ষণ চোদনা অর্থ প্রবর্ত্তনা। গায়ত্রী মন্ত্রে "প্রচোদয়াৎ" পদেও এই প্রবর্ত্তনার কথা বলিয়াছেন। সেই কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনা যাহাতে আছে তাহাই ধর্ম্ম; এবং এই কর্ম্মপ্রবর্ত্তনা যে মন্ত্রে আছে তাহাই ধর্ম্মে প্রমাণ। বেদে তাহা আছে অতএব বেদ প্রমাণ। কিন্তু এইরূপ যুক্তির মধ্যে ভুল থাকিল। কারণ বেদের সমস্ত ঋকের মধ্যে এই প্রবর্ত্তনা-লক্ষণ নাই, বরং বিপরীত রূপ আছে। কর্ম্মকাণ্ড হইতে একটি দৃষ্টান্ত বলিব। "স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত" স্বর্গ-কামী ব্যক্তি

অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে। এইটি বিধিবাক্য, ইহাতে কর্ম্মপ্রবর্ত্তনা আছে ও ইহা স্বর্গ প্রাপ্তিরূপ ধর্ম্মের উপযোগী অতএব জৈমিনি লক্ষণানুসারে ধর্ম্মে প্রমাণ।

কিন্তু "তরতি মৃত্যুং তরতি পাপ্মানং তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতে। য উ চৈনং বেদেতি" যে এই যজ্ঞের বিষয় জানে তাহারও পাপমুক্তি ও মৃত্যু জয় হয়। এই শেষোক্ত বাক্যটিতে কোনও কর্ম্মচোদনা নাই বরং বিরোধ আছে। তাহা এই, কেবল মাত্র অশ্বমেধের বিধান গুলি জানিলেই যদি পাপ মুক্ত হওয়া যায় তবে তদনুষ্ঠান হেতু প্রযুক্ত বিধান সমূহ বৃথা হইয়া যায়। কারণ শুধু জানিলেই যদি অনুষ্ঠানের ফল পাওয়া যায় তবে কোন অজ্ঞ ব্যক্তি অত কষ্ট করিয়া নানাবিধ ক্লেশকর যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে? এইরূপ অসামঞ্জস্য থাকায় ও কর্ম্ম প্রবর্ত্তনা না থাকায় এই বাক্যটি প্রমাণ হইতে পারে না। অথচ ও কথাটিও শ্রুতিতেই আছে। মীমাংসা দর্শনকার তাই ঐরূপ বাক্য-সমূহের সম্বন্ধে এইরূপে প্রামাণ্য সমাধান করিয়াছেন, যথা—

"বিধিনাত্বেক বাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাংস্যুঃ"

এইরূপ বাক্যাবলী বিধিবাক্য নহে অর্থবাদ বাক্য। বিধিবাক্য যেরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্মে প্রমাণ, অর্থবাদ বাক্য সেরূপ নহে। বিধিবাক্যের সঙ্গে একবাক্যতাপন্ন হইয়া পরম্পরা সম্বন্ধেই তাহাদের প্রামাণ্য। অর্থবাদ প্রধানতঃ বিধি স্তুতিতেই নিয়োজিত। "যন্নয়তে তদ্বিধীয়তে" এই ন্যায়ানুসারে ফলবলাৎ তাহার প্রমাণতা হয়। স্বর্গকামী অশ্বমেধ করিবে এই বাক্যে প্রকৃষ্ট প্রামাণ্য আছে, পরবর্ত্তী অর্থবাদটী এই যজ্ঞের স্তুতিতে পর্য্যবসিত। স্তুতি শুনিয়া মানুষের যজ্ঞে প্রবৃত্তি হইবে, এই জন্যই জানিলেই স্বর্গ হইবে এই বাক্যদ্বারা স্তুতিবাদ করিয়াছেন এইরূপ অর্থবাদ বাক্যের **আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে না।** যে তাৎপর্য্য লইয়া ঐ কথাটি উক্ত হইয়াছে তাহাই বুঝিয়া উহার প্রামাণ্যাপ্রামাণ্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। অতএব জৈমিনি মতে বেদত্ব পুরস্কারে প্রমাণতা স্বীকার না করিয়া, কর্ম্ম প্রযোজকত্বরূপে কারণতা স্বীকার করিয়া বিধি-বাক্য সমূহের প্রামাণ্য ও স্তুতিরূপে একবাক্যতা প্রাপ্ত অর্থবাদ বাক্যের পরম্পরা সম্বন্ধে প্রামাণ্য হইবে।

আক্ষরিক অর্থ লইয়া স্বতন্ত্রভাবে বুঝিলে অর্থবাদের প্রমাণতা থাকে না। আমাদিগকে মহর্ষির এই প্রণালী অনুযায়ী অগ্রসর হইতে হইবে। প্রামাণ্যাপ্রামাণ্য বিচারে ধর্ম্মই আলোক স্বরূপ। এই ধর্ম্ম কি? মহর্ষি কৃত ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়াছি। ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন প্রকারে ধর্ম্মের লক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধু ও পর পর ধর্ম্মের তিনটি লক্ষণ করিয়াছেন। এ স্থলে একটি জিজ্ঞাস্য হইতে পারে এই, যে ধর্ম্ম যখন একই চিরন্তন সত্য, তখন তাহার লক্ষণ পরিবর্ত্তন হইবার কারণ কি? এটি আলোচনীয় বিষয় বটে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে অপ্রা-সঙ্গিক। সময়ে স্থানান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল, তবে অল্প কথায় বলিতে হইলে আসল কথাটি এই যে—ধর্ম্ম চিরন্তন সত্য, তাহার মূর্ত্তি চিরকালই একরূপ, তবে প্রকাশের তরতমতা ভেদে বহুরূপ মনে হয় ও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন যুগ ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হয়। যখন যেরূপ যুগ; ধর্ম্মকে মানুষ তখনকার মত করিয়া দর্শন করে। কাজেই তৎতৎ সময়ের যাবতীয় বিষয় তৎতৎরূপ ধর্ম্মের বর্ত্তিকা লইয়া বিচার করিতে হয়।

অতি সহজেই বোঝা যায় যে জৈমিনিকৃত "চোদনা লক্ষণঃ ধর্ম্ম" লইয়া বিচার করিলে শ্রীমদ্ভাগবতখানি অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। কারণ সেখানে কোনরূপ কাম্যকর্ম্মের বিধি নাই। অতএব বৈদিকযুগ ছাড়িয়া পুরাণের যুগে আসিলে ধর্ম্মের লক্ষণান্তর করিতে হইবে। শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুর প্রথম লক্ষণ **"ধর্ম্মই শ্রীকৃষ্ণ"** ইহা শ্রীমদ্ভাগবত-যুগপক্ষে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্র বিচারে 'ধর্ম্মই শ্রীকৃষ্ণ'। তারপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত—শাস্ত্র বিচারে—**"ধর্ম্ম উদ্ধারণ"** আর বর্ত্তমান যুগে—শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুর আগমন কাল হইতে **"মহাধর্ম্ম মহাউদ্ধারণ"**। এই আলোকে যাবতীয় বস্তুতত্ত্বের বিচার করিতে হইবে। যেখানে যে মানুষে, যে কথায়, যে ব্যবহারে জগৎ কল্যাণকর মহাউদ্ধারণ ভাব দেখিব, বর্ত্তমান যুগে আমরা তাহাকেই মহাধর্ম্ম মানিব ও মহা প্রমাণ রূপে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিব। ভক্তগণের মুখের যে কথা বা শ্রীশ্রীবন্ধুর শ্রীমুখের

যে মহাবাণী উক্ত মহাধর্ম্মানুকূল তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এই প্রণালী অবলম্বনে আমরা বর্ত্তমান যুগের যাবতীয় বিষয়ের সত্যতা, গভীরতা ও অলীকতা অনুমান করিয়া লইতে পারিব।

এবার এই মহাধর্ম্মের আলো আমরা জন্ম রহস্যের তত্ত্বানুশীলনে প্রয়োগ করিব।

"আমি অযোনি সম্ভব।

আমার সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ ?"

এই মহা বাক্য দুইটি একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু নিজ শ্রীমুখে অতি উদাত্তস্বরে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চম্পটী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন। এই মহাবাক্য দুটি মহামহাপ্রমাণ। কারণ মহাধর্ম্ম স্বরূপ মহাউদ্ধারণ প্রভু বন্ধুর মহামহাতত্ত্ব এই বাণী দুটির মধ্যে নিহিত আছে। ইহার প্রত্যেকটি বর্ণ সার্থক ও সপ্রয়োজন, একটি অর্দ্ধমাত্রা ও নিরর্থক নহে। ইহাই প্রমাণ বাক্যের স্বরূপ। এই চাবি লইয়া সমস্ত বাণী সমূহের প্রামাণ্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তারপর তদতিরিক্ত বাণী সমূহকে অর্থবাদ স্বীকার করিয়া, প্রমাণ বাক্যের সঙ্গে একবাক্যতা করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। তাৎপর্য্য অর্থ বক্তার ইচ্ছা। অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থ না লইয়া বক্তার মনোগত ভাব বুঝিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ আক্ষরিক অর্থ লইলে সমাধান করিতে না পারিয়া মহাসমস্যায় পড়িতে হইবে। যেমন একদিন শ্রীমুখ দেবী দিগম্বরীকে শ্রীবামাদেবীর হাতের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"ঐ হাত দিয়া জন্মিয়াছি।" এই বাক্যকে অর্থবাদ বলিতেই হইবে।

"আমার সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ !" অর্থাৎ সম্বন্ধ নাই, এই প্রমাণ বাক্যের সঙ্গে একবাক্যতা করিয়া পরম্পরা সম্বন্ধে প্রমাণতা দেখান ছাড়া আর উপায় নাই, প্রভু অযোনি-সম্ভব,এইটি মহাতত্ত্ব কথা। ঐহাতের কথা দ্বারা এই ভাবটীরই পরিপোষণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর সঙ্গে যে মায়িক জীবের কোনও সম্বন্ধ নাই, তিনি যে মায়াধীশ, এই বিশ্বাস হৃদয়ে জাগিলে, তবেই সাধ্য সাধন তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি পায়। এই বাক্যের স্তুতিরূপে অন্য বাক্যগুলি গ্রহণ করিতে হইবে। যে বাক্যের আক্ষরিক অর্থ লইলে ঐ ভাবটি পরিপুষ্ট হয়, সেইটির আক্ষরিক (literal) অর্থ লইব, যাহার ঐ প্রকার অর্থ লইলে হানি হয়, তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিব।

শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্মরহস্য তত্ত্ব আমরা দুই প্রকারে জানিতে পারি। প্রথমতঃ শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীলেখনীও মহাবাণী, দ্বিতীয়তঃ শ্রীলঅতুলচন্দ্র চম্পটী মহাশয়ের বাক্যাবলী। প্রথমতঃ শ্রীশ্রী প্রভুর কথা বলিয়া পরে চম্পটী ঠাকুরের কথা আলোচনা করিব।

১। শ্রীশ্রীপ্রভুর স্বরচিত শ্রীগ্রন্থ রাজির মধ্যে 'চন্দ্রপাত" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ শ্রীত্রিকাল গ্রন্থে "চন্দ্রপাতকে কীর্ত্তন কহে" এইরূপ সূত্র রচনা করিয়া উহা যে একমাত্র কীর্ত্তনীয় তাহা জানাইয়াছেন। অন্য কোন গ্রন্থের প্রশংসা গ্রন্থান্তরে করেন নাই। এই চন্দ্রপাত গ্রন্থের প্রথম দ্বিতীয় কীর্ত্তনকে সংকীর্ত্তন লিখিয়া ও তৃতীয়টীকে মহাকীর্ত্তন লিখিয়া তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও মহাপ্রমাণতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এই মহাকীর্ত্তনের দ্বিতীয় পংক্তিতে আপনাকে "চন্দ্রপুত্র" বলিয়া সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি যে দীননাথ ও বামাদেবীর পুত্র নহেন, তাহারা বাৎসল্য রসাভিষিক্ত হৃদয়ে তাঁহাকে ভজন করিয়াছেন মাত্র, আপনাকে চন্দ্রপুত্র বলিবার ইহা প্রধানতম উদ্দেশ্য, একথা অবিসংবাদিতরূপে বলা যাইতে পারে।

২। শ্রীশ্রীহরিকথা মহাউদ্ধারণ গ্রন্থ একথা নিজ শ্রীমুখে কহিয়াছেন। সেই গ্রন্থে একস্থলে লিখিয়াছেন—

ঐ ঐ প্রলয় হর ভ ভ ভয় কয়।

গো গো হাম্বা রয় যায় হায় বিনয় ॥"

ঐ পংক্তিদ্বয়ে ভাবী প্রলয় দর্শনে ভীত হইয়া গাভীর কাতর ডাক ও বিনীত প্রার্থনার কথা জানাইয়াছেন।

৩। ভক্তপ্রবর কেদার নাথকে শ্রীশ্রীপ্রভু উপানন্দ বলিয়াছেন ও 'কাহা' সম্বোধন করিতেন। বহুদিন নিশিযোগে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পরিভ্রমণ করিয়াছেন। একাধিকবার তাহাকে স্বীয় জন্মকথা কহিয়াছেন, একদিন কহিয়াছেন 'গাভীর অশ্রু আশ্রয় করিয়া গঙ্গাতীরে জন্মিয়াছি' অন্য দিন কহিয়াছেন * * * নামক জনৈক ব্রাহ্মণ গাভী দিয়া জমি চাষ করিয়াছিল। গাভী গঙ্গার জল খাইতে গিয়াছিল। সেই সময় ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ঐ

ব্রাহ্মণের নামটি 'কাহা' বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। অন্য কোনদিন বলিয়াছিলেন "মায়িক জগতের কাহারও সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। আমি গঙ্গায় জন্মিয়াছি।" ভক্ত কেদার সরল ও নিষ্কিঞ্চন, তথাকথিত শিক্ষিত নহেন, কাজেই শ্রীমুখের কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে মনে রাখিতে পারেন নাই, তবে ভাবগুলি বেশ ঠিক আছে।

৪। ভক্তকুলমণি শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে শ্রীশ্রীপ্রভু আদর করিয়া 'নবদ্বীপদাস' নাম রাখিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট স্বীয় আত্মতত্ত্ব বহুস্থলে বহুভাবে বলিয়াছেন। জন্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছেন—

"এক ব্রাহ্মণ গোমাতাদ্বারা গঙ্গাতীর সংলগ্ন ভূমি কর্ষণ করিতেছিল। উষার প্রাক্কালে কর্ষণান্তে গোমাতাকে ছাড়িয়া দিলে তিনি তৃষ্ণাতুরা হইয়া জলপানার্থ গঙ্গাঘাটে উপনীত হয়েন। ঐ সময় ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আমি আসিয়াছি।

৫। ভক্তপ্রবর ডাঃ সুধন্বকুমার সরকার মহাশয় শ্রীশ্রীপ্রভুর একনিষ্ঠ সেবক। তিনি বলেন, কোনও এক সময়ে প্রভু বন্ধু নিজ শ্রীমুখে কোনও একটি বিশিষ্ট ভক্তকে কহিয়াছিলেন, "সাড়ে তিন মণ চাঁদের সুধা লইয়া অশোক বৃক্ষের কুড়ির অগ্রভাগে জন্মিয়াছি"

৬। ভক্তবর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মিত্র মহাশয় শ্রীধাম বাকচরবাসী। তাহাকে শ্রীশ্রীপ্রভু জ্যেঠা সম্বোধন করিতেন কোনও একদিন তাহাকে বলিয়াছিলেন—"দ্যাখ তোদের মত মূতামূতিতে আমার জন্ম নয়। দীনুর স্ত্রীর কখনও গর্ভ হয় নাই জানিস্।"

৭। শ্রীবামাদেবীর হস্তের কথা উল্লেখ করিয়া একদিন শ্রীযুক্তেশ্বরী দিগম্বরী দেবীকে বলিয়াছিলেন "ঐ হাত দিয়া জন্মিয়াছি।"

৮। শ্রীযুক্ত চম্পটী ঠাকুর একদিন তদীয় সহধর্ম্মিণী ভক্তিমতী ক্ষীরোদা দেবীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে তিনি প্রভুর ভাগ্নী হয়েন, এই কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন "তুই এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা বলিস্। আমি অযোনি সম্ভব। আমার সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ" ?

৯। শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চম্পটি ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম লইয়া পর পর চারি পাচ দিবস অনেক তত্ত্বালোচনা হইয়াছিল ঐ সময় শ্রীশ্রীপ্রভু চম্পটি মহাশয়ের দ্বারা মহর্ষি প্রবরকে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেবের অযোনিসম্ভবত্ব স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছিলেন—"সামান্য মানুষে ঈশ্বর বুদ্ধি কেমন করিয়া হয়" মহর্ষি এই প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রীপ্রভু নিম্নোক্তরূপে উত্তর দেওয়াইয়াছিলেন—

"মানুষের মধ্যে মানুষ হইয়া আসিলেও মায়ার অতীত বস্তু। সুতরাং অপ্রাকৃত। প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাই পণ্ডিত।' অযোনিসম্ভব। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতার অঙ্গজ্যোতিঃ হ'তে মহাপ্রভুর আবির্ভাব। যেমন অগ্নি হ'তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, চন্দ্র হ'তে জ্যোৎস্না : + + + + + আমি বেমালুম এই কথাতেই আমি মালুম।" কোন কোন ভক্ত বলেন যে এই শেষোক্ত কথাটি দ্বারা শ্রীশ্রীপ্রভু নিজের অযোনিসম্ভবত্বেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

উপর্য্যুক্ত বাক্যাবলীর মধ্য হইতে সাধারণ (common) অংশ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তবে বাদবাকী অংশের প্রমাণত্ব অস্বীকার করিবার মত ধৃষ্টতা আমার নাই, আবার আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিয়া সমাধান করিবার মত সামর্থও নাই, কাজেই তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া স্তুতিরূপে প্রমাণত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছি। ইহাতে কোনরূপ ভ্রম বা অপরাধ হইয়া থাকিলে, বিজ্ঞ বান্ধবগণ কেহ নিজগুণে সমাধান করিয়া দিলে কৃতকৃতার্থ হইব। "ঐ হাতে জন্মিয়াছি" ইহার আক্ষরিক (literal) অর্থ লইলে কিছু বুঝিতে পারি না। জগতে প্রকাশিত হইয়া প্রথমে বৎসল্যময়ীর হাতেই লালিত পালিত হইয়া, স্নেহে সোহাগে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি—এইরূপ অর্থ করিয়া, তিনি যে গর্ভজাত নহেন, ইহা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য, এই বুঝিয়া সুখী হইতে পারি। তারপর 'সাড়ে তিন মণ চাঁদের সুধা' এই বাক্য হইতে চাঁদের সুধা কথাটি সানন্দে গ্রহণ করিয়াছি, সাড়ে তিন মণ অর্থ বুঝি নাই। তিন মণ দ্বারা ত্রিভুবন প্লাবিত করিয়াও অর্দ্ধ মণ যে কেন অবশেষ থাকে, তাহা ধারণা করিতে পারি না। 'প্রণব' ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত হইলেও

অর্দ্ধমাত্রা কি হেতু অবশেষ থাকে তাহা অনুমান করিবার সামর্থ্য নাই।

শ্রীঋগ্বেদের ঋষিগণ বিরাট পুরুষের বর্ণনাস্থলে লিখিয়াছেন "অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্" সমগ্র বিশ্বব্যাপিয়াও দশাঙ্গুল কেন অবশেষ রহিল, কোন ভাষ্যকারই সন্তোষ জনক উত্তর করেন নাই। কাজেই বাকী অর্দ্ধমণের তাৎপর্য্য বুঝিনা, তবে তিনি যে একই কালে Transcendent ও emanant ইহা প্রকাশ করাও অভিপ্রায় হইতে পারে এরূপ সময়ে মনে করি।

অশোক বৃক্ষের কুড়ির অগ্রভাগ অর্থে শোকতাপময় মায়োপহিত এই জড় জগৎ হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে বা বাহিরে, শোকতাপ ও মায়া সম্বন্ধ রহিত একটি অতি সূক্ষ্ম ভাবের মধ্যে তিনি জাত, এইরূপ অনুমান করিয়া তত্ত্ব প্রকাশের এই এক প্রকার ইঙ্গিত বলিয়া বুঝিতে পারি। তবে অপ্রাকৃত ধাম শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীব্রহ্মাকুণ্ড তীরস্থিত যে আশোক বৃক্ষের সংবাদ আমরা বরাহ পুরাণে পাই, তাহা বৈশাখা শুক্লা দ্বাদশীর দিন পুষ্পিত হয়, তথাহি—

তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ত্বং বসুন্ধরে।
তস্য তত্রোত্তরে পার্শ্বেঽশোকবৃক্ষঃ সিতপ্রভঃ।
বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী।
সপুষ্পতি চ মধ্যাহ্নে মম ভক্তসুখাবহ।
ন কশ্চিদপি জানাতি বিনা ভাগবতং শুচং॥

(হে বসুন্ধরে, তোমাকে এক আশ্চর্য্য অশোক বৃক্ষের কথা বলিব, শুন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীব্রহ্মকুণ্ডের উত্তর পার্শ্বে প্রভাময় এই বৃক্ষ আছে। বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশীর দিন মধ্যাহ্নে এই বৃক্ষ পুষ্পযুক্ত হয়। সেই ফুল আমার ভক্তের সুখ দায়ক! আমার আপনজন ছাড়া কেহই এই বৃক্ষের খবর জানেনা।)

আজ তিন দিবস পূর্ব্বে অর্থাৎ বৈশাখী সীতা নবমীর দিন উষা কালে সেই অশোক ফুলের কুড়ি থাকাই সম্ভব। সেই কুড়ির অগ্রভাগের সঙ্গে শ্রীশ্রীপ্রভুর আবির্ভাবের স্থান বা কালের সঙ্গে কোনও প্রকার সম্বন্ধ সম্ভবপর কিনা সুধী ভক্তগণ চিন্তা করিবেন। তবে চিন্তা করিয়া কোন কুল পাইবেন না তাহাও বলিয়া রাখি, কারণ স্বয়ং শ্রীজীব লিখিয়াছেন, এই অশোক-তত্ত্ব এই জীবজগৎ জানেনা। জানিলে আর "তৎ শৃণু ত্বং বসুন্ধরে"হে বসুন্ধরে তুমি শোন—এস্থলে বসুন্ধরা কে সম্বোধন করা হইবে কেন? যে জানে তাহাকে জানাইবার আর প্রয়োজন কি? ("অনেন পৃথিব্যাপি তস্য তাদৃশ রূপং ন জ্ঞায়তে" ইতি শ্রীজীব।) অতএব ইহা দ্বারা বোঝাগেল, যে পৃথিবীতে কেহ এই অশোকের তত্ত্ব জানে না! শ্রীজীব যখন এইকথা বলিয়াছেন, তখন তোমার আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের আর কতটুকু সাধনবল আছে? যাহারা শুদ্ধ ভাগবত বা ভগবানের আপনজন তাহারাই মাত্র জানিতে সমর্থ।

তার পর চম্পটী ঠাকুরের বাক্যভঙ্গি। ক্রমে তৎ-সম্বন্ধে যথা সাধ্য আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। জয় জগদ্বন্ধু।

[ক্রমশঃ

মহাউদ্ধারণ-ব্রত।

"ক্ষণস্থায়ী মানব জীবন! এই আছে, এই নাই। হায়! মানুষ হরিনাম করে না। সংসারীলোকেরই হরিনামে বেশী অধিকার। তোরা সবাই হরিনাম কর। সময় থাকতে থাকতে হরিনাম কর। দেহ রক্ষা কর। মঙ্গল হবে। অহিংসায় সিংহ-বিক্রমে চল, হরিনামের বল বাঁধ। সংসার ইন্দ্রজাল হরিনামে কেটে যাবে। মায়া মনসিজ দূর হবে। তোমরা হরিনাম করলেই আমার মহাউদ্ধারণ-ব্রত শেষ হয়॥"

পরমভক্ত কেদার নাথকে শ্রীশ্রীপ্রভু-বন্ধু 'উপানন্দ' কহিয়াছেন ও আদর করিয়া 'কাহা' (কাকা) সম্বোধনে ডাকিতেন। কোনও সময়ে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন :—

"কাহা!

আঙ্গিনা—ধর্ম্ম, আঙ্গিনা—পবিত্র,
আঙ্গিনা—শুচি, আঙ্গিনা—নিষ্ঠা,
জানিবা, ত্রিকালে চৌকালে॥"

নিয়মাবলী।

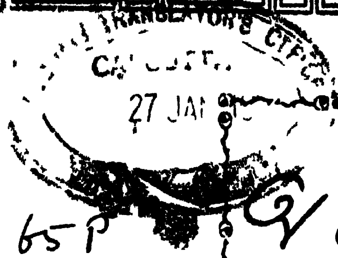
১। 'আঙ্গিনা' 'মহাধর্ম্ম মহাউদ্ধারণ' গ্রন্থ। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীনিতাইগৌর ও শ্রীশ্রীহরিপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের মাধুর্য্যময় লীলানুস্মরণই এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য।

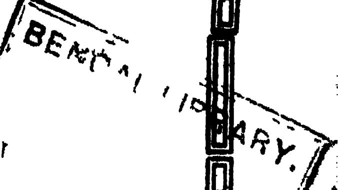
২। বৎসরে চারি সংখ্যায় বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে। বৈশাখী সীতানবমী হইতে বর্ষ আরম্ভ। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৵০ মাত্র। প্রতিসংখ্যা নগদ ।০ চারি আনা মাত্র। প্রবন্ধাদি 'কার্য্যালয়ে' প্রকাশকের নিকট প্রেরিতব্য।

আঙ্গিনা কার্য্যালয় :— "মহাউদ্ধারণ" মঠ ৫০নং মানিকতলা মেন রোড কলিকাতা

বিনয়াবনত—
গোপীবন্ধু দাস।
প্রকাশক।

অজিত প্রেস—১১৬ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।





[illegible]

(মহাধর্ম্ম মহাউদ্ধারণ গ্রন্থ)



বান্ধব-দাসানুদাস
মহানামব্রত
সম্পাদিত।

শ্রীশ্রীমহানাম সম্প্রদায় সেবক
গোপীবন্ধুদাস
কর্ত্তৃক—

ফরিদপুর
শ্রীশ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন হইতে প্রকাশিত।
কার্ত্তিক, ১৩৩৭

শ্রীগ্রন্থ শ্রীহরিকথায় ভাবী লীলার আভাস।

সুরধুনী-তটে-স্থিতি, সদা-সংকীর্ত্তন-প্রীতি,

ত্রয়োদশ-দশা-আস্বাদনে ॥

(প্রভু এই করে গো) (জাহ্নবীর তীরে তীরে)

শ্রীবিলাস বাসর।

হে ভ্রান্ত ! শোন এ নহে সমাধি,
ত্যজি জ্ঞানের বিকৃতি, ভাব 'বিলাস-বাসর'।
ধর ধর ধর [illegible],
শ্রীঅঙ্গন গগনে নব গৌর-সুধাকর ॥
ছিঃ বল্‌তে নাই জ্ঞানী, ও ধ্যেয় যে সবার,
শুক-বন্ধু বঙ্গ-বন্ধু প্রাণেশ্বরেশ্বর।
হরিপুরুষ সুন্দর প্রেম-মূর্তিমন্ত অবতার
মহাউদ্ধারণে ত্রয়োদশ-দশা অঙ্গীকার ॥

এ যে মহালীলা গুহ্যতম সংগোপন খেলা,
যোগমায়ার আবরণে জড় চৈতন্যের মেলা।
মহাভাব স্বর্ণতরী, তাহে মহানাম কাণ্ডারী,
যত বান্ধবেরগণ টানে কনক দাঁড় ॥
এস নরনারী, জয় জগদ্বন্ধু স্মরি ;
সুখে যাই পারে, মতিচ্ছন্ন বাজায় ভেরী।
কৃপা কৌতুকী ধীর-সমীর সাথী ধরি,
মহাকীর্ত্তন-রস তুফান চমৎকার ॥

মহানাম-ভিক্ষু—মহীন।

—o—

শ্রীশ্রীপ্রভু ও শ্রীনবদ্বীপ দাস।

নবদ্বীপ। প্রভু ! আপনি শ্রীহরিকথায় ত্রয়োদশ দশার কথা লিখিয়াছেন। এ তো কখনও শুনি নাই।

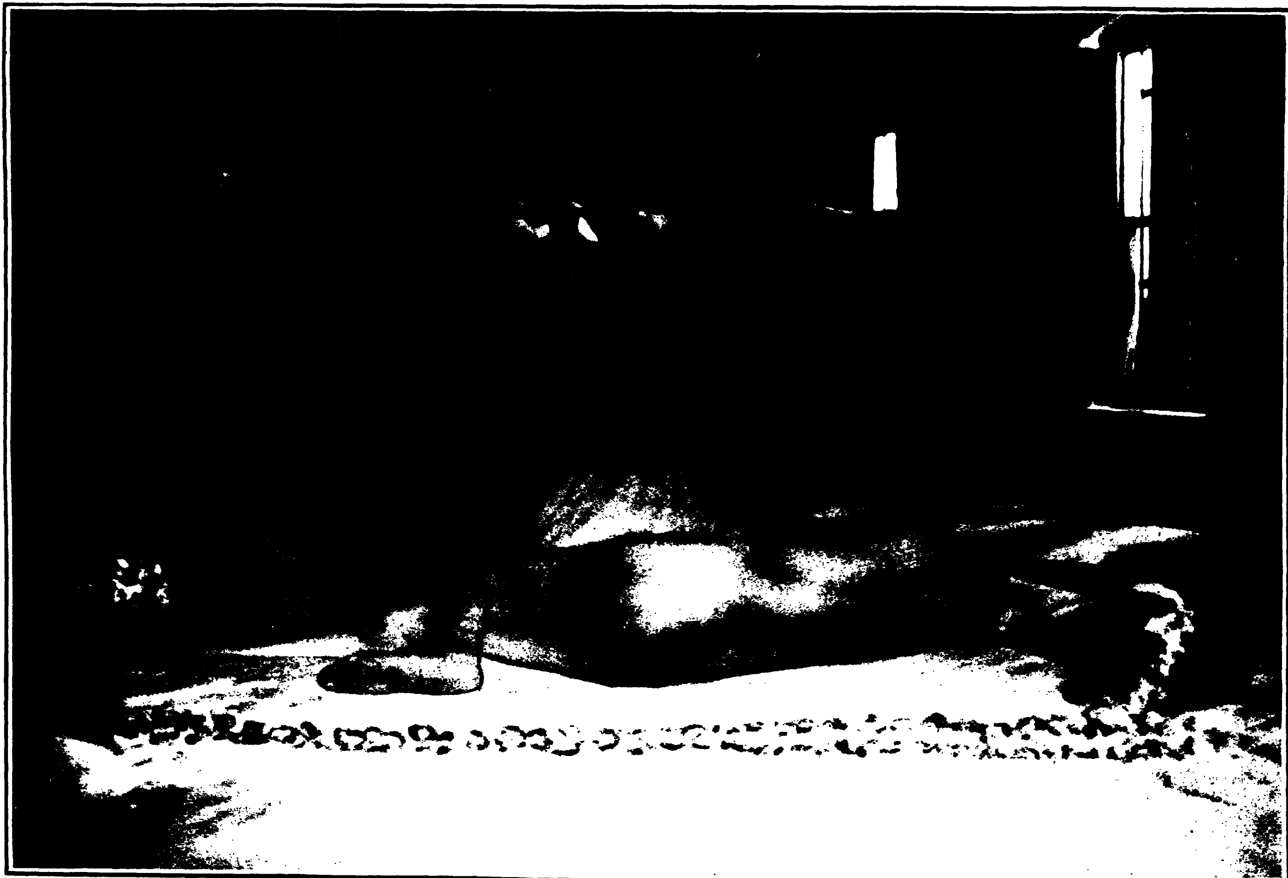
প্রভু। তোদের শ্রীমতীর দশম-দশা হয়েছিল। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দ্বাদশ-দশা হয়েছিল।

নবদ্বীপ। আর ত্রয়োদশ-দশা ?

প্রভু। এবার দেখ্‌তে পাবি। এবার ঐশ্বর্য্য-গন্ধহীন শুদ্ধ-মাধুর্য্য, আলকচন্দ্র ও পূর্ণ তন্ময়ত্ব এই তিনটী লক্ষণ বেশী দেখ্‌তে পাবি।

———

মহাগম্ভীরায়



মহা-মহা-প্রভু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দর।

"মহাভাব সুধা মাধুর্য্য সিন্ধু কল্লোল নাহি তাতে।
রাধাপদ্ম মাঝে কালিয়া ভ্রমর মুরলী গুঞ্জনে মাতে॥

নিঝুমে সেথায় বন্ধু ঘুম যায় মহানামতরী'পরে
স্বেচ্ছায় সুপ্তি স্বেচ্ছায় জাগরণ কেহ না জাগা'তে পারে॥"



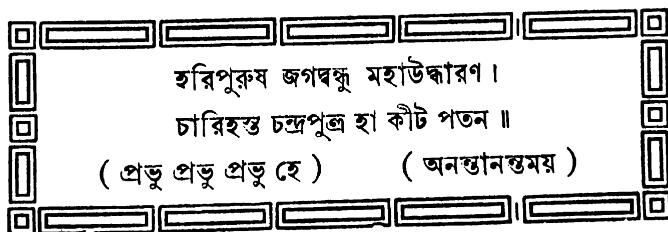
আঙ্গিনা



প্রথম বর্ষ
তৃতীয় সংখ্যা
কার্ত্তিক

"শ্রীশ্রীমহানাম যজ্ঞ"
২রা কার্ত্তিক। দশম বর্ষ আরম্ভ,

'ত্রয়োদশ-দশা-স্মৃতি'
শ্রীহরিপুরুষাব্দ—৬০
১৩৩৭



হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।
চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীট পতন ॥
(প্রভু প্রভু প্রভু হে) (অনন্তানন্তময়)

বন্ধুলীলা-সুধানিধিঃ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গৌরাঙ্গদেবেন কৃতাধিরোপণং
ভক্তৈস্তদীয়ৈশ্চ সুপুষ্পিতং মুহুঃ।
ভক্তিদ্রুমং প্রেমফলাভিশোভিতং
কুর্ব্বন্নয়ং ক্ষৌণীমলঙ্করোত্যলম্ ॥ ৬ ॥

'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া'
শ্রুত্যোদিতা জ্ঞানস্থতির্হি নিগুণা।
গুণাশ্রয়াং ভক্তিমৃতে সুদুর্লভে-
ত্যালোচ্য ভক্তিং ভুবি বিস্তৃণোতি ॥ ৭ ॥

অশেষ কল্যাণ গুণাভিধানৈ-
বিভূষিতং তত্ত্বমতি প্রশস্তম্।
স ভক্তি নামানিশ কীর্ত্তনেন
প্রকাশতে দ্রাগ্ বিষয় প্রমোষাৎ ॥ ৮ ॥

ইত্যাকলয্য প্রভুরপ্রমেয়ঃ
শ্বঃশ্রেয়সাপ্তৌ সুমভ্যুপায়ম্।
স্বীয়ং মহানাম সমাদিদেশ,
যদীরণাদ্ধীঃ শুচিতামুপৈতি ॥ ৯ ॥

বাল্যেঽস্য সার্ব্বজ্ঞমুখা হি দিব্যা
গুণা বিভান্তি স্ম নিসর্গসিদ্ধাঃ।
শান্তিস্তথৈকান্তরতির্গভীরা
পরার্থ চিন্তা প্রকটী বভূবুঃ ॥ ১০ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামস্বামী।

তত্ত্বানুশীলন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রে প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগ-ই অনুষ্ঠেয়-রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। পতঞ্জলি ইহার লক্ষণ বলিয়াছেন—

"তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর প্রাণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ"

(যোগসূত্র ২।১)

অর্থাৎ তপঃ (কায়ক্লেশসাধন চান্দ্রায়ণাদি) স্বাধ্যায় (প্রণবাদি মন্ত্রের জপ, বা মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন), ঈশ্বর প্রণিধান (সকল কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া পরমগুরু ভগবান্ ঈশ্বরে সমর্পণ)—এই তিনটিকে 'ক্রিয়াযোগ' কহে। ফলতঃ কাম্যকর্ম্মের পরিত্যাগ এবং ফলাভিসন্ধিত্যাগপূর্ব্বক নিত্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান সত্ত্বশোধনার্থ অবশ্য আদর্ত্তব্য। সত্ত্বগুণের পরিপোষণের জন্য গীতাপ্রোক্ত সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক যজ্ঞ, সাত্ত্বিক দান প্রভৃতির আচরণ সর্ব্বপ্রযত্নে বিধেয়। শারীরিক বাচিক ও মানসিক ভেদে যে ত্রিবিধ তপ গীতায় উক্ত হইয়াছে, তাহা-ও সর্ব্বতোভাবে অভ্যসনীয়। সর্ব্বত্র সাত্ত্বিক ব্যবহারে সাধক ক্রমশঃ রজস্তমোভাব অপাকৃত করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বোদ্রেকনিবন্ধন দগ্ধকল্মষ হইয়া কালে অবশ্য-ই পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পরন্তু দুর্ব্বলাধিকারীর পক্ষে প্রথমে চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদনার্থ কোন স্বাভীষ্ট ভাগবতী মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া উপাসনা কর্ত্তব্য। যাবৎ সত্ত্বোদ্রেকে চিত্ত শুদ্ধ না হয়, যাবৎ চিত্তের সম্যক্ সমাধানশক্তি উৎপন্ন না হয়, যাবৎ ভগবানের কথাদিতে দৃঢ়া ভক্তি ও রতি না জন্মে, যাবৎ সর্ব্বপ্রাণিতে অবস্থিত ঈশ্বরের আন্তর উপলব্ধি না হয়, তাবৎ প্রতিমাদিতে উপাসনা করিতে হইবে।*

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত, ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

ভাগবত ১১।২০।৯

অর্থাৎ যাবৎ নির্ব্বেদ অর্থাৎ বিষয় বৈরাগ্য উদ্ভূত না হয়, আর যাবৎ আমার কথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, তাবৎ নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত।

অপি চ—

"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥"

ভাগবত ৩।২৯।২৫

অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী পুরুষ সে পর্য্যন্ত অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমাদি পূজাধারে আমার অর্চ্চনা করিবে, যে পর্য্যন্ত না ঈশ্বর আমাকে সর্ব্বভূতস্থিত বলিয়া নিজের হৃদয়ে জানিতে পারে।

কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে রজস্তমোভাব নিবৃত্ত হইলে, যখন বহুজন্মার্জ্জিত সৌভাগ্যবশে ভগবানে ঐকান্তিকী রতি উৎপন্ন হয়, তখন তাদৃশ আত্মরতি আত্মতৃপ্ত যোগির কর্ম্মে কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। ইহা-ই গীতায় কথিত হইয়াছে—

"যস্ত্বাত্ম রতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থ ব্যাপাশ্রয়ঃ।"

গীতা ৩।১৭।১৮

---

*"উপাসনং নাম যথাশাস্ত্রসমর্থিতং কিঞ্চিদালম্বনমুপাদায় তস্মিন্ সমানচিত্তবৃত্তিসন্তানকরণং তদ্‌বিলক্ষণ প্রত্যয়ানন্তরিতম্"—ছান্দোগ্যোপনিষদভাষ্যাবতরণিকা। অর্থাৎ যথারীতি শাস্ত্রপ্রতিপাদিত কোন আলম্বন অর্থাৎ আধার গ্রহণ করিয়া, তাহাতে সেই আলম্বন বিষয়িণী একরূপা চিত্তবৃত্তির যে প্রবাহ,—যাহা তদ্ভিন্ন অন্যবিষয়ের বৃত্তি-দ্বারা প্রতিরুদ্ধ না হয়,—তাহাকে 'উপাসনা' কহে।

অর্থাৎ যে মানব আত্মাতে-ই রমণকারী, আত্মাতে-ই তৃপ্ত আত্মাতে-ই সন্তুষ্ট, তাহার কর্ত্তব্য কিছু-ই নাই।

ইহলোকে তাহার কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন প্রয়োজন নাই; কর্ম্ম না করিলে-ও কোন প্রত্যবায় নাই। আর সকল প্রাণিতে তাহার কোন প্রয়োজন সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ কোন প্রাণিবিশেষকে আশ্রয় করিয়া তদ্দ্বারা সাধনীয় কোন বিষয় নাই।

আত্মস্বরূপ ভগবানে নিতান্ত পরিনিষ্ঠিতচিত্ত এতাদৃশ কৃতকৃত্য পুরুষপুঙ্গব কর্ম্মের আচরণ করিলেও, তাহা কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্ত; নিজের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য নহে; কেননা তাহার অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম কিছুই নাই, এবং সে সুখ দুঃখাদি-দ্বন্দ্ব হইতে নির্ম্মুক্ত।

কিন্তু এই ত্রিধাতুক শুক্রশোণিত পরিণামপিণ্ড শরীরে যাবৎ কর্ত্তৃত্বাদি-অভিমান থাকে, তাবৎ সংসারাসক্ত অতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ 'আমি ব্রহ্মজ্ঞ; আমার কর্ম্মে প্রয়োজন নাই' এইরূপ বৃথাগর্ব্বে স্ফীত হইয়া মূঢ়তা-প্রযুক্ত যদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তবে সে কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয় হইতেই ভ্রষ্ট হইয়া দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। যথা বশিষ্ঠ—

"সংসার বিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মীতিবাদিনম্।
কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥"

অর্থাৎ যে লোক সাংসারিক বিষয়ে অনুরক্ত, অথচ 'আমি ব্রহ্মজ্ঞ' এইরূপ মুখে বলে, সে কর্ম্ম ও ব্রহ্ম এতদুভয় হইতে 'বিভ্রষ্ট; তাদৃশ লোককে চণ্ডালের ন্যায় দূরে পরিহার করিবে।

১। যম, ২। নিয়ম, ৩। আসন, ৪। প্রাণায়াম, ৫। প্রত্যাহার, ৬। ধারণা, ৭। ধ্যান, ৮। সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ যোগও এই ক্রিয়াযোগের-ই অন্তর্গত। ইতরাঙ্গ-সহকৃত সগুণ-ধ্যান-যোগ যেরূপে নিরুপাধিক স্বরূপজ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়, তাহা ভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতির নিকট সম্যক্-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। পাঠকের অবরোধ-সৌকর্য্যার্থ তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

"যোগস্য লক্ষণং বক্ষ্যে সবীজস্য নৃপাত্মজে।
মনোযেনৈব বিধিনা প্রসন্নং যাতি সৎপথম্॥ ১
স্বধর্ম্মাচরণং শক্ত্যা বিধর্ম্মাচ্চ নিবর্ত্তনম্।
দৈবাল্লব্ধেন সন্তোষ আত্মবিচ্চরণার্চ্চনম্। ২
গ্রাম্যধর্ম্ম নিবৃত্তিশ্চ মোক্ষধর্ম্মরতিস্তথা।
মিতমেধ্যাদনং শশ্বদ্বিবিক্তক্ষেমসেবনম্॥ ৩
অহিংসা সত্যম্ অস্তেয়ং যাবদর্থপরিগ্রহঃ।
ব্রহ্মচর্য্য তপঃ শৌচং স্বাধ্যায় পুরুষার্চ্চনম্॥ ৪
মৌনং সদাসনজয়ঃ স্থৈর্য্যং প্রাণজয়ঃ শনৈঃ।
প্রত্যাহারশ্চেন্দ্রিয়াণাংবিষয়ান্মনসাহৃদি॥৫
স্বধিষ্ণ্যানামেকদেশে মনসা প্রাণধারণম্।
বৈকুণ্ঠলীলাভিধ্যানং সমাধানং তথাত্মনঃ॥৬

অর্থাৎ হে রাজনন্দিনি! [যোগ দ্বিবিধ—সবীজ অর্থাৎ সালম্বন ও নির্বীজ অর্থাৎ নিরালম্বন তন্মধ্যে] সবীজ যোগের লক্ষণ বলিব,—যাহার অনুষ্ঠানে মন বিশুদ্ধ কামাদিকালুষ্যবর্জ্জিত হইয়া ভগবন্মার্গে স্থিরীভূত হয়। [যোগাঙ্গের মধ্যে প্রথমতঃ যমাদির উল্লেখ করিতেছেন]—যথাশক্তি নিষ্কাম স্বধর্ম্মাচরণ ১, বিরুদ্ধধর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তন ২ প্রারব্ধানুসারে প্রাপ্ত বস্তুতে সন্তোষ ৩, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি-দিগের চরণসেবা ৪, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-বিষয়ক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি ৫, মোক্ষধর্ম্মে আসক্তি ৬, পরিমিত ও পবিত্র দ্রব্য ভক্ষণ ৭, নিরন্তর একান্ত অথচ নিরুপদ্রব স্থানে বাস ৮, অহিংসা প্রাণিমাত্রে দ্রোহ-ত্যাগ ৯, সত্য-কথন ১০, অস্তেয় (অন্যায়পূর্ব্বক পরধন গ্রহণ না করা) ১১, দেহনির্বাহো-পযোগিমাত্র বস্তুর গ্রহণ ১২, ব্রহ্মচর্য্য ১৩, তপস্যা ১৪, বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ ১৫' বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়ন ১৬, পরমপুরুষ হরির অর্চ্চন ১৭, মৌনবলম্বন ১৮, [এই পর্য্যন্ত যম ও নিয়ম কথিত হইল; তন্মধ্যে অহিংসা, সত্য অস্তেয়, অপরিগ্রহ, ব্রহ্মচর্য্য ও মৌন—এই ছয়টি 'যম' অবশিষ্ট গুলি 'নিয়ম'।] আসন জয় করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান ১৯, ক্রমে ক্রমে প্রাণ বায়ুর বশীকরণ ২০, ইন্দ্রিয়-সমূহকে মনদ্বারা বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া হৃদয়ে আনয়ন ২১, প্রাণের স্থান মূলাধারাদির মধ্যে কোন এক দেশে মনের সহিত প্রাণের ধারণ ২২ ভগবানের লীলা-চিন্তন ২৩, এবং মনের সমাধান অর্থাৎ আত্মাকারতা—

এতৈরন্যৈশ্চ পথিভির্মনো দুষ্টমসৎপথম্।
বুদ্ধ্যা যুঞ্জীত শনৈর্জিতপ্রাণো হ্যতন্দ্রিতঃ ॥৭
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য বিজিতাসন আসনম।
তস্মিন্ স্বস্তি সমাসীন ঋজুকায়ঃ সমভ্যসেৎ ॥৮
প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ।
প্রতিকূলেন বা, চিত্তং যথা স্থিরমচঞ্চলম্ ॥৯
মনোঽচিরাৎ স্যাদ্বিরজং জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
বায়্বগ্নিভ্যাং যথা লোহং ধ্মাতং ত্যজতি বৈ মলম্॥

এই স্বধর্ম্মাচরণ প্রভৃতি এবং এতদ্ব্যতীত অন্য ব্রত-দানাদি উপায়ে অসৎপথে বর্ত্তমান দুর্দ্দমনীয় মনকে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি-দ্বারা যোগসাধনে নিয়োজিত করিবে, এবং আলস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাণবায়ুকেও জয় করিবে। পরে জিতাসন হইয়া পবিত্র স্থানে যথাক্রমে উপর্য্যুপরি কুশ, অজিন এবং বস্ত্র বিছাইয়া আসন করিবে, এবং তদুপরি স্বস্তিকাসনে ঋজুশরীরে উপবেশন করিয়া প্রাণ সংযমের অভ্যাস করিবে। পূরক অর্থাৎ বাহ্যবায়ুর অন্তঃপ্রবেশন, কুম্ভক অর্থাৎ অন্তে প্রবেশিত বায়ুর ধারণ, রেচক অর্থাৎ অন্তর্নিরুদ্ধ বায়ুর বহির্নিঃসারণ—এই তিনটি প্রক্রিয়া-দ্বারা অনুলোম এবং বিলোম-ক্রমে অর্থাৎ একবার পূরক কুম্ভক-রেচক এই ক্রমে, পুনঃ রেচক, কুম্ভক, পূরক এই বিপরীত ক্রমে প্রাণের মার্গ নাড্যাদি এরূপে শোধন করিবে, যাহাতে চিত্ত স্থির হইয়া আর চঞ্চল না হয় অর্থাৎ প্রাণ বশীকৃত হইলে তদ্বশবর্ত্তি মন-ও বশীভূত হইবে। সুবর্ণাদি ধাতু—বায়ু ও অগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত হইলে যেরূপ অচিরে মলিনত্ব ত্যাগ করে, সেই রূপ যে যোগির শ্বাস জিত হইয়াছে তাহার মন আশু নির্ম্মল হইবে।

প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্, ধারনাভিশ্চ কিল্বিষান্।
প্রত্যাহারেন সংসর্গান্, ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্॥ ১১

প্রাণায়াম করিলে বাতপিত্তাদি দোষ দগ্ধ হয়; ধারণা-দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়; প্রত্যাহার-দ্বারা শব্দাদি-বিষয় সম্বন্ধ নিবৃত্ত হয়, এবং ধ্যান দ্বারা অনীশ্বর গুণ (যে গুণ ঈশ্বরের অনুপযুক্ত বা বিরোধী—যাহা ঈশ্বরে থাকে না) রাগদ্বেষ মোহাদি উপশান্ত হইয়া থাকে। [বায়ুর সহিত মনের স্থিরীকরণকে 'ধারণা' কহে। স্থিরীকৃত চিত্তের যে বৃত্তিপ্রবাহ, তাহা 'ধ্যান'। আর বৃত্তি নিরোধ 'সমাধি' শব্দে উক্ত হয়।]

যদা মনঃ স্বং বিরজং যোগেন সুসমাহিতম্।
কাষ্ঠাং ভগবতো ধ্যায়েৎ স্বনাসাগ্রাবলোকনঃ ॥১২

এই রূপে নিজের মন যখন নির্ম্মল ও যোগ দ্বারা উত্তম-রূপে সমাহিত হইবে, তখন নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ভগবানের মূর্ত্তি ধ্যান করিবে। [ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ চিত্ত বিক্ষিপ্ত, এবং নেত্রনিমীলনে নিদ্রাবশে লীন হয়, এজন্য লয় ও বিক্ষেপ নামক প্রতিবন্ধ দূর করিবার অভিপ্রায়ে নাসাগ্রবলোকনের ব্যবস্থা, অর্থাৎ বাহ্য বিষয় গ্রহণ না করিয়া যেন নাসিকাগ্র দেখিতেছে এরূপভাবে অর্দ্ধনিমীলিতাবস্থায় চক্ষুকে রাখিবে।]

ধ্যেয় ভগবন্মূর্ত্তির স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন—

প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥১৩
লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্কপীত কৌশেয়বাসসম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তভামুক্তকন্ধরম্ ॥ ১৪
মত্তদ্বিরেফকলয়া পরীতং বনমালয়া।
পরার্দ্ধ্যহারবলয়কিরীটাঙ্গদনূপুরম্ ॥ ১৫
কাঞ্চীগুণোল্লসচ্ছ্রোণিং হৃদয়াম্ভোজবিষ্টরম্।
দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবৰ্দ্ধনম্ ॥ ১৬
অপীচ্য দর্শনং শশ্বৎ সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্।
সন্তং বয়সি কৈশোরে ভৃত্যানুগ্রহকারকম্ ॥ ১৭
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসং পুণ্যশ্লোকযশস্করম্।
ধ্যায়েদ্দেবং সমগ্রাঙ্গং, যাবন্ন চ্যবতে মনঃ ॥ ১৮
স্থিতং ব্রজন্তমাসীনং শয়ানং বা গুহাশয়ম্।
প্রেক্ষণীয়েহিতং ধ্যায়েচ্ছুদ্ধভাবেন চেতসা ॥ ১৯

ভাগবত—৩।২৮

ভগবানের মুখসরোজ সুপ্রসন্ন, অক্ষিদ্বয় পদ্মগর্ভের ন্যায় অরুণ বর্ণ—নীলোৎপলদলতুল্য শ্যামল; তাঁহার চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভমান; তাঁহার কৌশেয়বসন কমনীয়কান্তি পঙ্কজ কেশর সদৃশ পীতবর্ণ, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন বিরাজমান এবং গ্রীবায় দীপ্যমান

কৌস্তুভমণি সম্বদ্ধি স্বর্ণসূত্র-সংশ্লিষ্ট; তাঁহার গলদেশে বনমালা ব্যাপ্ত,—মত্ত মধুকর তাহাতে মধুর ধ্বনি করিতেছে; এতদ্ব্যতীত তিনি মহামূল্যহার, বলয়, মুকুট, অঙ্গদ, নূপুর প্রভৃতি আভরণে বিভূষিত; তাঁহার কটিদেশে মেখলা সূত্র দেদীপ্যমান; তিনি ভক্তগণের হৃদয়পদ্মাসনোপরি সমাসীন; তাঁহার সেই নিরতিশয় দর্শনীয় শান্তমূর্ত্তি নয়নমনোরঞ্জন; অহো! তাঁহার দর্শন অতীব রমণীয়; তিনি সর্ব্বলোকের নমস্কৃত, কিশোরবয়স্ক এবং ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহকরণে ব্যগ্র; তাঁহার যশ কীর্ত্তনযোগ্য এবং পুণ্যতীর্থস্বরূপ; তাঁহা হইতে পুণ্যশ্লোক বলি ভীষ্ম প্রভৃতির যশ বিস্তীর্ণ হইতেছে;—যাবৎ মন বিষয়ান্তরে গমন না করে, তাবৎ সমগ্র অঙ্গবিশিষ্ট এবম্ভূত ভগবন্মূর্ত্তির ধ্যান করিবে। শুদ্ধভাব সমন্বিত চিত্তে ঐরূপ বুদ্ধিগুহা নিবাসী সর্ব্বভূতান্তরস্থ হরিকে দণ্ডায়মান, গমনশীল, উপবিষ্ট বা শয়ান চিন্তা করিবে।

এই প্রকার নিরন্তরধ্যান দ্বারা সাধকের চিত্ত যখন সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ভগবদ্রূপে স্থিতিলাভ করিবে, তখন চিত্তকে ক্রমশঃ আরও সূক্ষ্ম করিবার নিমিত্ত সর্ব্বাঙ্গ হইতে বিযোজিত করিয়া ভগবানের চরণারবিন্দ-প্রভৃতি এক একটি অঙ্গে, পরে ক্রমান্বয়ে আভরণ, অস্ত্র এবং বিলাসহাসাদিতে নিবেশিত করিবে.—ইহা পশ্চাৎ কপিলদেব জননীকে উপদেশ করিয়াছেন।

এখন সমাধি বলিতেছেন—

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্ব্বিযুঙ্‌ক্তে ॥ ৩৪
মুক্তাশ্রয়ং যদি হি * নির্ব্বিষয়ং বিরক্তং
নির্ব্বাণ মৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ।
আত্মানমত্র পুরুষোহব্যবধানমেক
মন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ ॥ ৩৫

[সবীজ-নির্বীজ-ভেদে যোগ দুই প্রকার তন্মধ্যে নির্বীজ-যোগ গীতায় "যতো যতো নিশ্চরতি" (৬।২৬) এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে। তাহাতে সমাধি দুষ্কর। কিন্তু পরমানন্দমূর্ত্তি হরির উপর্য্যুক্ত প্রকারে ধ্যান রূপ সবীজ-যোগে চিত্ত অনায়াসে উপরতি প্রাপ্ত হয়; এজন্য এখানে কপিলদেব তাহার-ই উল্লেখ করিলেন।]

এই রূপ ধ্যানাভ্যাসে ভগবান্ হরিতে যোগীর প্রেমাতিশয় উৎপন্ন হয়, ভক্তি-প্রাবল্যে অহঙ্কার বিগলিত হয়, নিরতিশয় হর্ষে গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, এবং ঔৎসুক্য-জনিত অশ্রুকণা-দ্বারা সে আনন্দসংপ্লবে নিমগ্ন হয়। তখন সে দুর্গ্রাহ্য ভগবানের গ্রহণ বিষয়ে বড়িশ-সদৃশ উপায়-স্বরূপ চিত্তকে-ও ক্রমে ধ্যেয় অঙ্গাদিস্থূলরূপ হইতে বিযোজিত করে অর্থাৎ তাহাতে চিত্তধারণে শিথিল প্রযত্ন হয়। এই প্রকারে যখন ভগবদানন্দানুভবে বিষয়-বিরক্ত, নিজের আশ্রয়ভূত অহঙ্কারের বিলয়ে নিরাশ্রয়, অতএব ধ্যাতৃধ্যেয়ানুসন্ধানের অভাবে নির্বিষয় হইয়া মন দীপশিখার ন্যায় সহসা নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যেরূপ দীপশিখা তৈল ও বর্ত্তিকা ভক্ষণ করতঃ আশ্রয় ও প্রকাশ-যুক্ত থাকিয়া তৈল ও বর্ত্তিকার অপগমে নিরাশ্রয় ও নিষ্প্রকাশ হইয়া স্বকারণ মহাভূতজ্যোতিঃ স্বরূপে পরিণত হয় সেইরূপ যখন চিত্ত নানাবিধবৃত্তিরূপতা পরিত্যাগ করিয়া পরম কারণ ব্রহ্মে লীন হয় অর্থাৎ তদাকার হইয়া যায়, তখন পুরুষ দেহাদি উপাধি-বিবর্জ্জিত হইয়া ধ্যাতৃধ্যেয়বিভাগশূন্য অখণ্ড আত্মাকে অনুগত দর্শন করিয়া থাকে।

আত্মদর্শনের ফল বলিতেছেন—

সোহপ্যেতয়া চরময়া মনসো নিবৃত্ত্যা
তস্মিন্ মহিম্ন্যবসিতঃ সুখদুঃখবাহ্যে।
হেতুত্বমপ্যসতি কর্ত্তরি দুঃখয়োর্যৎ
স্বাত্মন্ বিধত্ত উপলব্ধপরাত্ম কাষ্ঠঃ ॥৩৬
দেহঞ্চ তং ন চরমঃ স্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো বিপশ্যতি, যতোহধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদুপেতমথ দৈববশাদপেতং
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥৩৭

এইরূপে পরমাত্মতত্ত্ববিৎ সেই পুরুষ যোগাভ্যাসলব্ধ অবিদ্যারহিত মনোনিবৃত্তি-দ্বারা পুরুষার্থভূত সুখদুঃখাতীত

* 'যদি হি' ইহার স্থানে 'যর্হি' পাঠ বহুল দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্মস্বরূপে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া, যে সুখদুঃখের ভোক্তৃত্ব পূর্ব্বে (অবিদ্যাবস্থায়) আত্মাতে দর্শন করিয়াছিল, তাহা-ও এখন (জ্ঞানদশায়) অবিদ্যা-প্রসূত তুচ্ছ অহঙ্কারে দেখিয়া থাকে, অর্থাৎ অহঙ্কার-নিষ্ঠ বলিয়াই মনে করে। মদিরা-মদে হতচেতন ব্যক্তি যেরূপ কটিতটে পরিবেষ্টিত বস্ত্র নিবদ্ধ আছে, অথবা স্খলিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করে না, সেইরূপ চরমশরীরে বর্ত্তমান যোগী, আত্মস্বরূপ অবগত হওয়ায়, প্রারব্ধকর্ম্মবশে তাহার দেহ আসন হইতে উত্থিত হউক, অথবা উত্থিত হইয়া তাহাতে-ই থাকুক, সেখান হইতে অন্যত্র গমন করুক, কিংবা সেখানে পুনর্ব্বার আগমন করুক, সেই আত্মসাক্ষাৎকারের হেতুভূত দেহকে-ও স্মরণ করে না; সুখদুঃখাদির অনুসন্ধানের কথা তো দূরে থাকুক।

দেহাদি-উপাধিবর্গে মনঃসংযোগের অভাবে তাহার দেহস্থিতি কিরূপে হয়, এতদাশঙ্কায় কহিতেছেন—

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ॥৩৮

ভাগবত ৩।২৮

প্রারব্ধসংস্কারানুসারে ব্যবহার প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়প্রাণাদি-সংযুক্ত দেহ-ও যাবৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকে, তাবৎ প্রারব্ধ বশে-ই জীবিত থাকে। সমাধিপর্য্যন্ত যোগে অধিরূঢ় আত্মতত্ত্ববেত্তা ধনপুত্রাদি-পরিবৃত সেই দেহকে স্বপ্নজ দেহের ন্যায় আর ভজনা করে না, অর্থাৎ তাহাতে 'আমি, আমার' এইরূপ অভিমান রাখে না।

ঈশ্বরার্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম-দ্বারা সম্যক্ চিত্তশুদ্ধি না হইলে জ্ঞান বা ভক্তিতে অধিকার হয় না।

ভক্তি স্বতঃ নির্গুণ, সুতরাং একরূপ হইলেও পুরুষের তম-আদি-স্বভাব ভেদে বহুপ্রকার হইয়া থাকে। যথা—

"অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ, স তামসঃ॥
বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ যো মাং পৃথগ্ভাবঃ, স রাজসঃ॥
কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ, স সাত্ত্বিকঃ॥

ভাগবত ৩।২৯।৮—১০

অর্থাৎ যে ক্রোধপরবশ ভেদদর্শী পুরুষ হিংসা, দম্ভ, বা মাৎসর্য্যের সঙ্কল্প করিয়া আমাতে (পরমেশ্বরে) ভক্তি করে সে তামস ভক্ত।

যে ভেদদর্শী পুরুষ বিষয়, যশ, কিংবা ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া প্রতিমাদিতে ('আদি'—শব্দে সূর্য্য, বহ্নি, জল-প্রভৃতি পূজাধার বিবক্ষিত) আমাকে অর্চ্চনা করে, সে রাজস ভক্ত।

যে ভেদদর্শী পুরুষ পাপক্ষয়ের অভিপ্রায়ে অথবা ভগবানে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়া তাঁহার প্রীতির উদ্দেশে, কিম্বা 'যষ্টব্যম্—যজ্ঞাদি-দ্বারা পরমেশ্বরের পূজা করা উচিত' এই বিধিবাক্যের অনুবর্ত্তন-কামনায় আমার পূজা করে, সে সাত্ত্বিক ভক্ত।

এখানে ভক্তের ভেদ বলায় ভক্তির-ও ভেদ উক্ত হইল।

এইরূপে ভেদবুদ্ধির সহিত বিধানানুসারে প্রতিমাদিতে যে ভক্তি করা হয় তাহা 'সগুণ ভক্তি'। ইহা নিষ্কাম ভাবে দীর্ঘকাল নিরন্তর সৎকারের সহিত সেবিত হইয়া নিতান্ত পরিপক্ক হইলে 'নির্গুণ ভক্তি'—রূপে পরিণত হয়। 'নির্গুণ ভক্তি-কেই 'প্রেম' বা 'প্রীতি' কহে।

ভগবান্ কপিলদেব ইহার স্বরূপ বলিতেছেন—

"মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ সর্ব্বভূতগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না, যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

ভাগবত ৩।২৯।১১—১২

অর্থাৎ ফলানুসন্ধান ও ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আমার গুণ—শ্রবণ-মাত্রে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বসাক্ষী পুরুষোত্তম আমাতে, সাগরে গঙ্গাসলিলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন মনোগতি-রূপ যে ভক্তি সম্পাদিত হয়, তাহা-ই 'নির্গুণভক্তিযোগের' লক্ষণ।

নির্গুণ ভক্তিতে ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হওয়ায় বিধিপ্রতি-

ভেদের অণুমাত্র অবকাশ নাই। তখন সকল-ই ভগবন্ময় হইয়া যায়। তখন আর উপাস্য উপাসক ভাব থাকে না; সুতরাং আপনা হইতে ভগবানের ভেদ লক্ষিত হয় না। একত্বেই প্রেমের চরম পরিণতি। তদবস্থায় একমাত্র ভগবান বা আত্মা পরিশিষ্টথাকে; অন্য সকল প্রকার বুদ্ধিবিকল্প অন্তর্হিত হয়। অতএব 'নির্গুণভক্তি' বা 'প্রেম'—'আত্মজ্ঞান' হইতে ভিন্ন নহে। উভয়েরই ফল ও স্বরূপ এক।

স এব ভক্তিযোগাখ্যআত্যান্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্যত্রিগুণং মদ্‌ভাবায়োপপদ্যতে ॥

ভাগবত ৩ ২৯।১৪

অর্থাৎ উক্তলক্ষণ নির্গুণভক্তি যোগকেই আত্যান্তিক (সকলের অন্তে সমুৎপন্ন অর্থাৎ চরমসীমা) বলা যায়। এই ভক্তিযোগ দ্বারা পুরুষ ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া মৎস্বরূপ-প্রাপ্তির (ভগবদ্ভাবাপত্তির) যোগ্য হয়।

নির্গুণভক্ত সকল ভূতে ভগবান্‌কে, এবং ভগবানে সকলভূতকে দর্শন করে। জ্ঞানিরও লক্ষণ তাহাই। যথা—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্‌ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

ভাগবত ১১।২।৪৫

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে নিজের ভগবদ্ভাব (ভগবদ্রূপে-অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে সমন্বয় অর্থাৎ অনুগতি—ভগবদভিন্ন আত্মরূপে নিজেরই সর্ব্বভূতে বিদ্যমানতা) দর্শন করে, এবং ভগবদভিন্ন [অধিষ্ঠান ভূত] আত্মায় ভূত সকলকে দর্শন করে, সে-ই ভাগবতোত্তম।

'যস্তু সর্ব্বানি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং, ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥'

ঈশাবাস্যোপনিষৎ। ৬

অর্থাৎ যে সর্ব্বভূতকে আত্মাতে এবং আত্মাকে সর্ব্বভূতে দর্শন করে, সে সেই ঐকাত্ম্য দর্শনান্তর কাহাকেও ঘৃণা বা নিন্দা করে না।

'সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥

মনুসংহিতা ১২।৯১

অর্থাৎ আত্মযজনশীল (হৃদয়ে আত্মধ্যানপরায়ণ) পুরুষ সর্ব্বভূতে আত্মাকে, এবং আত্মায় সর্ব্বভূতকে সমভাবে দর্শন করিয়া স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

নির্গুণ ভক্ত ও তত্ত্বজ্ঞানির মধ্যে কেবল যে শব্দতঃ ভেদ, লক্ষণতঃ নহে; উভয়েই যে একাচার একনিষ্ঠ ও একভাবাপন্ন, তাহা অধোলিখিত ভগবদ্ভক্ত * ও জ্ঞানির লক্ষণ-দ্বারা পরিস্ফুট হয়! যথা—

ভগবদ্ভক্ত সাধুর লক্ষণ—

"কৃপালুর কৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্!
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ ॥
কামৈরহতধী র্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনি ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্পো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥
আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্‌সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত, স সত্তমঃ ॥
জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বাঽথ যে বৈ মাং যাবান্‌যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন, তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥"

ভাগবত ১১।১১।২৯—৩৩

অর্থাৎ যিনি দয়ার্দ্রস্বভাব, সকল প্রাণির মধ্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করেন না, ক্ষমাশীল (অন্যকৃত অপরাধ নির্বিকার ভাবে সহন করেন); সত্যই যাঁহার বল বা শ্রেষ্ঠ সাধন; যাঁহার চিত্ত অসূয়াদি দোষ রহিত; যিনি শত্রু মিত্রাদিতে সমান, যথাশক্তি সকলের উপকারক; যাঁহার বুদ্ধি কামনাসমূহ দ্বারা বিচলিত হয় না; যিনি জিতেন্দ্রিয় কোমলচিত্ত, সদাচারসম্পন্ন, পরিগ্রহশূন্য, নিশ্চেষ্ট (লৌকিকালৌকিকফলজনকব্যাপাররহিত), মিতভোজী, সংযতচিত্ত, মদ্ভক্তিতে নিশ্চল, মদেকাশ্রয় (আমার-ই শরণাগত), মননশীল (বিচারপরায়ণ), সাবধান, নির্বিকার, ধৈর্য্যশালী, ষড়্‌গুণবিজয়ী (ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু—এই ছয়টি গুণকে 'ষড়ূর্ম্মি' কহে) স্বসম্মাননিরপেক্ষ, পরসম্মানকারী, অন্যকে বুঝাইতে নিপুণ, অবঞ্চক, কারুণিক

* গীতার দ্বাদশাধ্যায়ে ত্রয়োদশ শ্লোক হইতে উক্ত ("অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্" ইত্যাদি) ভগবদ্ভক্তের লক্ষণও এখানে অনুসন্ধাতব্য।

করিয়াছিলেন। তৎপর হইতে সুরতকুমারী ঘৃণিত কার্য্যাদি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতঃ নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবাচার-সম্পন্না হইয়া অভিন্নশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীবন্ধু হরির ভজনানন্দে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের ও অযাচিত কৃপা লাভে ধন্য হইবার মূলে যে শ্রীল চম্পটী ঠাকুরের অনুগ্রহ, তাহা ভক্তমাত্রেই পরিজ্ঞাত আছেন। এইরূপভাবে আরও কত অগণিত পাষণ্ডের প্রাণে যে হরিনাম রস সিঞ্চন করতঃ তাহাদিগকে স্নিগ্ধ ও কৃতার্থ করিয়াছেন, জগতে কয়জন তাহার সংবাদ রাখেন? মদিরা সেবন সম্বন্ধেও চিন্তা করিলে বোঝা যায়, যে সাধারণ লোক মদ্যপান করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানহারা হইয়া নানারূপ অপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে ও অশ্রাব্য শব্দাদি উচ্চারণ করিয়া থাকে, আর মহামানা অধিকারী চম্পটী ঠাকুর কি করিতেন? তিনি মদ্য সেবন করিয়াই মানব জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য হরিনাম রসে বিভোর হইয়া পড়িতেন আর নানারূপ ব্যধিময় জরাগ্রস্ত শীর্ণ দেহটা লইয়া কলিকাতা সহরের ছোট বড় রাস্তা ঘাটে, ক্ষুদ্র গলিতে গলিতে সর্ব্বত্র "হরিবোল হরিবোল" বলিয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেন। হরিনাম রসে নিজে মাতিয়া জগতকে মাতাইবার জন্যই তিনি ঐ দ্রব্য পান করিতেন, কাজেই তাঁহার সহিত সাধারণ জীবের তুলনা তো হইতেই পারে না, এমন কি সামান্য জীবের পক্ষে ঐ আদর্শ অনুকরণীয়ও নহে। ঐরূপ আচরণ কেবল চম্পটী মহাশয়তেই সম্ভব হয়। শিবত্বের কাছে বিষত্ব ও স্বভাবতঃ পরিহার করে। শ্রীমদ্ভাগবতকারও তাহাই বলিয়াছেন—

'বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্' ॥

যেহ অরুদ্র হইয়া দম্ভবশতঃ সমুদ্রোত্থ বিষপান করিলে তাহার পরিণামে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আমরা প্রত্যহ চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, মদ খাইয়া মানুষ সর্ব্বস্বান্ত হয়; কি শারীরিক, কি আর্থিক, কি পারমার্থিক সর্ব্বপ্রকারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় মানুষ মদের নেশায়; আর নির্ব্বিকার পুরুষ চম্পটী ঠাকুর ঐ বিষ মুখে দিয়া হরিনাম রূপ অমৃত বর্ষণ করিতেন আর নিজে মাতাল হইয়া মাতালের দলে মিশিয়া, কতজনের মদের মত্ততা চির জীবনের মত দূর করিয়া দিয়া, ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষাবিধান করতঃ হরিনাম মদে চির শান্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মহাকবি সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত কালিদাসও লিখিয়াছেন, "বিকার-হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি তয়েব ধীরাঃ।"

বিকারের হেতু উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যাঁহাদের চিত্তে বিকার উপস্থিত না হয়, তাঁহারাই প্রকৃত 'ধীর' পদবাচ্য. ধীরাগ্রগণ্য চম্পটী ঠাকুরের মুখ হইতে অতি উচ্চৈস্বরে হরিনাম-মহানামের যে মহাউচ্চারণ গগনমণ্ডলে অপ্রতিহত ভাবে ধ্বনিত হইয়া জগতের মহামাঙ্গল্য বিধান করিয়াছে, তজ্জন্য জগদ্বাসী সত্য সত্যই তাঁহার কাছে চিরঋণী।

চম্পটী মহাশয়ের সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু জ্ঞান-শার্দ্দুল সরস্বতী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনেক সময় চম্পটী মহাশয়কে অর্থদান করিতেন। একদিন চম্পটী মহাশয় আশুবাবুর নিকট হইতে টাকা লইয়া চলিয়া যাবার পর তত্রস্থ জনৈক ভদ্রলোক আশুবাবুকে বলিলেন, 'আপনি চম্পটীকে টাকা দেন কেন? ও লোকটী যে মাতাল। এখনই এই টাকাগুলি শুড়ির দোকানে দেবে।' আশুবাবু তদুত্তরে ঐ লোকটীকে দুইটী কথা বলিয়াছেন। প্রথম বলিলেন, 'চম্পটী সাধারণলোকের মত মদ খায় না। সে নিজে মদ খাইয়া অনেকের মদ খাওয়া ছাড়াইয়াছে। তৎপর বলিলেন, 'চম্পটী মদ খাইয়া হরিনাম করে, আপনি কি হরিনাম করেন?' ভদ্রলোকটি আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, চুপ করিয়া থাকিলেন। আশুবাবুর এই গবেষণা পূর্ণ কথা দুইটি লইয়া চিন্তা করিলে বোঝা যায় তিনি চম্পটী মহাশয়কে কতখানি চিনিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কতখানি উচ্চধারণা পোষণ করিতেন। চম্পটী ঠাকুর যে নিজে মদ খাইয়া অন্যের মদ খাওয়া ছাড়াইতে পারেন ইহা শুধু আশুবাবুই জানিয়াছিলেন এমন নহে, কলিকাতা সহরের অনেকেরই একথা জানা ছিল।

একদিন কলিকাতা সোনাগাছির বারবণিতা পল্লীর ভিতর দিয়া অতি উচ্চরোলে 'হরিবোল' ধ্বনি দিয়া হরিবোলা ঠাকুর আপন মনে চলিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় রূপযৌবনসম্পন্না এক বাঈজী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল 'চম্পটী মহাশয় আপনাকে সেদিন যে কথা

বলিয়াছিলাম?' চম্পটী ঠাকুরের সব সময় সব কথা মনে থাকিত না। তিনি কহিলেন 'কি কথা?' বাঈজী উত্তর করিল 'ঐ যে সেই * বাবুর কথা। আপনিতো অনেকের মদ খাওয়া ছাড়াইলেন, আমাদের বাবুর মদ খাওয়াটা বন্ধ ক'রে দিতে পারেন।' যে বাবুটির কথা বলিল, তিনি কলিকাতা সহরের রাজা উপাধিধারী একজন নামজাদা জমিদারের পৌত্র। বর্ত্তমানে অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিলেও রাজা উপাধি বজায় আছে। যাদুমণি বাঈজীর মুখে বাবুর মদ খাওয়া ছাড়াইবার কথা শুনিয়া সুবিজ্ঞ চম্পটী মহাশয়ের চিন্তামণি ও বিল্বমঙ্গলের উপাখ্যান মনে পড়িল। তিনি ধীরভাবে উত্তর করিলেন, এই কুঅভ্যাস ছাড়াইবার ক্ষমতা আমার নাই। সে শক্তি আমার প্রভুর আছে। তুমি যদি আমার সঙ্গে তোমার বাবুটিকে প্রভুর নিকট পাঠাইতে পার, তবে তাঁহার কৃপায় তার ঐ প্রবৃত্তি নষ্ট হইতে পারে।' বাঈজী কহিল—

'আপনার প্রভুর নাম কি?'

'শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর।'

'তিনি কোথায় থাকেন?'

'ফরিদপুর।'

'কি করিয়া যাইতে হয়?'

'ট্রেনে যাইতে হয়।'

'আমি বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আপনাকে বলিব, আপনি আগামী কল্য আসিবেন।' এই কথা বলিয়া যাদুমণি গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল। চম্পটি মহাশয়ও পাপী তাপীর হৃদয় নাচাইয়া গগনভেদী 'হরিবোল" বলিয়া চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে ভাবিলেন ব্যাপারটা একটু খানিক কি রকমের। ব্যভিচারিণী বেশ্যারা কুহকজালে ফেলিয়া ভাল লোককেও পঞ্চ মকারে চুবনি দেয়, আর এ যে তদ্বিপরীত চেষ্টা। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় মূলে প্রভুর ইচ্ছা নিহিত আছে। যাহা হউক,

হাকীম হয়ে হুকুম কর পিয়াদা হ'য়ে মার।
সর্প হয়ে দংশন কর ওঝা হ'য়ে ঝাড়।

ভাবিতে ভাবিতে চম্পটি ঠাকুর খানিক পরে ও কথা ভুলিয়া গেলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চম্পটী ঠাকুরের সব সময় সব কথা মনে থাকিত না, তাঁহার গতিবিধিরও কোনও স্থিরতা ছিল না। তৎপর প্রায় ৪।৫ দিন ঐ রাস্তায় আর আসেন নাই; হঠাৎ একদিন অপরাহ্নে 'হরি হরিবোল' ধ্বনি শুনিয়া যাদুমণি ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া পথ আগুলিয়া দাড়াইল।

'আপনি কথামত আসিলেন না কেন?'

'সে কি আমার ঠিক ছিল। তা তুমি বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছ?'

হাঁ, বাবু যাইতে রাজী হইয়াছেন। ট্রেন ভাড়া আমিই দিব।'

উভয়ে এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময় হঠাৎ সেই বাবুটীও আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। অন্য কোনও দিন ঐ সময় তিনি আসেন না। চম্পটী মহাশয় বলিলেন, প্রভুর ইচ্ছায় আপনিও যখন আসিয়াছেন, তখন আপনার সঙ্গেই কথা চূড়ান্ত হইয়া থাকুক।' অবশেষে তিনজনে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, 'আগামী কল্যই ঢাকা মেইলে রওনা হওয়া যাবে।'

পূর্ব্বদিনের কথানুসারে পরদিন সন্ধ্যার পর যাদুমণি একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া, চম্পটী মহাশয় ও ঐ বাবুটীকে শিয়ালদহ ষ্টেসনে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট করিয়া উভয়ে ট্রেনে উঠিলেন। যাঁহার দর্শন করিতে যাইতেছেন, বাবুটি তাঁহার বিষয় পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তিনি কি করেন, কি ভাবে থাকেন, ইত্যাদি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—চম্পটী মহাশয়ও যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলেন। তিনি সোৎসুক চিত্তে শুনিতে লাগিলেন, প্রায় সমস্ত রাত্রিই ঐরূপ প্রসঙ্গে অতিবাহিত হইল।

ভোর ৬টায় ফরিদপুর ষ্টেসনে পৌঁছিয়া, অবতরণ করিলেন। তখন ফরিদপুর ষ্টেসন পদ্মার ধারে টেপাখোলা-বন্দরের দিকে ছিল। বর্ত্তমানে ঐ স্থান পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত

---

* এই বাবুটির নাম প্রকাশ করা চম্পটী মহাশয়ের নিষেধ ছিল বলিয়া প্রকাশ করিলাম না। ঐ বাঈজীর নাম ছিল যাদুমণি, তাহা চম্পটি মহাশয়ের মুখেই শুনিয়াছি।

হওয়ায় ষ্টেসন অন্তত্র সরিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীপ্রভু তখন গোয়ালচামট ভক্তবর নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। ষ্টেসন হইতে শ্রীশ্রীপ্রভুর তৎকালীন অবস্থিতি-স্থান প্রায় দুই ক্রোশের কিঞ্চিদধিক হইবে। উভয়ে পদব্রজেই সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যিনি রাজার পৌত্র, গাড়ী ছাড়া ঘরের বাহির হন না, তিনি আজ অতটা রাস্তা হাটিয়াই চলিলেন।

প্রাণে অদম্য আকাঙ্ক্ষা, যে প্রভুর দর্শন পাইবেন। আসিবার সময় ট্রেনে বসিয়া চম্পটি মহাশয়ের নিকট শ্রীশ্রীপ্রভুর অনিন্দ্যসুন্দর রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া দর্শনাকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল হইয়াছে যে পথ-শ্রম তাহার মোটেই বোধ নাই। গোয়ালচামট কবিরাজ নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের বাড়ী পৌছিয়া প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া চম্পটী মহাশয় ভূমিষ্ঠ হইলেন। একটু পরেই শ্রীশ্রীপ্রভু গৃহাভ্যন্তর হইতে বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে বলিলেন 'কে? অতুল এসেছিস্' চম্পটীমহাশয় বলিলেন 'হাঁ প্রভু' পুনরায় প্রভু ঐ বাবুটির নাম করিয়া বলিলেন 'তোর সঙ্গে কি * এসেছে। চম্পটী মহাশয় পূর্ব্ববৎ অতি বিনীত ভাবে কহিলেন, "হাঁ, প্রভু, ইনি আপনাকে দর্শন করিতে এসেছেন।' প্রভু বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমরা বসো।' শ্রীশ্রীপ্রভু তখন যে গৃহে ছিলেন উহা খড়ের চৌচালা ঘর। চতুর্দ্দিকে বাঁশের চাটাইর বেড়া, দরজাতেও ঐরূপ ঝাঁপ ছিল। কিছুক্ষণ পরে রঙ্গনটবর বন্ধু-হরি হাততালি দিয়া ইঙ্গিত করিলেন। অনেকদিন শ্রীশ্রীপ্রভুর সঙ্গ করিয়া মর্ম্মীভক্ত চম্পটীঠাকুর ঐ সকল আকার ইঙ্গিত অতি সহজেই বুঝিতে পারিতেন। শ্রীহস্তের তালি শুনিয়াই বুঝিলেন প্রভু তাহাকে ডাকিতেছেন। অমনি অতি ত্রস্তভাবে শ্রীমন্দিরের নিকটে ছুটিয়া গেলেন। প্রভু তখন দরজার ঝাঁপটি একটুখানিক ফাঁক করিয়া বলিলেন, অক্ষয়কে ডাকিয়া ওকে মুণ্ডন করিয়া দে।' চম্পটি মহাশয় অতি মৃদু স্বরে বলিলেন 'দর্শন কখন হবে? প্রভু সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন 'আমি যা বলিলাম, তাই কর।' প্রভুর কথার উপর কথা বলিবার শক্তি কাহারও ছিল না। চম্পটি মহাশয় ফিরিয়া আসিয়া বাবুটীকে ঐ কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন। বাবুটি নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চম্পটি মহাশয়, প্রভু কি বলিলেন? এখন কি দর্শন হবে?' চম্পটী মহাশয় কিছু সময় চুপ করিয়া থাকায় বাবুটি ব্যস্ত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বলুন না, প্রভু কি বলিলেন?' চম্পটী মহাশয় তখন সসঙ্কোচে উত্তর করিলেন, 'প্রভু আপনাকে মুণ্ডিত মস্তক হইতে অনুমতি করিলেন।' একথা শুনিয়া তিনি সাগ্রহে বলিলেন, তার জন্ত কি হয়েছে, আপনি বলিতে সঙ্কোচ কচ্ছেন কেন? পরামাণিক ডাকুন, আমি এখনই ন্যাড়া হচ্ছি।' চম্পটী মহাশয় অক্ষয়ের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বাহির হইতেই অক্ষয় শীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। অক্ষয় তখন তাহার ক্ষৌর কার্য্যের যন্ত্রাদি লইয়াই বাহির হইয়াছিল। অক্ষয় প্রভুর ভক্ত হইলেও চম্পটী মহাশয়ের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতে কোনরূপ জানা শোনা ছিল না। প্রভুর আদেশ মত বিনা চেষ্টায় অক্ষয়কে পাইয়া চম্পটী মহাশয় বিস্মিত হইয়া ডাকিয়া আনিলেন। অক্ষয় প্রাঙ্গনে আসিতেই বাবুটি বলিলেন, 'চম্পটী মহাশয়, পরামাণিক এনেছেন? চম্পটী মহাশয় বলিলেন, 'হাঁ, এই যে, ইনি পরামাণিক, ইনি পরমভক্ত লোক।' এই বলিয়া অক্ষয়কে দেখাইয়া দিলেন। বাবুটি অমনি অক্ষয়ের সম্মুখে যাইয়া মস্তক নীচু করিয়া বসিয়া বলিলেন, 'তুমি আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দাও।' অমন সুন্দর ফিট বাবুটির অতি চিক্কণ কুঞ্চিত কেশ মুণ্ডন করিতে অক্ষয়ের ভয় হইতেছিল। কিন্তু বাবুটি অক্ষয়কে অভয় দিয়া কহিলেন, 'তোমার কোন ভয় নাই, তুমি নিঃসঙ্কোচে আমাকে মুণ্ডন করিয়া দাও।' অক্ষয়ের যন্ত্র খুলিয়া,জল আনিয়া লইতে যে বিলম্ব হইতেছিল, তাহাও যেন বাবুটির আর সহ্য হইতেছিল না। তাহার ধারণা হইয়াছিল যে মস্তক মুণ্ডন হইলেই প্রভুর দর্শন পাইব, অতএব যত শীঘ্র ন্যাড়া হইব, তত শীঘ্রই দর্শন পাইব। তজ্জন্তই বিলম্ব অসহনীয় হইয়াছিল। অক্ষয় তো ভয়ে ভয়ে বাবুর মস্তক সিক্ত করিয়া ক্ষুর চালনা আরম্ভ করিলেন। কিছু সময় পর আবার প্রভুর করতালির শব্দ চম্পটী মহাশয়ের কাণে পৌছিল। চম্পটি মহাশয় শ্রীমন্দিরের নিকট যাইতেই প্রভু একটু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'ওকে

এখন যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থাতেই কলিকাতা ফিরে যেতে বল্।' চম্পটি মহাশয় বলিলেন, 'তা কি করে হবে, প্রভু আপনাকে দর্শন করিতে এল, দর্শন হবে না?' প্রভু কহিলেন, 'এখন নয়।' প্রভু আরও বলিলেন, 'এখান হ'তে ষ্টেশন পর্য্যন্ত হাটিয়া যাইতে বল্‌বি, ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট করিয়া, উভয়ে ভিন্ন কামরায় বসিয়া যাবি। পথিমধ্যে কোনও আলাপ করিস্ না।' এই বলিয়া কিছু প্রসাদ দিয়া বিদায় করিলেন। এই সব কথা হইতে হইতেই মুণ্ডন কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছিল। চম্পটি মহাশয় ফিরিয়া আসিতেই বাবুটি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভুর দর্শন কখন হবে?' চম্পটি মহাশয় সভয়ে সসঙ্কোচে সেই নিদারুণ বাণী শোনাইলেন 'এখন নয় এখনই এই অবস্থায় কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইবে।' প্রভু যে যে ভাবে বলিয়াছিলেন সেই সেই ভাবেই সব বলিলেন। বাবুটি তখন শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটি গড় হইয়া প্রণাম করতঃ প্রসাদ লইলেন এবং অগত্যা কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীর প্রকোষ্ঠে বসিয়া একাকী কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার চোখের জলে ভাসাইয়া, একবার অনুতাপানলে পোড়াইয়া প্রভু তখন তাঁহাকে খাঁটি সোণা তৈয়ারী করিলেন।

'অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়॥'

কলিকাতা পৌছিয়া তিনি চম্পটি মহাশয়কে বলিলেন, 'চম্পটি মহাশয়, বলিতে পারেন, প্রভু আমার সঙ্গে এরূপ খেলা খেলিলেন্ কেন?' চম্পটি মহাশয় কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকিলেন। পরে বাবুটি নিজেই বলিতে লাগিলেন। "চম্পটি মহাশয়, আপনার প্রভু যে একমাত্র প্রভু, স্বয়ং ভগবান, স্বতন্ত্র ঈশ্বর আজ তাহারই পরিচয় দিলেন। ইনি যে সাধারণ সাধু সন্ন্যাসী নয়, তাহাই দেখাইলেন।' নিজের গৌরবের কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন, 'আমি অমুক রাজার নাতি, একথা শোনামাত্র সাধু সন্ন্যাসী বা গুরু গোসাই হইলে শিষ্য করিবার লোভে ছুটিয়া আসিত, শ্রীশ্রীপ্রভু তাহা না করিয়া আমাকে এইরূপ করিয়া যখন ফিরাইয়া দিলেন তখন তিনি যে সাধারণ সাধু সন্ন্যাসী বা গুরুগোসাই নহেন, তাহা আমাকে বেশ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়াছেন।'

এই বলিয়া কিছু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, চম্পটী মহাশয়, বলিতে পারেন প্রভু আমাকে এত দয়া কেন করিলেন?" চম্পটী মহাশয় কোন উত্তর না করিতেই বাবুটি অত্যন্ত আবেগভরে কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "প্রভু পতিতপাবন, মহামহাপতিতপাবন, তাই আমায় এত দয়া করিলেন" এই কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন ও বলিতে লাগিলেন, 'চম্পটি মহাশয়, বলিতে কি, আমাদের বাড়ীর মধ্যে যে চৌবাচ্চাটা আছে ঐ চৌবাচ্চার তিন চৌবাচ্চা মদ আমি খাইয়াছি ও এত জঘন্য কর্ম্ম আমি জীবনে করিয়াছি যাহা প্রকাশ করিতেও আজ ঘৃণা বোধ হইতেছে। এতবড় পতিত বলিয়াই প্রভু এত কৃপা করিয়াছেন।'

তৎপর হইতে সেই বাবুটি পরম সাধু স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া অতি সদ্ভাবে বন্ধুহরির শ্রীচরণাশ্রয়ে জীবন যাপন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বাঈজী যাদুমণিও চম্পটী মহাশয়ের সঙ্গগুণে শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপালাভে পবিত্র হইয়াছিল। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়া পরম দয়াল পতিতপাবনের পাদপদ্মে স্থান লাভ করেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর পতিতোদ্ধারণ লীলার মধ্যে এই ঘটনাটি অতি ক্ষুদ্র হইলেও আমার মত পতিত জীবের আশার আলোক-স্বরূপ, তাই পূজ্যপাদ চম্পটি মহাশয়ের নিকট হইতে যথাশ্রুত প্রকাশ করিলাম। জয় জগবন্ধু! জয় তোমার পতিতোদ্ধারণ লীলা মাধুরী!!

গোপীবন্ধুদাস।

"পহেলা আশ্বিন।"

উঃ! কি ভীষণ দিন! পহেলা আশ্বিন, আবার আসিল ফিরে।
সেই স্মৃতি টানি' ভাঙ্গা বুকখানি, পাষাণে চাপিতে কিরে?
ওরে নিদারুণ, জলন্ত আগুন, আবার যদি রে এলি';
দগধি দগধি, এ পোড়া পরাণ, চিতানলে দে'না ফেলি'?
ওরে কালযম, নিঠুর নির্ম্মম, কি করিতে চাহ আর?
নয়নের মণি, ল'য়েছ উপাড়ি, হিয়ার ছিঁড়েছ তার।
চাঁদিমা উজল, সে মুখ কমল, কালিমা দিয়াছ ঢাকি'।
বিষাদ বিপ্লবে ডুবায়েছ ভবে আর কিবা আছে বাকি?

ছিঃ ছিঃ ধিক্ তোরে, বুদ্ধি নাই কিরে, কেনরে হেন বিলাস?
বিরহ বিধুরা ধরণীর বুকে, শোভে কি শ্যামল বাস?
শেফালি-শয্যা, সাজে কি কখনো, দগধ কানন প'রে?
গঞ্জিত গগনে, রঞ্জিছ কি হেতু, পুঞ্জিত পরাগ ভরে?
ঝিকি মিকি ঝিকি গগনের গায়, কেনরে তারকা মালা
স্ফুলিঙ্গ সমান, দহিয়ে পরাণ, বাড়া'তে কি চাও জ্বালা?
শারদ আলোক, শাণিত সায়ক, দাবাগ্নি মলয় মন্দ;
নিশ্বাসে তপত বাতাসে সাজে কি, মল্লিকা মালতী-গন্ধ?
অশনি-সমান, বিহগের গান, শেল-সম-ফুল দাম;
লাজ নাই মুখে, এনেছ কি সুখে, না আনিয়ে প্রাণারাম?
কেন বা'রে বারে, এস ফিরে ফিরে, হও আজি চির-গত;
'এখনো আমরা বাঁচিয়ে রয়েছি', তাই কি বিদ্রূপ এত?
যন্ত্রী বিহীন, তন্ত্রী কেমন, মূর্চ্ছনা-হারা গান।
শশিকলা-হীনা, যামিনী কেমন, বিমলিনা তনুখান॥
সুনীল ফেনিল, সাগরের বুকে, ভাসিয়ে চ'লেছে তরী।
দুর্দ্দশা কেমন, তাহার তখন, কর্ণধার নিলে হরি'॥
তাহাই দেখিতে, ওরে কাল-রাহু, ফিরে কি আসিলে আজ?
গ্রাসি' দিনমণি, কমলিনী দশা, হেরিতে নাহি কি লাজ?

শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ, যুগান্ত বহিয়ে ধরার দুরিত-চয়।
বল কোন্ মোহে, সে কোমল দেহে, চাপিলে হে নিরদয়?
সে পাপ-শৈল, রাখিবার স্থান, এনহে নহে কখনি,
নবনী দেহ কি, সহে হুতাশন, কুসুম সহে কি অশনি?

কেননা বিঁধিলে সে পাতক শূলে, আমাদের বুকে আগে?
কেননা হানিলে, সে প্রলয়াঘাত, আমাদের শিরোভাগে?
কেননা করিলে আগে আমাদের, অনুভব-শক্তি-হীন?
জান না কি কাজ, ক'রেছ নিলাজ, ওরে অভিশপ্ত দিন?

অই দেখ অহো! কোথা মিশে গেল, সে লাবণ্য সুধা ধারা।
অরুণ-বরণ করুণ চাহনী, মন-প্রাণ চুরি-করা॥
আধ আধ ভাষ, মৃদু মন্দ হাস, সুললিত শতদল।
বিকল করিয়ে, সকলি লুকা'ল, প্রলয়ের কাল-জল॥
সুশীতল সান্ধ্য স্নিগ্ধ-সমীরণ সর্ব্বজীব জ্বালা-নাশী।
হ'রে লয় যথা. কৃষ্ণা তামসীর গাঢ় অন্ধকার আসি॥
তেমতি হায় সে, মুরতি মোহন, জিনিয়ে কাঞ্চন-কাঁতি।
জগদঘরাশি, ঘনঘটা আসি, করিল কালিমা সাথী॥
কি দেখিতে আজি, আসিয়াছ সাজি', হারাইয়ে হেন নিধি?
মোদের জ্বালাতে, তোমারে জগতে সৃজিয়াছে কোন্ বিধি?

এক দুই করি', আটবার গে'ছ, করাঘাত করি' দ্বারে।
কত জনমের শত্রুতা ছিলরে, শোধে নি কি আটবারে?
আর আজি তোরে, আপন করিয়ে, লইব বরণ করি'।
কিছু উপকার, কর মো সবার, মিনতি এ পায়ে ধরি'॥
যজ্ঞকুণ্ড অই, সাজিয়ে রেখেছি, ঋত্বিক্ পাইনি তার।
পুরোহিত তোরে, বরণ করিনু, হিতকর এইবার॥
বিশ্ব বিসারিত গগন-চুম্বিত, যজ্ঞ-শিখা তোল জ্বালি'।
তাপ-জরজর. মোদের জীবন, সব তাহে দেও ঢালি'॥
মুছে' ফেল আজি, জগত হইতে, "মহানাম-সম্প্রদায়"।
যজ্ঞে ভস্ম করি,' রেখে দাও ফেলি,' এ মহা-যজ্ঞ-শালায়॥
সে ভস্ম উপরে, বিশ্ব মানবের, শান্তির আসন গড়িও।
বঁধুয়া আসিলে, পাদ পীঠতলে, সে ক্ষুদ্র আসন রাখিও॥

যেদিন, হৃদয়ে হৃদয়ে, শান্তি মলয়ে, ভাবের উৎস ছুটিবে।
যেদিন, উধাও ধরণী, প্রেমে আত্মহারা, চরণে আসিয়া লুটিবে।
যেদিন, স্পন্দিত-পুলকে, প্রতি পরমাণু, পরাণ বঁধুর পরশে।
সেদিন, পাদ পীঠতলে, যজ্ঞ ভস্মশেষ নাচিব আমরা হরষে॥

জন্ম-রহস্য।

শ্রীমহানাম-মধু-ভাষ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তারপর শ্রীল চম্পটী ঠাকুরের নিকট হইতে আমরা শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা পাইয়াছি, তাহাই আলোচনা করিব।

শ্রীশ্রীপ্রভু স্বীয় তত্ত্বমাধুর্য্য অধিকার অনুযায়ী বহু ভক্তের নিকট প্রকাশ করিলেও, শ্রীল চম্পটী ঠাকুরের নিকট আপনাকে যেরূপ খুলিয়া মেলিয়া দিয়াছেন, সেরূপ আর কাহারও নিকট করেন নাই। শ্রীশ্রীপ্রভুর সমগ্র ভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে তিনি রাজচক্রবর্ত্তী স্বরূপ। শ্রীশ্রীপ্রভুর লোকাতীত ভাব বুঝিতে ও তাঁহার পরম নিগূঢ় তত্ত্ব রস আস্বাদন করিতে তাহার মত আর কেহ—এ পর্য্যন্ত পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ছোট, বড়, উচ্চাধিকারী, নিম্নাধিকারী—এক কথায় বন্ধু ভক্ত বলিতে যাহাদিগকে বুঝায় 'চম্পটীঠাকুরের কাছে আমি ঋণী নহি', এমন কথা বলিবার সাহস কাহারও নাই

শুধু বন্ধু ভক্ত কেন? সত্যকথা বলিতে গেলে, বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বঙ্গভূমিতে যে সকল উন্নতসত্ত্বা মনীষি আবির্ভূত হইয়াছেন,তন্মধ্যে চম্পটী ঠাকুরের গগনভেদী "হরি বোল" ধ্বনিতে মুগ্ধ স্তম্ভিত ও পুলকিত না হইয়াছেন এমনটি বিরল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, গোস্বামি পাদ বিজয় কৃষ্ণ, বাবা প্রেমানন্দ ভারতী, মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ প্রভৃতি তাৎকালীন মহাপুরুষ গণের প্রত্যেকের জীবন ধারা পরিবর্ত্তন ও অন্তর্মুখীন ভাব পরিবর্দ্ধণের মূলে যে সকল রহস্যময় কারণ লুক্কায়িত আছে, চম্পটীঠাকুরের দুর্লভ সঙ্গ ও তাহার পাপ কালিমাধৌতকারী উচ্চ হরিধ্বনি যে তাহার অন্যতম, ইহা অতিরঞ্জিত কথা নহে। অই যে প্রভু বন্ধুর পরম আদরের সারিকা অনুগত রামা, আজ সুমধুর কীর্ত্তন ঝঙ্কারে সুদূর কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত মুখরিত করিতেছেন, "নিতাই গৌর রাধেশ্যাম" মন্ত্রের একমাত্র প্রচারক ও বড় বাবাজী-রাধারমণ-প্রিয়তম সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া বলিয়া যাহার অমল ধবল যশোরাশি ক্রমে ক্রমে দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইতেছে, তাঁহার বৈরাগ্য জীবনের প্রথম অঙ্কে ভক্তসিংহ চম্পটী ঠাকুরের হরিবোল গর্জ্জনই যে তাহাকে পাগল পারা করিয়া নাচাইয়া তুলিয়াছিল, একথাটি না বলিলেও সত্যের অপলাপ করা হয়। চম্পটী ঠাকুরের ইষ্টনিষ্ঠা ও নামের শক্তিতে অমিত বিশ্বাসের কথা ভাবিলে,তাহাকে নিখিল বিশ্ববৈষ্ণব-সম্রাট বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে শুদ্ধি আন্দোলন ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন নীতি লইয়া বর্ত্তমান ভারত তোলপাড়, সেই শুদ্ধি ভাবের তিনি প্রবর্ত্তক ছিলেন। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের তিনি প্রকৃত পথপ্রদর্শক ছিলেন। ডোম, বুনা, চাষা, ধোপা, মুচি মুদ্দাফরাস, কসাই, লম্পট প্রভৃতি সমাজের ঘৃণিত ও পতিত জাতিকে কি করিয়া বুকে তুলিয়া হরিনাম লওয়াইতে হয়, তাহা তিনি চির জীবন ভরিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। কলিকাতা রাম বাগানের ডোম সম্প্রদায় ও ফরিদপুর সহরতলীর বুনা সম্প্রদায় তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এত বড় মহামহা অধিকারী হইয়াও তিনি যে কিরূপ সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠাশূন্য ভাবে এই কলিকাতা সহরে বিচরণ করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়।

লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাকে পদদলিত করিবার শক্তি যে তাহাতে কিরূপ অপরিমিত, তাহা ধারণা করিবার সামর্থ্যও আমাদের নাই। অবিরাম বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ যেরূপ জীবের কল্যাণার্থ ত্রিভুবনে বিচরণ করেন, পরম দয়াল নিত্যানন্দ যেরূপ প্রতিনিয়ত গৌর প্রেমে গদ গদ হইয়া 'প্রেম কে নিবি কে নিবি' বলিয়া দন্তে তৃণ ধরিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়ান, ভক্তকুল-তিলক অবধুত চম্পটী ঠাকুরও তেমনি বড় ছোট ধনী দরিদ্র

হিন্দু অহিন্দু না বাছিয়া নিয়ত জগৎ কল্যাণ কামী হইয়া নিষ্কিঞ্চন কাঙ্গাল বেশে "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া অবিচারে পথে ঘাটে যথা তথা বিচরণ করেন, অথচ মূঢ়-বুদ্ধি অজ্ঞ জীব তাহাদের দ্বন্দ্বরহিত ত্রিগুণাতীত ভাব বিহ্বলতা অনুভব করিতে না পারিয়া বাহ্য আচার ব্যবহার লইয়া নানা প্রকার নিন্দাবাদ ও তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকে।

তদীয় সহপাঠী জ্ঞানশার্দ্দূল সরস্বতী আশুতোষ তাহার অসাধারণ ধীশক্তি ও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত বাহ্য প্রতিষ্ঠাহীন ভাব সন্দর্শনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "I envy his position." অপ্রাকৃত চরিত্র সেই চম্পটীর ভাব, ভাষায় অঙ্কন করিতে মাদৃশ মূঢ় বুদ্ধি মানবের প্রাকৃত তুলিকার সামর্থ্য কোথায়? তাহার ভাবটি যেমন রহস্যময়, তাহার মুখের কথাও ঠিক তেমনি দুর্ব্বোধ্য। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একদিন সত্যসত্যই বলিয়াছিলেন, "চম্পটীর কথা বুঝ্তে পারে কলিকাতা সহরে এমন লোক নাই।" লক্ষণ দেখিয়া মানুষ চিনিয়া ভাব ও অবস্থানুযায়ী কথা বলিতে তিনি যেরূপ পারদর্শী ছিলেন, সংসারে তাদৃশ একটী কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। তিনি শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্মরহস্য তত্ত্ববেত্তা জানিয়া বহু ভক্ত বহু সময়ে তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনি কাহাকেও কিছুই বলেন নাই, কাহাকেও বা কিছু লিখিয়া বা বলিয়া দিয়াছেন। নিম্নে তন্মধ্যে তিন চারিটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। সব কথাগুলি পরস্পর মিল সর্ব্বাংশে না থাকিলেও আসল কথা (essential portion) নিশ্চয় রূপে গ্রহণ করিয়া বাকী অংশকে নিরর্থক না বলিয়া, দেশকাল পাত্রসহ চিন্তা করিয়া, সপ্রয়োজন স্বীকার করতঃ সমাধান করিতে হইবে।

১। একদিন চম্পটী মহাশয় বন্ধুগতপ্রাণ শ্রীযুক্ত মতি লাল ঘোষ মহাশয়কে শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্মবৃত্তান্ত লিখিয়া দিয়াছিলেন। বোধ হয় সে লেখাটি বর্ত্তমানে হারাইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ঘোষমহাশয়ও ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তবে জগদ্গুরু গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী উক্ত লেখাটি নিজে পাঠ করিয়াছেন। তাহা হইতেও প্রাচীণ ভক্ত শ্রীযুক্ত বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মিত্র প্রভৃতি ভক্তগণের নিকট হইতে, শ্রবণ করিয়া নষ্টাশ্ব-দগ্ধরথ ন্যায়ানুসারে প্রামাণ্য রূপে যতদূর সাধ্য গ্রহণ করতঃ স্বকীয় অনুভূতির সঙ্গে মিলাইয়া জগদ্গুরু গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব সেই লেখার যে অংশ মহেন্দ্রজী প্রামাণ্য বলিয়া অনুমান করিয়াছেন তাহা স্বকীয় লেখার মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন ইহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ শ্রীমৎ চম্পটী ঠাকুরের প্রকটকালেই উক্ত জগদ্গুরু গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের বহু স্থলের বহু ভুলত্রুটী চম্পটী ঠাকুর নিজহস্তে সংশোধন করিয়াছিলেন এবং একাধিক স্থলের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ জন্ম-রহস্যের উপরে কথনও লেখনী ধরেন নাই, বরং পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া আনন্দ পাইয়াছেন। এক সময় কাশীধামে অবস্থান কালে বহু সময় উক্ত জগদ্গুরু গ্রন্থ ও শিশিরবাবুর লর্ড গৌরাঙ্গ গ্রন্থ পাঠ করিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে দেখিয়াছি। শ্রীমন্ মহেন্দ্রজীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া তিনি উক্ত স্থলে ভুল থাকা সত্ত্বেও সংশোধন করেন নাই, এরূপ কেহ মনে করিবেন না, যেহেতু তত্ত্বসিদ্ধান্তে কোথাও লেশমাত্র বিচ্যুতি ঘটিলে তিনি কাহাকেও বলিতে ছাড়িতেন না। বিশেষতঃ তিনি মহেন্দ্রজীকে গৌরব না করিয়া বরং পরম স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এক সময় মহেন্দ্রজী কোন একখানি কাগজে শ্রীশ্রীপ্রভুকে 'জ্ঞানময়' লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে চম্পটী ঠাকুর অতি গম্ভীর ভাবে শাসন ব্যঞ্জক সুরে বলিয়াছিলেন, 'কে বলেছে প্রভু আমার জ্ঞানময়, কে বলেছে জ্ঞানে তাকে জানা যায়? কে কোন কালে তাকে জেনেছে?" মহেন্দ্র জী তখন নিজ ভুল বুঝিয়া 'জ্ঞানময়' স্থানে "জ্ঞানাতীত" লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

২। কোন সময়ে চম্পটী ঠাকুর পরমভক্ত মহানুভব শ্যামানন্দ দাসজীকে শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্মতত্ত্ব বলিয়াছিলেন। শ্রীল শ্যামনন্দ দাসজী ফরিদপুর রাজবাড়ীর ভক্তকুলমণি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধালয়ে বসিয়া গোপীদাস প্রভৃতি ভক্ত সমক্ষে সেই কথা যেরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এই—'পূর্ব্ব দিন রাত্রে ঝড় বৃষ্টি হয়। তাহাতে গঙ্গার জল ফেনা বাঁধে। সেই ফেনার মধ্যে প্রভুর জন্ম বামাদেবী স্নান করিতে গিয়া ঘাটে কুড়াইয়া পাইয়াছেন।'

৩। ঢাকা জেলান্তর্গত জয়পাড়া গ্রাম নিবাসী বন্ধুগত প্রাণ শ্রীযুক্ত মধুসূদন সাহা মহাশয় শ্রীল চম্পটী ঠাকুরের নিকট হইতে জন্ম রহস্য জানিবার জন্য বহুদিন চেষ্টা করিয়াছেন। একদিন তাহাকে কহিয়াছিলেন--'এই যে চোখের সামনে মৃত্যু রহস্যটা দেখলি, এইটাই আগে বুঝে নও না। মধু পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইতে থাকিলে পরে বলিলেন "গঙ্গার জলে পাওয়া গিয়াছে ঐটি সত্য কথা"।

৪। হাওড়া জেলার আন্দুল নিবাসী ভক্তবর ডাক্তার তিনকড়ি ঘোষ মহাশয় জন্ম বৃত্তান্ত জানিবার জন্য বহুসময় চম্পটী ঠাকুরের নিকট অনুনয় বিনয় জানাইয়াছেন। একদিন তাহাকে লিখাইয়া দিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তাহা যথাযথ শ্রীশ্রীবন্ধু বার্ত্তা নামক লীলাগ্রন্থে ৬৩ পৃষ্ঠা হইতে ৬৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে— যথা—জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ্ রাজ্ ডাহাপাড়া প্যালেসের (palace এর) ওপার। রাজধানী ভিন্ন অবতারের জন্ম হয় না। বঙ্গাধিকারী বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ভূম্যাধিকারী। রীতিমত গড় প্রাসাদ; পরিখা পরিবেষ্টিত। দীননাথ ন্যায়রত্ন বঙ্গাধিকারীর দ্বার পণ্ডিত। ন্যায়রত্ন ও তাহার ব্রাহ্মণী ভট্টাচার্য্যদের প্রদত্ত জমিতে বাস করিতেন। ন্যায়রত্নের একটী পৃথক চতুষ্পাঠী ছিল; সে টিপি এখনও বর্ত্তমান। ন্যায়রত্ন ও তাহার ব্রাহ্মণী অন্নপ্রাসন উপলক্ষে বঙ্গাধিকারীর বাটী যান ফিরিয়া আসিয়া দেখেন ঘরের ভিতর অপূর্ব্ব সদ্যোজাত শিশু বর্ত্তমান জ্যোতির্ম্ময় গৃহ, আলোকে উদ্ভাসিত। ন্যায়রত্ন ও ব্রাহ্মণী স্তম্ভিত অবশ্য ব্রাহ্মণীর গর্ভাভাসের লক্ষণ ছিল। লোকে জানিল যে ন্যায়রত্নের ব্রাহ্মণী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে। ন্যায়রত্ন জন্মলগ্ন ঠিকুজী করিয়া রাখেন। এই সময়ে মহারাণী স্বর্ণময়ীর ওখানে একজন সন্ন্যাসী জ্যোতিষী আসেন।

* * * *

ন্যায়রত্ন গঙ্গা পার হইয়া পুনরায় খোকাকে কোলে লইয়া সন্ন্যাসীর নিকট আসিলেন। সন্ন্যাসী খোকাকে বুকের উপর রাখিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ন্যায়রত্ন ভীত হইলেন; বলিলেন আপনি খোকার অকল্যাণ কেন করিতেছেন? সন্ন্যাসী সে কথার উত্তর না দিয়া মাথার উপর খোকার পা দুখানি রাখিলেন ও বলিলেন,—ন্যায়রত্ন, আমি এতদিনে বুঝিলাম যে, নেপাল হইতে সহসা বাঙলায় কেন আসিলাম। এইরূপ ভাগ্য প্রতি অবতারে একজনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। আজ আমার সেই ভাগ্য উপস্থিত। তোমাকে আর আমি কি বলিব? যে পাঁচটী গ্রহের সঞ্চার ও সংযোগে অবতারের জন্ম হয় যেমন শ্রীরামচন্দ্র-লক্ষ্মণ, সেই পাঁচটী গ্রহই ইহার জন্মলগ্নে তুঙ্গস্থ। ইনি দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ হইবেন। ইঁহা হইতে জীব কৃতার্থ হইবে। ইহার পর সেই জ্যোতিষী সন্ন্যাসীকে আর কেহ মুর্শিদাবাদ সহরে দেখে নাই।" উপরোক্ত কথাগুলি উক্ত শ্রীবন্ধুবার্ত্তা গ্রন্থে যেভাবে লিখিত হইয়াছে তাহাতে অনেকে মনে করেন যে এই কথা সবই শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমুখের কথা, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। শ্রীল চম্পটী মহাশয়ই ঐ সকল কথা নিজে বলিয়াছেন। তবে যে, একদিন প্রভু ভট্টাচার্য্যদের বাগানে বসিয়া হাততালি দিয়া চম্পটী মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন,—"অতুল। আয় আজ তোকে আমার জন্মরহস্য বলি" এই বাণীটী ঐ স্থনে উক্তি করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, চম্পটী মহাশয় প্রভুর জন্মতত্ত্ব জানেন এই কথা প্রকাশ করা বই আর কিছু নহে। কেবলমাত্র এই একটী কথাই শ্রীমুখের। অতএব অতুল এই সম্বোধন পদের পূর্ব্বে যে কোটেশন (") চিহ্ন আরম্ভ হইয়াছে, জন্মরহস্য বলি এই পদের পরে সেই কোটেশন শেষ (") করিতে হইবে। নতুবা উক্ত গ্রন্থে যেভাবে আছে অর্থাৎ ইহার পর সেই জ্যোতিষী সন্ন্যাসীকে আর কেহ মুর্শিদাবাদে দেখে নাই এই বাক্যের পর কোটেশন শেষ করিলে ও সবগুলি শ্রীমুখের কথা মনে করিলে, ছয় প্রকারের দোষ হয়। যথা—

১। সেই শ্রীবন্ধুবার্ত্তা গ্রন্থে ঐ বাক্যগুলির একটু উপরেই কথিত হইয়াছে যে, প্রভু মুর্শিদাবাদ ডাহাপাড়া ভট্টাচার্য্যদের বাগানে বেলতলায় বসিয়া এই কথা বলিতেছেন। সেইস্থানে উপবেশন করিয়া জন্মস্থান ডাহাপাড়া প্যালেসের ওপার প্রভৃতি কথা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ সেই টিপি এখনও বর্ত্তমান একথা দশ বার হাত দূরস্থিত বেলতলা উপবেশন করিয়া বলা সম্ভবপর নহে। হাওড়া থাকিয়া চম্পটী ঠাকুরই এইরূপ কথা কহিতে পারেন।

২। একদিন শ্রীশ্রীমুখে কহিয়াছেন যে 'দীনুর স্ত্রীর কখনও গর্ভ হয় নাই।' অতএব অবশ্য ব্রাহ্মণীর গর্ভাভাসের লক্ষণ ছিল, এই কথা প্রভু বলিতেই পারেন না। চম্পটী ঠাকুরও অন্য কোথাও গর্ভের কথা বলেন নাই বরং অন্য কেহ বলিলে রাগে গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছেন। তবে দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া কোথাও বলিলেও বলিতে পারেন।

৩। জ্যোতির্ব্বিদ সন্ন্যাসীর সহিত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কথোপকথনের মধ্যে শ্রীশ্রীপ্রভুকে বহুবার 'খোকা' বলা হইয়াছে ইহা দেখিতে পাই। ওটী নিজ শ্রীমুখের কথা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তবে শ্রীশ্রীপ্রভু অনেক সময় তৃতীয় ব্যক্তির মত (in third person) নিজের কথা না বলিয়াছেন, এমন নহে। কিন্তু সেই সকল কথা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, যখনই তৃতীয় ব্যক্তির

মত কথা বলিয়াছেন, তখনই নিজেকে প্রভু বলিয়াছেন, যথা—"প্রভুর ভার তোমাদের মস্তকে।" অনিষ্ঠায় প্রভুর মৃত্যু," "প্রভুকে যদি মনে কর অন্নভোগ দিও" ক্বচিৎ কখনও নিজেকে 'ফকীর'ও বলিয়াছেন, যথা,—'একালে ওকালে ত্রিকালে নিত্য চিরকাল এই ফকীরের কাছেই থাকিস্।' এ ছাড়া অন্য কোনরূপ বলিয়াছেন এরূপ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এমতাবস্থায় ঐরূপ পুনঃ পুনঃ নিজেকে 'খোকা' বলা শ্রীশ্রীপ্রভুর পক্ষে কদাচ সম্ভব মনে হয় না।

৪। আপন শ্রীমুখে আপন তত্ত্ব কথা শ্রীশ্রীপ্রভু বহুসময়ে বহু ভক্তকে কৃপা করিয়া জানাইয়াছেন বটে, কিন্তু অমুক সাধু বা অমুক সন্ন্যাসী তাঁহার সম্বন্ধে কি বলিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া, তিনি যে একমাত্র প্রভু ইহা কুত্রাপি প্রকাশ করেন নাই। বরং তদ্বিপরীত "প্রভুর পরিচয় প্রভু মাত্র" অন্যে তাঁহার তত্ত্ব জানে না এই কথাই একাধিকবার বলিয়াছেন। সুদীর্ঘকাল মৌনব্রত অবলম্বন করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন পূজনীয়া শ্রীযুক্তা দিগম্বরী দেবীকে বলিয়াছিলেন "আমি যে কে তাহা আমিই জানি, আর কেউ জানে না।" অধিকন্তু যখন 'আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনি বাখানে,' তখন তাহার ভঙ্গিই এক অভিনব প্রকারের। পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। ঐ তত্ত্বটিই নিজ শ্রীহস্তে ভক্তবর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছিলেন—সে লেখার ভঙ্গি দেখুন—"আমি প্রভু জগদ্বন্ধু, ক্ষণে জন্মিয়াছি, আমার জন্মস্থানে পাঁচটী তুঙ্গ আছে, বিশ্বাস না হয় বাজারে যাচাইয়া নেও।" অতএব সন্ন্যাসীর মুখে নিজের তত্ত্ব কি ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীশ্রীপ্রভু নিজে কখনও জানাইয়াছেন এরূপ মনে করি না। ওটী চম্পটী মহাশয় নিজে অন্যভাবে জানিয়া নিজ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র।

৫। শ্রীশ্রীপ্রভুর সমগ্র বাণীসমূহ ও শ্রীলেখনী-প্রসূত গ্রন্থসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা দেখি,—যখন যেস্থানে যতটুকু কথা বলা দরকার তাহা হইতে একটী বর্ণ মাত্রও বৃথা ব্যবহার করেন নাই। ইংরাজী পণ্ডিতদের Brevity is the soul of wit আর সংস্কৃত আচার্য্যদের "মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা" শ্রীশ্রীপ্রভুর কার্য্যে ও বাক্যে সুপরিব্যক্ত। কোনও লীলা-বর্ণনা বা রূপ-বর্ণনা স্থলে স্বতন্ত্র কথা কিন্তু কোন তত্ত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া "অল্পাক্ষরং অসন্দিগ্ধং সারবৎ গূঢ়নির্ণয়ং" অল্প অথচ সার গূঢ় তত্ত্ব পূর্ণ করিয়া বলিয়াছেন। আর প্রমাণ-বাক্যের স্বরূপও তাহাই যে বাক্যটীকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিব, তাহার একটী অর্দ্ধমাত্রাও নিরর্থক থাকিবে না। একথা পূর্ব্বেও কহিয়াছি। জন্মরহস্য বলিতে বসিয়া বঙ্গাধিকারীর বাড়ীর গড় প্রাসাদের কথা বা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীর কথা উল্লেখ করিবার কি উপযোগিতা আছে তাহা অনুমান করিবার মত হেতু খুঁজিয়া পাই না। দেশকাল বিবেচনা করিয়া চম্পটী ঠাকুর ঐকথা বলিতে পারেন, তত্ত্ব ব্যক্ত করিতে বসিয়া ঐরূপ অপ্রাসঙ্গিক কথা শ্রীমুখের উক্তি বলিয়া বিশ্বাস করি না।

৬। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাক্যের প্রামাণ্য অপ্রামাণ্য বিচারে ধর্ম্মই আলোক স্বরূপ। সেই ধর্ম্মের লক্ষণাদিও উল্লেখ করিয়াছি। মহাবতারী বন্ধুর মহাতত্ত্ব বিচারে "মহাধর্ম্ম মহাউদ্ধারণ" ইহাই একমাত্র উজ্জ্বলতম আলো। যে কার্য্য বা বাক্য ঐ আলোকে উদ্ভাসিত তাহাকেই বুকে করিয়া আদর করিব আর যাহা তদ্রূপ নহে তাহা অতি উচ্চ কথা হইলেও আমাদের ক্ষুদ্র ধারণার বাহিরেই রাখিতে বাধ্য হইব।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মকালে দেখি শ্রীদেবকী-বসুদেবের মনের মধ্যে সর্ব্বগুহাশায়ী তিনি পরিপূর্ণরূপে বাস করিতেছেন। আর দেবকীর বাৎসল্য রস পান করিয়া করিয়া বাঁচিয়া আছেন। শ্রীগৌরহরির জন্মকালে দেখিতে পাই তিনি পূর্ণরূপে শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবীর হৃদয়ে পূর্ব্ব হইতেই অধিষ্ঠিত আছেন। ("আমার হৃদয় হ'তে তোমার হৃদয়ে" শ্রীচরিতামৃত) তারপর শুভক্ষণে উভয়ের অঙ্গজ্যোতি অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইলেন। পূর্ব্বাপর লীলায় পিতামাতার প্রত্যেক ব্যবহারে ধর্ম্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের ও ধর্ম্মস্বরূপ উদ্ধারণ অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের তত্ত্ব-মাধুর্য্য পরিব্যক্ত। অতএব প্রমাণরূপে গ্রহণীয়। আর আজ সেই অভিন্ন শচীমাতা বামাদেবী ও অভিন্ন জগন্নাথ দীননাথ এই উভয়ে মিলিয়া যে বঙ্গাধিকারীর বাড়ীতে অন্নপ্রাসনের নিমন্ত্রণ খাইতে গেলেন, ইহাতে মহাধর্ম্ম স্বরূপ মহাউদ্ধারণ প্রভু বন্ধুর কোন্ তত্ত্ব প্রকাশ হইল, যে ঐ কার্য্যটিকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিব? আমরা কথায় কথায় বলি "এক কার্য্যে করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত" তা পাঁচ সাত কার্য্য দূরে থাকুক বাৎসল্যের আধার জনকজননীকে অন্নপ্রাসনের নিমন্ত্রণে পাঠাইয়া দিয়া কর্ত্তা কোন্ কার্য্যটি করিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, কাজেই ঐ কার্য্যকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারি না, কোনও সুধীভক্ত পারিবেন বলিয়া মনে করি না। আমরা বুঝি ঘর না থাকিলে দ্বার শব্দ যেমন নিরর্থক, গুরু না থাকিলে শিষ্য পদটী যেমন অর্থহীন, স্বামী না হইলে ভার্য্যাপদের যেমন কোনও মূল্য থাকে না, তদ্রূপ মূর্ত্ত-বাৎসল্যরস জনকজননী না থাকিলে সেখানে সর্ব্বরসাধার শ্রীহরির পুত্ররূপে প্রকাশ হওয়াও তাৎপর্য্য

বিহীন হইয়া থাকে। রসিক ভক্ত যারা তারা বলেন "রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ"। শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধার সঙ্গে বিরাজ করেন তখনই তিনি মদনমোহন, একা থাকিলে শুধুই মদন। বস্তুতঃ তাহাই। প্রভু যখন একা একা থাকেন তখনই তিনি জগদ্গুরু মহামহা প্রভু শ্রীশ্রীহরি-পুরুষ, আর যখন যশোদার কোলে নবনী ছড়ান, তখনই তিনি "নীলমণি" যখন শচীমাতার ক্রোড়ে হেলিয়া দুলিয়া নাচেন তখনই তিনি 'নিমাই চাঁদ' আর যখন বামাদেবীর অঙ্কে সেই কাঁচা সোনার পুতুল দশদিশি উজল করিয়া হাসির লহরী ছড়াইয়া দিলেন, তখনই তিনি "বামাদুলাল" হইলেন। কাজেই যেদিন যেখান হইতে বামাদেবী নিমন্ত্রণ খাইতে অন্যত্র গিয়াছেন সেই দিন সেইখানে "বামা-দুলাল" উদয় হইয়াছেন, ইহা নয়নহীনের পদ্মলোচন সংজ্ঞার মত নিরর্থক নহে কি? অতএব ওকথা শ্রীমুখোক্ত নহে, চম্পটী ঠাকুর ভঙ্গী করিয়া কহিয়াছেন মাত্র। তবে আমরা যদি আর অন্য কথা না জানিতাম তবে আলাদা কথা হইত। শ্রীশ্রীমুখচন্দ্র বিগলিত অন্য প্রকার বার্ত্তা, চম্পটী মহাশয়ের মুখে শ্রুত অন্য প্রকার কথা, যখন আমরা পাইতেছি ও তাহার সঙ্গে মহেন্দ্রজীর অনুভূতির যখন সৌসাদৃশ্য দেখিতেছি এবং সে তত্ত্বটী যখন সুন্দর সত্য, শাস্ত্রসঙ্গত ও সুযুক্তিপূর্ণ তখন তাহাকে গ্রহণ না করিব কেন? সর্ব্বোপরি কথা, মহাধর্ম্ম মহাউদ্ধারণতত্ত্ব যেখানে সুপারব্যক্ত, তাহা সর্ব্বথা গ্রহণীয় আর ঐ আলোকে যেপথ আলোকিত নয়, তাহাতে আমার মত অন্ধজীবের গতাগতি বিপদসঙ্কুল।

এই প্রকার সমালোচনায় শ্রীল চম্পটী ঠাকুরের কথা উড়িয়া গেল আর লেখকের ও পাঠকের মহা অপরাধ হইল বলিয়া কোনও বান্ধব যদি কাণে হাত দিয়া এই সময় উঠিয়া যান, তবে তাহার চরণ ধরিয়া আর একটি নিবেদন করিব—

শ্রীল চম্পটী ঠাকুর আমাদের মাথার মণি। তিনি প্রকৃতই জন্ম রহস্য তত্ত্ববেত্তা। তাহাকে বাদ দিয়া জন্ম রহস্যের ভাষ্য লিখতে প্রয়াস রামকে বাদ দিয়া রামায়ণ গানের মত উপহাসাস্পদ। কারণ যাঁহার রচিত এই জন্ম রহস্যের ভাষ্য আমি জীবাধম রচনা করিতেছি তিনি নিজে সর্ব্ব প্রথমে "শ্রুত আছি" বলিয়া শ্রীচম্পটী ঠাকুর মহাশয়কেই প্রণাম করিয়াছেন। এমত স্থলে মাদৃশ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট কোন্ সাহসে তাহাকে বাদ দিয়া জন্ম রহস্যের উপরে লেখনী ধরিবে? বস্তুতঃ তাঁহাকে কোনও ক্রমেই বাদ দেওয়া হয় নাই, হইতেই পারে না। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি **"লক্ষণে মানুষ চিনিও, তদ্রূপ ব্যবহার করিও, করাইও"** এই উপদেশটি প্রতিপালন করিবার মত সামর্থ্য একমাত্র চম্পটী মহাশয়েরই ছিল। পক্ষান্তরে, শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমুখের একটী বাণীকে দাড়ি কমা-শুদ্ধ ঠিক ঠিকভাবে বলিবার ও হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ্য তাঁহারই ছিল। কাজেই তাঁহার মুখের বাক্যাবলীকে দুইভাগ করিয়া বুঝিয়াছি। এক ভাগকে মহামহাপ্রমাণ রূপে গ্রহণ করতঃ শ্রীশ্রীপ্রভুর মহাবাণীর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছি। আর এক ভাগকে তিনি দেশকালপাত্র-বিবেচনা করিয়া বলিয়াছেন, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অর্থবাদ রূপে প্রমাণতা স্বীকার করিয়া 'বাক্যভঙ্গি' কহিয়াছি। তবে কোন্ কথাগুলি কোন্ভাগে পড়িবে, তাঁহা কিরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছি, তাহা পুনঃ পুনঃ কহিয়াছি। যে কথায়, মহা-উদ্ধারণ তত্ত্ব প্রস্ফুটিত ও যে কথায় প্রত্যেক বর্ণ সপ্রয়োজন তাহাই শ্রীমুখের মহাবাণী. চম্পটী ঠাকুর তাহার একটি কথাও বদলান নাই, জানিয়া প্রথমভাগে সন্নিবেশ করিয়াছি, আর যাহা সেরূপ নহে, তাহার তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাতে মহামহা অধিকারী চম্পটী ঠাকুরকে অমর্য্যাদা তো করা হয়ই নাই, বরং তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রের সম্যক্ আলোচনা দ্বারা আমাদের আত্মশোধন হইতেছে।

যে কথাটি যেস্থানে যে ভাবে উক্ত হইয়াছে সেই কথাটির প্রমাণতা সেইভাবে লইতে হইবে, তাহাতে অপরাধ তো স্পর্শিবেই না বরং সত্য গ্রহণ হেতু হৃদয় শুদ্ধ হইবে।

শ্রীল চম্পটী ঠাকুর শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্ম রহস্য তত্ত্ব জানিতেন একথা সত্য, পরম সত্য। তবে দেশকাল বুঝিয়া তিনি যে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন একথাও নিঃসন্দেহরূপে সত্য। আবার তিনি যে আসল তত্ত্বটী এ পর্য্যন্ত কাহাকেও লিখিয়া দেন নাই একথাও পরম সত্য, তাহা হইলে কি আর কেহ জিজ্ঞাসা করিলে ঐরূপ গম্ভীর ভাব ধারণ করিতে পারিতেন? অথবা কিযেন একটি রহস্য তিনি জানেন, তাহা যেন বলিবেন না—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন? অমুককে বলিয়াছি বা লিখিয়া দিয়াছি সেখান হইতে জানিয়া লওগে'এই কথা বলিয়াই তো বিরক্তির হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারিতেন।

তবে এখন প্রশ্ন এই যে চম্পটী মহাশয়ের নিকট শ্রীশ্রীপ্রভু যে তত্ত্বটী ব্যক্ত করিয়াছিলেন সেটি কি আমরা আর জানিতে পারিব না? আমরা বলি, কেন পারিব না? নিশ্চয়ই পারিয়াছি? ঐ যে

"যখন বামাদেবী আত্মস্থা হইলেন তখন অমিয় নিমাই গাম্ভীর অশ্রু ও চন্দ্রের সুধা আশ্রয় করতঃ তাহার হৃদয়-সরোজ বিকশিত করিয়া শ্রীহরিপুরুষরূপে আবির্ভূত হইলেন।"

এই কয়টি কথাই জন্ম-রহস্য। ইহাই শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রাণের গুপ্তকথা—শ্রীবেলতলায় চম্পটী ঠাকুরকে ইহাই কহিয়াছেন। ইহাই শ্রীচম্পটী মহাশয়ের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের লুকান-কথা মহেন্দ্রজীর হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া লেখনীতে পরিব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ কেন মনে করিতেছি, তাহারও কারণ বলিব!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চম্পটী মহাশয় এমন লোকই ছিলেন না যে একজন রাম শ্যাম রাস্তায় ঘাটে জিজ্ঞাসা করিলেই বা অন্য কোনও প্রকারে একটু মনস্তুষ্টি করিলেই, তিনি অমনি একটি তত্ত্বরহস্য সেখানে ব্যক্ত করিয়া ফেলিবেন! আর শ্রীহরির লীলাতত্ত্ব আরব্য উপন্যাসের গল্প নহে যে বলিলেই বলা হইল আর শুনিলেই শোনা হইল। আর যাহারা তাঁহার নিকট হইতে ঐ রহস্য জানিতে চাহিতেন হয়ত বা তাহারাও সকলে তাদৃশ অধিকারী ছিলেন না, যে একটি নিগূঢ় তত্ত্বকথা ব্যক্ত হইবামাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলিবেন! একমাত্র মহানামসাধনে যে হৃদয় উর্ব্বর তাহাতেই শ্রীগুরুর অযাচিত কৃপাবলে সিদ্ধান্তের স্ফূরণ হইতে পারে, অন্যত্র নহে। তাই কেবলমাত্র যিনি শ্রীলচম্পটী ঠাকুরকে গুরুবুদ্ধি করিয়া বহু সময় তাঁহার দুর্লভ সঙ্গে বাস করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সর্ব্বপ্রকার গতিবিধি ও ইঙ্গিত ইসারা বুঝিয়া লইতে শিখিয়াছিলেন, শ্রীঅঙ্গনে শ্রীহরি পুরুষের সেবানন্দে মগ্ন থাকা কালে যে অজ্ঞাত কুলশীল ছিন্ন কন্থাধারী বৃন্দাবন প্রত্যাগত যুবককে প্রথম দেখিবামাত্রই স্বরূপদর্শী চম্পটীঠাকুর যেন কত আপনার জনের মত সোল্লাসে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, **"বাবা তুই এসেছিস্ এখন আর আমার মরলে দুঃখ নাই"** সেই শ্রীমন্ মহেন্দ্রজীর সুনির্ম্মল হৃদয়েই চম্পটী ঠাকুরের প্রাণের কথা ইঙ্গিত আভাষের ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত হইয়াছে। নতুবা যে মহেন্দ্রজী শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীপ্রভুর ধরায় শুভাগমনবার্ত্তা জানিয়া, শ্রীঅঙ্গনে ছুটিয়া আসিয়া, সর্ব্বপ্রথম শ্রীল চম্পটীঠাকুরকে প্রভু বন্ধুহরির মর্ম্মীভক্ত জ্ঞানে তৎপ্রতি ঐকান্তিকী গুরুবুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ করেন, সেই মহেন্দ্রজী শ্রীযুত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের কাছে চম্পটীমহাশয়ের কথিত জন্মরহস্য লেখা দেখিয়া কোন্ সাহসে বা কোন্ বলে এমন নির্ভীকচিত্তে ভক্তপ্রবর শ্রীযুত যোগেন্দ্রকুমার সরকার কবিরাজ ও শ্রীমন্ নিত্যসেবক ব্রহ্মচারীর হস্তে মুদ্রণ কার্য্যের সংশোধনের ভার ন্যস্ত করিয়া, "জগদ্গুরু" গ্রন্থের ছাপা কার্য্য শেষ করতঃ, ১৩২৬ সনের জন্মোৎসবের বিপুল ভক্তসঙ্ঘের সমক্ষে উক্ত রহস্য প্রকাশ করিয়াছিলেন!! তারপর কোন্ সাহসেই বা তিনি ঐ মুদ্রিত গ্রন্থ স্বয়ং চম্পটীঠাকুরের হস্তে সংশোধন করিবার জন্য অর্পণ করিয়াছিলেন? আর চম্পটীমহাশয়ই বা কেন অন্যান্য স্থানে এত সংশোধন করিয়া ঐ স্থানে '**আত্মজ**' পদটি দেখিবামাত্র তাহার হৃদয়ের গোপ্য কথা কি করিয়া তাহার অতি গুপ্ত শিষ্য একলব্যের মত হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়াছে ভাবিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন—আর কি জন্যই বা তাহারপর হইতে '**মতিচ্ছন্ন**' না লিখিয়া **মহামতিমান্** বলিয়া সম্বোধন করতঃ পত্রাদি লিখিতেন? কেনই বা 'তুই যে দ্বিতীয় চম্পটি হ'লি' বলিয়া উপহাস করিতেন? পাগলে পাগলে প্রাণে প্রাণে সম্বন্ধ,চোখে চোখে কথা, যাদের খবর তারাই জানে—আমরা মূঢ় জীব যাহা দেখিয়াছি শুনিয়াছি, ব্যক্ত করি মাত্র। শুনিয়াছি শ্রীবৃন্দাবনের গোপীনাথ বাগে যখন দুইটী প্রেমোন্মাদ গোপীনাথের খোঁজে আপনা হারা, তখন কেহ কাহাকেও জানেন না। সে যুবক চলিয়াছিল ব্রজের ধূলায় অঙ্গ ঢাকিয়া কৃষ্ণপ্রেমে টলিতে টলিতে, আর সে হরিবোলা ঠাকুর আসিয়াছিল পিছন দিক হইতে, গভীর নাদে কালিন্দীর কালো জল কাঁপাইয়া—

'বল হরি হরি বোল ভাঙ্গ ভবের হাট।
রাজার উপর হওগে রাজা লাট সাহেবের লাট ॥'

—বলিয়া চির পরিচিতের মত পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়া কোনও পরিচয় না দিয়া, দ্রুতগতিতে অন্যগলিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। এ হেন প্রিয়জনের উপযুক্ত ক্ষেত্রেও তাহার হৃদয়ের কথা সঞ্চারিত না হইলে আর কোথায় হইবে? অধিক বলিতে কি, কেবল শ্রীহরি পুরুষের নহে, শ্রীহরি যতবার ধরায় আসিয়াছেন প্রত্যেক অবতারীর জন্মের যে গূঢ় রহস্য তাহাও ঐ কয়টি কথার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে, ক্রমে তাহা সুপরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। অমিত কৃপাশক্তি ও অসামান্য সাধনশক্তি বলেই চম্পটী ঠাকুরের অপরিসীম স্নেহের পাত্র শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী এই জন্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। মাদৃশ মূঢ় জীব তাহার মর্ম্মগ্রহণে সম্পূর্ণ অক্ষম।

শ্রীগদাধর তত্ত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে প্রেমযোগের গ্রন্থকার যাঁহার ব্যাধি অবস্থার প্রলাপ উক্তিকেও দৈববাণীরূপে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, মহানাম-মালাটি গাথিয়া ভক্তকোকিল কুঞ্জ নিজে কুঞ্জ দ্বারে রহিয়া "ধরহে" বলিয়া যাঁহার হাতে দিয়া প্রাণবন্ধুর গলায় পরাইয়া সুখী হইয়াছে, তাঁহার অনুভূতির মর্ম্মভেদ করিতে সাহসী হওয়াও আমার পক্ষে মহাধৃষ্টতা। তথাপি—

'পক্ষী যেন আকাশের সীমান্ত না পায় টের,
যতদূর সাধ্য উড়ি যায়'

তাই যতদূর সাধ্য উড়িতে প্রয়াস পাইতেছি। এত দেখিয়াও কোনও বান্ধব যদি বলেন যে, সে যাহাই হউক না কেন, চম্পটী মহাশয়ের কথার সঙ্গে ঐ অনুভূতির যখন বিরোধ আছে তখন আমরা কাহাকে রাখি আর কাহাকেই বা ছাড়ি। এই কথার উত্তরে আমার আর বলিবার কি আছে, তবে একটি কথা এই যে "**বিরোধ**" কাহাকে বলে তাহা বুঝিয়া, তবেই বিরোধ আছে,এই কথা বলা সঙ্গত। যখন **একই** প্রশ্নোত্তরে দুই ব্যক্তির দুই প্রকার মতবাদ দৃষ্ট হয়, তখনই এখানে বিরোধ আছে এই কথা বলিতে হয়। চম্পটীঠাকুর কর্ত্তৃক কথিত ঐ বাক্যাবলীতে যে প্রশ্নের উত্তর আছে, ঐ অনুভূতিতে সেই প্রশ্নের উত্তর নহে। প্রশ্ন দুইটি, তার উত্তর দুইরূপ, তাহাতে বিরোধ কিরূপে সম্ভবে? **শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্মকথা কি?** এই প্রশ্নের উত্তর **তিনি অযোনি সম্ভব**। এই উত্তরটি বলিতে গিয়া চম্পটীঠাকুর স্থানাস্থান বিচার করিয়া নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। আর **অযোনি সম্ভব কিরূপে সম্ভব?** এই আর একটি প্রশ্ন। এ প্রশ্ন চম্পটী ঠাকুরের নিকট কেহ কখনও জিজ্ঞাসা করেন নাই তাই তিনি তাহা বলেন নাই।

মাতৃস্তন্যে ক্ষীর থাকিলে কি হইবে শিশু মুখার্পণ করিলে তো ক্ষরণ হইবে? গুরুর হৃদয়ে কত তথ্য থাকে শিষ্য জিজ্ঞাসু হইলে তবে তো জানিতে পারিবে। সব সময় সব বিষয় অযাচিত ভাবে হয় না, আদরাতিশয্যেও হয় না। দ্রোণের যতখানি বিদ্যা একলব্য বা অর্জ্জুন শিখিয়াছিলেন আদরের দুলাল একমাত্র পুত্র অশ্বত্থমা তাহা শিখিয়াছিলেন কি? তাই বলিতেছিলাম, যিনি সতত চাঁদ ধরিতে ফাঁদ পাতিয়া বসিয়াছিলেন, তাহার হৃদয়েই বিদ্যদনুভূতি হইয়াছে, আপনি তেমন ধারা জিজ্ঞাসু ছিলেন না তাই জানিতে পারেন নাই।

এই পরম বস্তুটি তোমার আমার মত ঐ ভাবে জন্মান নাই এই বিশ্বাসটি জন্মাইয়া দিতে চম্পটি ঠাকুর নানাপ্রকার অর্থবাদ ও ভঙ্গি আশ্রয় করিয়াছেন পক্ষান্তরে যুগে যুগেই তিনি ওরূপে আসেন না, ওরূপে না-আসা কিরূপে সম্ভব—তাহারই উত্তর করিয়াছে ঐ বিদ্যদনুভূতি।

ঐ অনুভূতিকে বিদ্যদনুভূতি কহিয়াছি। অনুভূতি দুই রকমের। দিব্য অনুভূতি আর বিদ্যৎ অনুভূতি।

মনে করুন, আপনি কিছুই জানেন না ভালমানুষটীর মত আপন মনে শুইয়া বা বসিয়া আছেন। দৈবাৎ অযাচিত ভাবে শ্রীশ্রীপ্রভু প্রকাশমান হইয়া আপনাকে একটি অভুতপূর্ব্ব তত্ত্ব জানাইলেন বা কিছুই নয়ন গোচর হইল না এক অপূর্ব্ব কণ্ঠ শ্রুতিপথে প্রবেশ করিল। ইহাকে বলে দিব্য অনুভূতি বা দৈববাণী। আর আপনি শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া কত রত্ন তুলিয়াছেন, হঠাৎ একদিন একস্থানে একটি সংশয় উপস্থিত হইল। দিনের পর দিন মাসের পর মাস, কেবল ভাবিতে থাকিলেন, একদিন এক শুভ মুহূর্ত্তে হঠাৎ প্রভু আপনাকে এমন একটা বুদ্ধিযোগ প্রদান করিলেন যে এক নিমিষে সূর্য্যোদয়ে আঁধার বিনাশের মত সকল খট্‌কা মিটিয়া গেল, ইহাকে বলে বিদ্যদনুভূতি। শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্মতত্ত্ব, গ্রন্থকার, দেবীদিগম্বরীর নিকট শুনিয়াছেন। বীর ভক্ত শ্রীযুক্ত বাদলবিশ্বাস মহাশয়ের মুখ হইতে জানিয়াছেন,শ্রীযুত কেদারনাথ, শ্রীমৎনবদ্বীপ দাস,শ্রীল গোপাল মিত্র প্রভৃতি মহা অধিকারী ভক্তজনের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছেন, শ্রীযুত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের নিকট লিখিত শ্রীল চম্পটি ঠাকুরের একটি উক্তিও পাঠ করিয়াছেন। তবু স্থির-সিদ্ধান্ত হয় নাই, তারপর চম্পটি ঠাকুরের দুর্লভ সঙ্গে বাস করিয়া, তাহার ইঙ্গিতজ্ঞ হইয়া উদ্ধারণ মহাউদ্ধারণ গ্রন্থরাজি সম্যক আলোচনা করিয়াছেন। তখন পর্য্যন্ত তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তারপর শ্রীশ্রীধাম বাকচরে শ্রীঅঙ্গনে অবস্থান কালীন একদিন অকস্মাৎ শ্রীশ্রীপ্রভু এমন একটি বুদ্ধিযোগ দান করিলেন যেন সব দর্পণের মত নির্ম্মল হইয়া গেল। নিকটে পণ্ডিত প্রবর হারাণ চন্দ্র ভাগবতভূষণ মহাশয় উপবিষ্ট ছিলেন তাহাকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তিনি লেখনী লইয়া লিখিতে লাগিলেন ;—

"শ্রুত আছি * * * * আবির্ভূত হইলেন।"

এই বিদ্যদনুভূতি মহামহাপ্রমাণ। নিগূঢ় জন্মতত্ত্ব হইতে নিহিত আছে। মহাধর্ম্ম-স্বরূপ মহাউদ্ধারণ প্রভু

বস্তুর মহামহাতত্ত্ব ইহাতে সুব্যক্ত। সুধী মহাজন পরিগৃহীত শাস্ত্র সম্মত সুসিদ্ধান্ত ইহাতে পরিস্ফুট। ইহার প্রত্যেকটি পদ সার্থক, সপ্রয়োজন; তাহা আমার ক্ষুদ্র সাধ্যানুযায়ী প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ক্রমে ঐ 'আত্মস্থ' পদটির নিগূঢ় রস মাধুর্য্য আরও কিঞ্চিৎ আস্বাদন করতঃ উপসংহার করিব। জয় জগবন্ধু। (ক্রমশঃ)

মহাবোধন।

(১)

অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য সিন্ধুর তলদেশে মহাভাবে ভোরা বিনোদিনী।
মহাদশমীর দশা বর-অঙ্গে প্রকটিয়া শবরূপে শু'য়ে সীমন্তিনী ॥
মণিদীপ ম্লান কত অনীকিনী শত শত যুথে যুথে মিলিয়া মিলিয়া।
ঘিরি ঘিরি অবিরাম, গায় সবে হরিনাম চাঁদমুখ হেরিয়া হেরিয়া ॥
বলে "জাগো জাগো রাই' তো বিনা যে কেউ নাই, তোমা ধনে ধনী ছিনু মোরা।
তোমার গরবে মোরা—গোবিন্দে না গণি কিছু, তোমা বিনা শূন্য হেরি ধরা ॥"
তাপ-চন্দ্রা নাম করে, রাই অঙ্গ ঘন নড়ে, প্রাণপাখী ফিরে এল দেহে।
দশমীর স্মৃতি ল'য়ে, পঞ্চ পঞ্চ এক হ'য়ে নবরসে রাই অবগাহে ॥

(২)

সুরধুনী কূলে নাচে কুলনাশা কালাচাঁদ, অকূলের কাণ্ডারী সাজিয়া।
কান্তারূপে অঙ্গ ঢাকি' কাঙ্গালে পতিতে ডাকি', গম্ভীরায় রহে লুকাইয়া ॥
কভু কূর্ম্মাকৃতি ধরে, কভু অস্থি সন্ধি ছিঁড়ে, দ্বাদশ দশার আস্বাদনে।
আনে না দেখিতে পায়, সুধু স্বরূপ রাম রায়, (আর) গোবিন্দ সে কিছু কিছু জানে ॥
"কহিবার যোগ্য নহে, তথাপি বাউলে কহে, কহিলেও কেবা পাতিয়ায়।"
মহাভাবে হেন হয়, লীলা পরিকরে কয়, ঘিরি অঙ্গ কৃষ্ণনাম গায় ॥
স্বরূপ শ্রীরামরায়, প্রেমানন্দে নাম গায়, ভাবের তুফান ব'য়ে যায়।
ভাবনিধি গোরা অঙ্গে, দশা অবসান রঙ্গে, বিপ্রলম্ভ মধুরে খেলায় ॥

(৩)

মিটাতে দশমীর আশ, দ্বাদশীর অভিলাষ, পঞ্চতত্ত্ব একাধারে ল'য়ে;
শ্রীহরিপুরুষ নামে, দেহ গড়ি' হরিনামে, সুধাময় সুধা বরষিয়ে;
প্রলয়-পীড়িত সৃষ্টি, মাঝে দিতে পরিপুষ্টি, পথহারা জীবে পথ দিতে,
অণুপরমাণুদ্বারে স্বরূপাস্বাদন তরে, মহাধর্ম্ম জগতে বিলাতে,

মহাউদ্ধারণ লাগি,' নিজপ্রেমে অনুরাগী, হ'য়ে প্রভু মহা-অবতারী।
আবার লীলায় আসি,' গুপ্তলীলা পরকাশি,' পঙ্গুরঙ্গে বিরাজিলা হরি॥
মহাভাব নিধি বন্ধু, প্রেমদাতা কৃপাসিন্ধু, ব্যাভিচারী দশায় ব্যাধি ভোর।
সপ্তদশবর্ষকাল, নিরজনে মৌনে কাল, কাটাইলা কাটি' তমোঘোর॥
ছাড়ি' সে নির্জ্জন বাস, জগজন অভিলাষ, মিটাতে বাহিরে যবে এল।
অগণন নরনারী, গৃহকাজ পরিহরি, হরি হরি ব'লে ধে'য়ে গেল॥

শ্রীঅঙ্গন রজতলে, গড়াগড়ি দলে দলে, অশ্রুকম্প পুলক পসরা।
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ কেঁদে ভেসে যায়, আনন্দের ছুটিছে ফোয়ারা॥
সকলের প্রাণে আশ, কবে বা মহাপ্রকাশ, জগতে দেখাবে বন্ধুহরি।
ভক্তকণ্ঠে উঠে রোল, 'জয় জগদ্বন্ধু বোল্' 'জয় প্রভু প্রেমদানকারী'॥
মহানামের ধ্বজা ল'য়ে, আচণ্ডাল দ্বারে যেয়ে, মতিচ্ছন্ন ছাড়িল হুঙ্কার।
অপূর্ব্ব ব্রতীর দল, দেখিয়া কলি বিকল, পাষণ্ডেরা করে হাহাকার॥
নিত্যানন্দ গোষ্ঠী হেন, উদ্ধারণ নাচে যেন, মহানামব্রতী সাধু সনে।
মধুর বচন গতি, মধুর কীর্ত্তন নতি, আদর্শ বৈষ্ণব জনে জনে॥
যেথায় পশয়ে তাঁরা, বরষে অমিয়াধারা, নামে প্রেমে উতরোল সবে।
অবিরাম, মহানাম, তাপনাশী শান্তিধাম, পেয়ে ধন্য জীব মনে ভাবে॥

হেনকালে একদিন, ত্রয়োদশ দশালীন, বন্ধু-অঙ্গ খাইল নীলিমা।
হৃৎপিণ্ড ক্রিয়াহীন, প্রাণ মহাপ্রাণে লীন, রাহুগ্রাসে যেন রে চাঁদিমা॥
শ্রীমতীর দশাদশ, স্বীকারি' ছিলা অবশ, দ্বাদশে করিলা উরুভঙ্গ।
মহামৃত্যু ত্রয়োদশে, আস্বাদিবে ব'লে এসে, লীলায় লইলা মৃত্যু রঙ্গ॥
জীব সব শবজ্ঞানে, ধরি যোগপীঠস্থানে, সমাধি করিল নিরমাণ।
লীলাশুক মতিচ্ছন্ন, হ'য়ে শোকে অবসন্ন, তুলি দিলা মহানাম তান॥
তেরশ' আটাশ সনে, কার্ত্তিক দ্বিতীয় দিনে, অবিরাম উঠে মহানাম।
মহেন্দ্রের অনুচর, উদ্ধারণ পরিকর গাইছে কীর্ত্তন নিশিযাম॥
কহিবার যোগ্য নহে, তথাপি পাগলে কহে, "শুন সবে অমৃত সন্তান!
মরে নাই বন্ধু মোর, দশা আস্বাদনে ভোর, মজ্জামাঝে সুপ্ত আছে প্রাণ।
ত্রয়োদশ দশা শেষে, বঁধুয়া উঠিবে হেসে, তারুণ্য অমৃতে করি স্নান॥

লাবণ্য অমৃত অঙ্গে, কারুণ্য অমৃত ভঙ্গে, অপাঙ্গে চাহিবে বঁধু মোর।
সেদিনের আসে রহি, মহাসংকীর্ত্তন গাহি, কাটাইব বিরহের ঘোর॥
এই না বাংলার বুকে শবসাধি কত লোকে কত সিদ্ধি লইছে সাধিয়া।
তারা চায় ইন্দ্রজাল, আপনা বঁধিতে জাল, সাধনায় লইছে খুঁজিয়া॥

এ মহাশবেরে ল'য়ে সিদ্ধির দেশেতে যেয়ে, শব হ'য়ে অমৃত বিলা'ব ।
অপূর্ব্ব শব সাধনা, দেখুক জগত জনা, হৃদয়ের রক্তে লি'খে যাব ॥
হেন দৃঢ়ব্রত ধ'রি, দেহ প্রাণপণ করি; মহানাম মহাযজ্ঞেহোতা ।
শিশুরাজ মতিচ্ছন্ন, মহাবোধনেতে মগ্ন, মহাবোধি লাভে বুদ্ধ যথা ॥
উদ্‌গাতা ব্রহ্মচারী, সর্ব্বভোগ পরিহরি' আসিয়াছে তপশ্চর্য্যে হেথা ।
অর্দ্ধাহারে, অনাহারে, শীততাপ সহ্য ক'রে, রোগ ক্লেশ নিত্য সহি তথা ॥
নামী হ'তে নাম বড়, এ সত্য বুঝাতে দড়, মহাতপ আচারিছে যারা ।
প্রভুর করুণা হবে, মৃত তরু মুঞ্জরিবে, শুষ্ক বৃক্ষ হবে ফুল-ধরা ॥
মৃত্যুর আঁধার কোলে, উঠিবে মাণিক জ্ব'লে, মরণে অমিয়া উথলিবে ।
মহাপ্রকাশের সাজে, মহামহাপ্রভু সেজে, যজ্ঞেশ্বর অবশ্য আসিবে ॥

মহানাম-শুক

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ ।

হাকীট-পতন ।

হাকীট পতন = হ + অকীট + পতন ।

নৃসিংহাবতার হইতে ক্রমশঃ নিম্নদিকে ভক্তির প্রকাশ ও উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। "হতারি গতিদায়কত্ব" তৎপ্রমাণ। বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য যে শ্রীনৃসিংহে বাৎসল্য। শ্রীরামচন্দ্রে বাৎসল্য ও সখ্য এবং শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্য, সখ্য ও মাধুর্য্য—এই মধুর রসত্রয়ের পরাকাষ্ঠা। এই রসত্রয় ব্রজের রস। শ্রীরামের বাৎসল্য হনুমানাদির প্রতি সখ্য বিভীষণ গুহকাদির প্রতি। মাধুর্য্যের পরিপূর্ণতা শ্রীরামে প্রকাশ না পাইয়া প্রচ্ছন্ন থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রকাশ পাইয়াছে অর্থাৎ ব্রজলীলায় প্রকট হইয়াছে। ঋষিচরী গোপীগণ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকারণ্য বাসী ঋষিগণের সম্ভোগবাঞ্ছা কৃষ্ণাবতারে পূরণ করিয়াছেন।

কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা একই রাগময়ী লীলার সূত্র ও ভাষ্য। শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী—এইটি উজ্জ্বল রস। এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমরসে বিভোর হইয়া যখন পাগলপারা হন, তখন সেই রসের নাম উন্নতোজ্জ্বল রস। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় উজ্জ্বল ব্রজরসের অভ্যুন্নতি (অর্থাৎ বিশেষাভিব্যক্তি) ঘটে। এই রসে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ভাসিয়া গেল। উন্নতোজ্জ্বল রস সাধারণের আস্বাদ্য নয়। তাহাদের জন্য জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তি এই চতুষ্টয়ের অনুশীলন আবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দকে একাধারে লইয়া শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুরূপে, সেই ভাবের প্রত্যাহার পূর্ব্বক জীবসমাজকে ধর্ম্মচতুষ্টয় শিক্ষা দিয়া উন্নতোজ্জ্বল রস আস্বাদন করাইতে উদগ্রীব হইলেন। রাগধর্ম্মের বর্ত্তমান বিষামৃত ফল ঘুচাইতে প্রভু দ্বিতীয় কলেবর ধারণ করিলেন। নরসিংহাদির মায়ামানুষরূপে জীবলোকে আবির্ভাবই পতন (অবতরণ)।

নরসিংহে বাৎসল্য-মূর্ত্তি একায়মানা, প্রভু জগদ্বন্ধুতে পঞ্চ রসঘন-মূর্ত্তি একায়মানা—কেবল মধ্যের লীলাক্রমে শ্রীযুগল প্রকাশ যথা—সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ।

"হ" বর্ণের অর্থান্তর চন্দ্র বা আনন্দ এবং "কীট" শব্দে মায়িক জীব।" অকীট" শব্দে অমায়িক চিদ্বস্তু সূচিত হয়। হ + অকীট = আনন্দ + চিন্ময়—আনন্দচিন্ময়রস-বস্তু। এই চিদানন্দ বস্তু, যিনি মায়ামনুষ্যরূপে পতিত বা জীবলোকে অবতীর্ণ তিনিই "হাকীট পতন"। প্রভু যেমনটি লওয়াইলেন, লিখিলাম। জয় জগদ্বন্ধু!

শ্রীকালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর
হাঁসড়া, ঢাকা।

"বন্ধুর রাঙ্গা চরণ চিহ্ন দেখিয়া ধূলায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে বক্ষ পাতিব তাহায়॥"

আঙ্গিনা-স্মৃতি।

মনে পড়ে গো সে সুখ রজনী আঙ্গিনার।
গম্ভীরা রজনী নিদ্রিতা ধরণী
মৃদুমন্দ বায় বহে স্বন্ স্বনি,
গগনের কোলে তারকার সনে,
পূর্ণিমার শশী হাসে গো।

মনে পড়ে গো সে সুখ রজনী আঙ্গিনার।
প্রকৃতি সতী সোহাগের সনে,
বরিয়া লইতে পুরুষ-রতনে,
রহি প্রতীক্ষায় কমনীয় কায়
আবরে জোছনা ব'সে গো।

মনে পড়ে গো সে সুখ রজনী আঙ্গিনার।
বন্ধুরে ঘিরিয়া মহানাম গান,
বান্ধব কণ্ঠ, অমিয়া সমান,
মহামন্ত্র মহা- কল্যাণ নিদান
খোল করতাল সনে গো।

মনে পড়ে গো সে সুখ রজনী আঙ্গিনার।
সেই শুভক্ষণে এই দীনজন,
শ্রীঅঙ্গনরজঃ করি পরশন,
ধন্য করেছিল এ মর জীবন,
সেই স্মৃতি জাগে মনে গো।

মনে পড়ে গো সে সুখ রজনী আঙ্গিনার।
বান্ধব এক আমারে ডাকিল,
বেহাগসুরেতে কীর্ত্তন ধরিল,
সুমধুর তালে মাদল রসালে,
কীর্ত্তন রসে মজিনু গো।

মনে পড়ে গো সে সুখ রজনী আঙ্গিনার।
না জানি কি এক ভাব উপজিল,
বিষয় স্মৃতি সব দূরে গেল,
নব নব ভাব উদয় হ'ল,
আমারে হারায়ে ফেলিনু গো।

মনে পড়ে গো সে সুখ রজনী আঙ্গিনার।
কীর্ত্তনের সনে পদ নাহি চলে,
অলস অবসভাবে দেহ ঢলে,
আর সব ভাবের ভাষা নাহি মিলে,
জয় আঙ্গিনা সুধাধার।
মনে পড়ে গো সে সুখ রজনী আঙ্গিনার।

জয়বন্ধুদাস।
শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুধাম।
ডাহাপাড়া।

জয় জয় ফরিদপুর সঙ্কীর্ত্তন-ময়।
ভাসে জল স্থল বন্ধু প্রেমের বন্যায়॥
এই ত চিন্ময়-ধাম মধুর-অঙ্গন।
জয় বন্ধু ব'লে কুঞ্জে কর রে লুণ্ঠন॥

——•——

"অনন্য গতিরে, সঙ্কীর্ত্তন উদ্ধারণ।"

—(হরিকথা)

"একটি মহানাম সঙ্কীর্ত্তন।"

"মহানামের প্রথম নাম জগদ্বন্ধুনাম।"

"মহানামের শেষনাম হরিনাম।"

"মহানামের মধ্যনাম পুরুষ।"

"অনন্তানন্ত মহানাম মৃদঙ্গে উচ্চারণ করিলে মহা-মাঙ্গল্য হয়।"

—(ত্রিকাল)

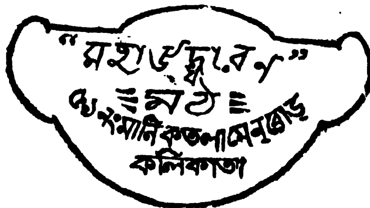


নিয়মাবলী।

১। 'আঙ্গিনা' 'মহাধর্ম্ম মহাউদ্ধারণ' গ্রন্থ। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীনিতাইগৌর ও শ্রীশ্রীহরিপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের মাধুর্য্যময় লীলানুস্মরণই এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য।

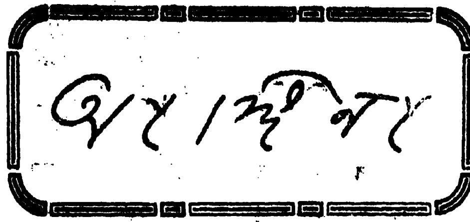
২। বৎসরে চারি সংখ্যায় বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে। বৈশাখী সীতানবমী হইতে বর্ষ আরম্ভ। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৵০ মাত্র। প্রতিসংখ্যা নগদ ।০ চারি আনা মাত্র। প্রবন্ধাদি 'কার্য্যালয়ে' প্রকাশকের নিকট প্রেরিতব্য।

আঙ্গিনা কার্য্যালয়ঃ—



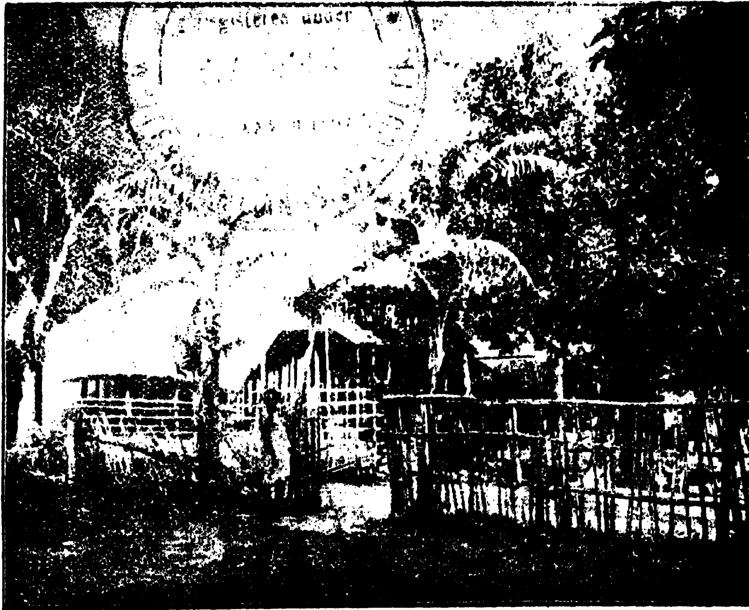
বিনয়াবনত—
গোপীবন্ধু দাস।
প্রকাশক।

ললিত প্রেস—১১৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে [illegible]।





(মহাধর্ম্ম মহাউদ্ধারণ গ্রন্থ)



বান্ধব-দাসানুদাস
মহানামব্রত
সম্পাদিত।

শ্রীশ্রীমহানাম সম্প্রদায় সেবক
গোপীবন্ধুদাস
কর্ত্তৃক—

ফরিদপুর
শ্রীশ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন হইতে প্রকাশিত।
মাঘ, ১৩৩৭

তিথি-পূজা।

আবাহন করি, অবনত শিরে, বসন্ত মাঘী পূর্ণিমা।
শ্রীহরিপ্রিয়া, তিথিচিন্তামণি, বেকত মহতী মহিমা।
কি বিপুলানন্দ, মোহন মাধুরী, ছটায় বিশ্ব ভুলালে।
কি করুণা করি, বর অঙ্গখানি, আপামরে দেখাইলে॥
পুরুষরতন, সবে হেরি কত, সে মহানন্দ লুটিল।
সরোজ হৃদয়, সে প্রভুর প্রভা, মহানামেতে ফুটিল।
ভক্তগণ তব, যশঃ প্রতিষ্ঠা কীর্ত্তনে মজিয়া করিল।
জগদ্বন্ধু হেরি', তিন ভুবনেতে, সুখ অমৃত ছুটিল॥
শ্রীবন্ধু দেখা'য়ে, মহাপ্রকাশের যে অমিয় চাখাইলে।
ওগো মরমী, সে লাগি ভুবনে স্মরণীয় তুমি হইলে॥
কি মহাপুণ্য, আলোক প্রকাশি' পূর্ণিমার শশী দেখা'লে।
করি উন্মত, কীর্ত্তনরত, ভকত সকলে মাতালে॥
মহোদ্ধারণের অমৃত প্রবাহে, তিরপিত কৈলে ধরা।
তোমার দরশে, সে স্বপন জাগি', সবায় পাগল পারা॥
বরণ করিব, নিকট আইস, লয়ে গোপরমদান।
সমাচার তব, চির কীর্ত্তনীয়, ও পাপী পতিত প্রাণ॥
তোমারি কৃপায়, যে মহাভাগ্য, পেয়ে জীব পুনঃ হারাল।
কর হে দান চন্দ্রপুত্র ধন, আশা সিন্ধু নৈলে শুকাল॥
নাহি স্তব জানি, এলে পুনঃ যদি, এনে দাও বন্ধু হরি।
সহচরী সহ, বরেন্দ্র বন্ধুরে, এ বসন্তে লব বরি'॥



পরম শিশু শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর।

"আমি সকলের ছোট
আমাকে শিশু কহে"- বন্ধবাণী

আঙ্গিনা

প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা মাঘ।	শ্রীশ্রীবন্ধু বাসন্তী মহামহোৎসব।	শ্রীশ্রীমাঘীপূর্ণিমা শ্রীশ্রীহরিপুরুষাব্দ—৬০ ১৩৩৭

হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।
চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীট পতন॥
(প্রভু প্রভু প্রভু হে) (অনন্তানন্তময়)

বন্ধুলীলা-সুধানিধিঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

সদা হরে র্নামনি জাত রাগ
স্তৎকীর্ত্তনানন্দ বিলীনচেতাঃ।
স শৈশবেঽপ্যুজ্ঝিত চাপলঃ স্বং
লোকোত্তরত্বং প্রথিতং চকার॥ ১১॥

ন প্রীত্যুদস্থানয়মাদিদেবঃ
কাপি প্রহর্ত্তর্য্যপি কোপমাপ।
বিপ্রান্ত্যজাদি প্রবিভাগ হীনং
প্রেম্নাঽখিলানেব সমালিলিঙ্গ॥ ১২॥

বিদ্যামবিদ্যাব্যপদেশ পদ্যা-
মারোঢ়ু মেকান্ত মিহোপযুক্তাম্।
সংসার ভোগোৎসুক লোকবন্দ্যাং
বিধূয় কৃষ্ণাত্মগতান্তরোঽভূৎ॥ ১৩॥

বিদ্যা ন সা, যত্র ন চিত্তশান্তি
র্নিঃসারভোগেষ্বপি নো বিতৃষ্ণা
কৃষ্ণেচ সর্ব্বাত্মনি নানুরাগঃ
প্রীতিস্তথা নাস্তি সমস্ত জন্তৌ॥ ১৪॥

পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে
শ্রুতেরিয়ং গী র্যমনন্ত শক্তিকম্।
স্বভাবতো বক্তি কুতোঽস্মদাদিবৎ
তদীয় পাঠাদি কৃতি ব্যপেক্ষণম্॥ ১৫॥

শ্রীরাম স্বামী।

সোণার নিশীথ চিন্তা

আজু ডুবু ডুবু সাঁজু তারা দেখি,
ওগো কত কথা মনে হ'তেছে উদয়।
রা রা রা রা রা রা রুণু রুণু রুণু রুণু,
বেণু নুপুর কলহ বিচিত্রতাময়॥
আহা! একদিন ঠিক এইমত রে'তে,
সে মধু জোছনা সিকত সরিত সৈকতে।
প্রিয়া মানসীর কোলে রসঘুম ঢুলে,
দেখেছিনু এক সুস্বপন সুধাময়॥

কল্যাণী কালিন্দী বুকে রাই কানু প্রতিবিম্ব,
ললিতাদি সখীপুঞ্জের বেণী-চুম্ব।
সরলা সাদরে ল'য়ে গেল তথা,
যথা নিভৃত নিকুঞ্জ মহাভাব উগরয়॥
পেখনু সেথা মরি অপরূপ রূপ,
যুগল স্বরূপের কোলে রক্ত অরবিন্দরূপ।
নব নব শ্রীগৌরাঙ্গ ননীরপুতুল,
শিশু শিশু বন্ধু বন্ধু হাসয় নাচয়॥

মহানাম ভিক্ষু মহীন।

"জয় জগদ্বন্ধু"

ভাবের ঠাকুর।

আনন্দরসঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান যখন আনন্দরস বিলাইতে ধরায় অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাহার লীলাখেলা যা কিছু সবই আনন্দে পরিপূর্ণ। লীলাময়ের মুরতি আনন্দে গড়া, পিরিত আনন্দে ভরা, তাঁর হাসিতে আনন্দ ফুটিয়া উঠে, তার বাঁশীতে আনন্দের উৎস ছুটে, তার গমনে বিশ্ব আনন্দে দোলে, তার ভ্রমণে জীব আনন্দে ভোলে, তার সঙ্গে আনন্দের বন্যা, তার প্রসঙ্গে ধরণীধন্যা। আনন্দের রাজা আনন্দমোহন জগদিন্দু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দর স্বয়ং সরস্বতীপতি হইয়াও মহাউদ্ধারণ কল্পে পাঠাভ্যাসছলে কোনও সময়ে পাবনা জেলায় অবস্থান করতঃ পূত প্রেমভক্তির একটানা প্রবাহে অপার্থিব আনন্দের অভূতপূর্ব্ব হিল্লোল তুলিয়া দিয়াছিলেন। যাঁহারা ভাগ্যবান তাহারা তাহাতে অবগাহন করিয়া প্রাণমন শীতল করিয়াছিলেন, আর আজ আমরাও তাহাদেরই মুখ বিগলিত 'অমৃতদ্রবসংযুত' লীলামৃত বিন্দু আস্বাদন করিয়া ধন্য হইব।

বেগবতী কীর্ত্তিনাশিনী পদ্মাবতী যাহার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিতা, যাহার পশ্চিম পার্শ্বে ইছামতী স্বেচ্ছায় তরঙ্গ-রঙ্গে তীর বাজাইয়া তর তর বেগে নাচিতে নাচিতে যাইয়া পদ্মায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে—বঙ্গদেশের সেই ভূমি খণ্ডের নাম পাবনা জেলা। যে স্থান সম্বন্ধে এক সময় নানা কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধু হরি পূজ্যপাদ শ্রী জয়নিতাইকে বলিয়াছিলেন—'এবার প্রেমভক্তিতে শ্রীশ্রীপাবনাধাম সর্ব্বোপরি' বঙ্গজননীর সীমন্তে পূত সিন্দুর বিন্দুর মত সেই পুণ্যধামে, সর্ব্বধামেশ্বর শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুহরি প্রেমের ডালি শিরে লইয়া বিদ্যাভ্যাস ব্যপদেশে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুত প্রসন্নকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের পবিত্র ভবনে পদার্পণ করেন। লাহিড়ী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী সাধ্বী শিরোমণি ভাগ্যবতী গোলোকমণি দেবীর অপ্রাকৃত স্নেহের বন্ধনে বন্ধুহরি চির-বাঁধা ছিলেন। বন্ধু-গোপাল শৈশবে ঐ দিদির অপার্থিব ভ্রাতৃবাৎসল্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, আজ কৈশোরেও

তাঁহার কথা ভুলিতে পারেন নাই, তাই পড়ার ছল করিয়া অই পুণ্য অঙ্কে ছুটিয়া আসিলেন। রত্নগর্ভা পুণ্যবতী গোলোকমণির গর্ভজাত পূজ্যপাদ সুশীল দাদার মুখে শুনিয়াছি একদা বন্ধুহরি, বুঝি বা দিদির ঐ অপরিশোধনীয় স্নেহের ঋণ-শোধ করিতে প্রয়াসী হইয়া, বিধিরুদ্র গোপ্য স্বকীয় স্বরূপ দর্শন করাইয়া ধন্য করিয়াছিলেন।

মূর্ত্তিখানি যাঁহার মনোমোহন, আঁখির চাহনিতে যাঁহার কুসুমবৃষ্টি, মৃদু মধুর বাক্য যাঁহার অমিয় ধারা বর্ষণ করে, তাঁহাকে একটিবার মাত্র দর্শন করিলে, তাঁহার বাক্য সুধালহরী একটীবার মাত্র কর্ণে পৌঁছিলে, তাহার হরিণ-নয়নের দৃষ্টিপথে একটীবার মাত্র পতিত হইলে, ফিরিয়া আসিতে পারে এমন সামর্থ্য কাহারও নাই। পাবনা আসিবার অত্যল্প কাল পর হইতেই কতকগুলি বালক কুসুমগন্ধলুব্ধ মুগ্ধ ভ্রমরের মত ছুটিয়া আসিয়া ঐ পাদপদ্মে অনুরক্ত ও চিরানুগত হইয়াছিলেন। প্রেমময় বন্ধু হরিও সঙ্গীগণ সহ নানারঙ্গের খেলা খেলিতে খেলিতে সংকীর্ত্তনরঙ্গে পাবনা সহরকে নাচাইয়া তুলিয়াছিলেন। তৎকালীন সঙ্গীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাহারা অনেক সময় স্কুলে না গিয়া ও পড়াশুনা উপেক্ষা করিয়া প্রাণবন্ধুর সঙ্গে আনন্দরসে মাতিয়া থাকিতেন। তজ্জন্য অভিভাবকগণ খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। তাহারা ছেলেদিগকে—এমন কি —প্রভুকে পর্য্যন্ত শাসন করিতে ত্রুটি করেন নাই। সেই নিষ্ঠুরগণের শাসনের কথা ভাবিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। হিরণ্যকশিপুর ভাবাপন্ন জীব চিরকালই আছে। সুরাসুরের লড়াই, শ্রেয়ঃ প্রেয়ের দ্বন্দ্ব হইয়াই থাকে। এবারও হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে আশ্চর্য্য এই যে, অত কুটিল ভ্রূকুটি ও অমানুষিক অত্যাচারের মধ্যেও বালকগণ ধীর স্বভাব, আর প্রভুবন্ধু হিমাচলের মত অচল।

আনন্দের খেলা খেলাইবার জন্য সঙ্গীগণ তাহাদের বন্ধুটীকে লইয়া নানারঙ্গ কৌতুক করিতেন। অধিক সময় কীর্ত্তন করিলে প্রভু বন্ধু অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। বালকগণ তখন বলিয়া উঠিতেন—"ভাব হইয়াছে, ভাব হইয়াছে। তখন তাহারা উল্লাসে নৃত্য করতঃ ঘিরিয়া ঘিরিয়া তুমুল কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিতেন। তখন কমলাখির অশ্রুধারে ধরণী পঙ্কিল হইত। পুনঃ পুনঃ কম্প ও ঘর্ম্ম নির্গত হইত। কখনও বা নিষ্পন্দ হইয়া রহিতেন কখনও সর্ব্বশরীরের লোমরাশি ঠিক কণ্টকাকার হইয়া উঠিত। কখনও বা সম্পূর্ণ মরার মত থাকিতেন। বালকগণ ঐ সব অবস্থার দিক বেশী লক্ষ্য করিতেন না, বা তেমন একটা ভীত হইতেন না, কারণ তাহাদের জানা ছিল, জগদ্বন্ধুর ভাব হইলে কীর্ত্তন করিলেই প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকেন।

একদিন সহরের একটিস্থানে একটি বিখ্যাত যাত্রার দলের প্রহ্লাদ চরিত্র অভিনয় হইতেছিল। বালকগণের স্নেহের আব্দারের কাছে প্রভু বন্ধু অনেকসময়ই পরাজয় স্বীকার করিতেন। সঙ্গীগণের আগ্রহাতিশয্যে রঙ্গলাল বন্ধুহরি তাহাদের সঙ্গে যাত্রার আসরে গিয়া উপবেশন করিলেন। অভিনয় তখন কতকদূর হইয়া গিয়াছে। রঙ্গমঞ্চে তরবারি হস্তে তিনজন ঘাতক। দুইজন প্রহ্লাদকে ধরিয়াছে ও আর একজন প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে। প্রহ্লাদ তখন গললগ্নীকৃত বাস হইয়া হাতদুটি যুক্ত করতঃ ধ্যানস্তিমিত লোচনে গান ধরিলেন,—

"আর কবে দেখা পাব যুগলরূপ একাসনে"

ঘাতকের ঐ লোমহর্ষণ দৃশ্য দর্শন ও ভক্তের ঐ করুণ রাগিণী শ্রবণ করিবামাত্রই ভাবের ঠাকুর ভক্ত ভাবে বিভোর হইয়া সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় পড়িয়া গেলেন। সঙ্গীগণ সকলে বন্ধুকে ঘিরিয়াই বসিয়াছিলেন—ঐ অবস্থা দেখামাত্রই তাহাদের আর বুঝিতে বাকি রহিল না। তাহারা তৎক্ষণাৎ ঐ ভাবাচ্ছন্ন অবশ বপু বহন করতঃ যাত্রাগানের আসর হইতে অনতিদূরে ভূমিতলে রক্ষা করিলেন, ও খোল করতাল সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অগত্যা হাতে তালি দিয়া চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করতঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পরে বন্ধু সুন্দর প্রকৃতিস্থ হইলেন। সঙ্গীগণ তখন তাহাকে লাহিড়ীবাড়ীর দরজায় পৌঁছাইয়া দিলেন। এমন ভাবের মানুষ লইয়া আর যাত্রা শুনিতে যাইব না, বলাবলি করিতে করিতে বন্ধুগতপ্রাণ বালকগণ স্বস্বগৃহে গমন করিলেন। তখন গভীর নিশি অতীত প্রায়। দেবী গোলোকমণি এতক্ষণ দরজা খুলিয়া পথের পানে তাকাইয়া ছিলেন—এতক্ষণ পরে অঞ্চলের ধন সম্মুখে পাইয়া পরমাদরে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া শিরাঘ্রাণ করিলেন। ধন্য দেবী, গোলোকের ধনে তোমরাই অধিকারী।

প্রত্যহই প্রভু বন্ধু অতি প্রত্যুষে ইচ্ছামতী নীরে অবগাহন

করিতেন। জনমানব কেহই তাহা টের পাইত না। আজ দিদি জগতকে অত সকালে শয্যাত্যাগ করিতে দেন নাই। প্রভুর নিত্য নিয়মের ব্যতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও ছিল না—তবে যেখানে প্রেমের দাবী সেখানে প্রেমময় অজ্ঞ শিশুর মত।

সূর্য্যোদয় হইয়া গিয়াছে, সোণালী ময়ূখমালা ছুটিয়া আসিয়া ইছামতীর বীচিমালাকে চুম্বন করিতেছে, এমন সময় কনককেতকী কুসুমসন্নিভ কান্তিরাশি বিস্তার করিয়া মনমোহিয়া বন্ধুহরি মরাল গমনে ইছামতী নীরে অবতরণ করিতেছেন ঘাটে তখন বহু নরনারী স্ব স্ব প্রাতঃকৃত্যাদি কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। চির স্বতন্ত্রতাপ্রিয় ভাবের ঠাকুর, তাই ঘাট ছাড়িয়া অঘাটে স্নান করিতেছেন। নদীর পরিসর খুব বেশী নহে। ওপারেই পল্লী। বন্ধু আমার আপনমনে স্নান করিতেছেন। কখনও ঢল ঢল নয়নে আকাশ পানে তাকাইয়া কি যেন এক হারানিধি খুঁজিতেছেন কখনও বা চকিতের মত আনমনা চিত্তে চারু অঙ্গ সংমার্জ্জন করিতেছেন। এমন সময় ঐ পল্লী হইতে কে গান ধরিল—

"আর কবে দেখা পাব যুগল রূপ একাসনে"

যাই শোনা, অমনি স্তম্ভের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইলেন, দেখিতে দেখিতে সোণার অঙ্গখানি বিবর্ণ হইয়া গেল, প্রাণহীন দেহের মত জলের মধ্যে ঢলিয়া পড়িলেন। ঘাটস্থ সকল লোকেই যুগপৎ কি হ'ল কি হ'ল বলিয়া ধরাধরি করিয়া ঐ আবিষ্ট দেহ তীরে উত্তোলন করিলেন। কেহ বলিল মৃগীর ব্যরাম আছে তাই জল দেখিয়া আতঙ্ক হইয়াছে কেহ বলিল বোধ হয় মস্তিষ্কের কোন প্রকার ব্যাধি থাকিবে। কেহ বলিল, না গো বেশ ভাল মানুষটির মত স্নান করিতেছিল, হঠাৎ ওপার হইতে একটা গান শুনিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঢলিয়া পড়িল। ঘাটে কোলাহল শুনিয়া বহুলোক জড় হইল। তন্মধ্যে বন্ধুহরির সঙ্গীদের মধ্যেও দু একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারা তো অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন—জগদ্বন্ধুর ভাব হইয়াছে। তখন তাহারা অন্যান্য সঙ্গীগণকে সংবাদ দিয়া খোল করতাল সংগ্রহ করতঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। কয়েক ঘণ্টা কীর্ত্তন করিবার পর ভাবময় নয়ন খুলিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে সঙ্গীগণ তাহাদের রঙ্গীয়া বন্ধুটীর মধ্যে আর এক নব ভাবের উদয় দেখিতে পাইলেন। বন্ধুহরি নিজ মুখে 'রাধা' শব্দটী উচ্চারণ করেন না। অন্য কেহ উচ্চারণ করিলে তাহা শোনেন না। যেখানে রাধানাম বলিবার প্রয়োজন হয় সেখানে 'শ্রীমতি' বা বৃষভানু নন্দিনী অথবা 'অমুক' বলিয়া বুঝাইয়া দিতেন। একদিন দেহি পদ পল্লব মুদারম্, বলিয়া যার পাদপদ্মে করকুবলয় অর্পণ করিয়াছিলেন,একদিন বহুবার রা রা বলিয়া যার নামের আদ্য অক্ষর উচ্চারণ করিয়া 'ধা' বলার সঙ্গে সঙ্গে ধূলায় ধুসরিত হইয়াছিলেন, আজ কি জানি কোন মহাভাবসিন্ধু নীরে নিমজ্জিত হইয়া সেই নামটী মুখে উচ্চারণই করিতে পারিতেছেন না। যমুনার কুলে চাঁদ অধরে মুরলী ধরিয়া রাধা রাধা রবে অনেক ডাকিয়াছেন—সুরধুনী কূলে খঞ্জন গমনে চলিতে চলিতে হেমদণ্ড ভুজ দুটি উর্দ্ধে তুলিয়া ললিত রাগে রাধা বলিয়া অঝোরে ঝুরিয়াছেন—আজ পদ্মার কূলে আসিয়াই সেই অপ্রাকৃত প্রেম বারিধি এমনই অতলস্পর্শী এমনই গম্ভীর হইয়া উঠিল যে শুধু নীরবতার রাগিণীতে আর বিহ্বলতার মূর্চ্ছনাতেই ভাবের ঠাকুর সে প্রেম মাধুরীর মধু গীতি গাহিতে লাগিলেন। অতর্কিত ভাবে কখনও কেহ তাহার সম্মুখে রাধা শব্দটি উচ্চারণ করিলেই যেন কেমন হইয়া পড়িতেন। অতি কষ্টে ভাবরাশি সম্বরণ করিয়া ভাবের ঠাকুর যে কোন ভাবে সে স্থান পরিত্যাগ করিতেন।

পাবনা সহরের সঙ্গীগণ তখন অনেক সময় বন্ধুহরিকে 'রাধা' নাম শুনাইয়া কৌতুক করিতেন। কখনও বা হঠাৎ রাধা রাধা বলিয়া ধ্বনি করিয়া গিয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত হইতেন। প্রভুও অমনি অস্থির হইয়া উঠিতেন, যেদিকে পথ পাইতেন বিদ্যুৎবেগে সেইদিকে ছুটিয়া পালাইতেন কোনও সময় কোনও ভক্তকে বলিয়াছিলেন—"শ্রীমতীর কথা শোন্‌বার এখনও তোদের উপযুক্ত সময় হয় নাই, যদি সেই বৃষভানুনন্দিনার কথা বল্‌তে আরম্ভ করি, তবে তোরা এই মুহূর্ত্তেই গলে জল হ'য়ে যাবি। তোদের আর অস্তিত্ব থাক্‌বে না, অগ্রে শক্তি হোক্ পরে শুন্‌বি।"

একদিন সঙ্গীগণ সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন যে প্রভুকে এমন এক জায়গায় নিয়া তাহার নিকট রাধে রাধে বলিতে হইবে, যাহাতে সে দৌড়িয়া না পালাইতে পারে। সকলে এইরূপ মনস্থ করিয়া একখানি নৌকা ঠিক করিয়া বন্ধু সুন্দরকে বলিলেন—চল, আজ আমরা পদ্মায় নৌকায়

বেড়াইব। বিশ্ববিৎ সব জানিয়াও শিশু, ভক্তবৎসল ভক্তের হাতের খেলনা।

আষাঢ় মাস। বর্ষার প্রারম্ভে খরস্রোতা পদ্মা তখন ভীষণতর হইয়াছে। উদাস প্রাণে আপন মনে অতি বেগে তরঙ্গ রঙ্গে নাচিতে নাচিতে সে কার উদ্দেশ্যে যেন অনন্ত সাগর পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। তীরে তীরে কাহাকে যেন খুঁজিয়া মাথা কুটিয়া তীর ভাঙ্গিয়া হতাশের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ফেন উদ্গীরণ করিতেছে। সুর্য্যদেব সমস্ত দিনের কিরণ দানে পরিশ্রান্ত হইয়া হিমাঙ্গে পশ্চিম গগণে ঢলিয়া পড়িতেছেন। এমন সময় বাজিতপুর ঘাট হইতে অনতি-বৃহৎ একখানি নৌকায় কয়েকটি কিশোর বয়স্ক বালক পদ্মার মাঝখানে ভাসিয়া ভাসিয়া নৌকা খেলা করিতেছেন। নৌকার ঠিক মাঝখানে একটি রসের মানুষ তার ভাবেগড়া অঙ্গখানিকে মুক্ত বাতাসে উন্মুক্ত করিয়া ঢল ঢল নেত্রে রক্তাভ দিনমণির দিকে তাকাইতেছেন। শ্রীঅঙ্গের অপ্রাকৃত পদ্মগন্ধ অপহরণ করিয়া পবনদেব প্রেম পুলকিতা পদ্মার কাণে প্রাণ দয়িতের আগমন বার্ত্তা জানাইতেছে, ব্যাকুল হৃদয়া পদ্মা তরঙ্গচ্ছলে মুখটী বাড়াইয়া ঐ চরণ চুম্বন করিতে চাহিতেছে। এমন সময় সঙ্গীগণ পরস্পর চোক ঠারাঠারি করিয়া সমকণ্ঠে রাধে রাধে রাধে রাধে বলিয়া উঠিলেন। ঐ ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই ঝুপ করিয়া একটি শব্দ হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা দেখিলেন নৌকায় প্রভু নাই। সকলেই হরিষে বিষাদ গণিলেন। দেখিতে দেখিতে সকলের মুখ কালি হইয়া গেল, তাহারা যে কি অন্যায় করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া সকলেই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কেহ হায় হায় করিতে লাগিলেন। কেহ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন কোথাও ভাসিয়া ওঠেন কিনা। কেহ বলিলেন—জগদ্বন্ধু সাতার জানে না হয়ত আর উঠিতেই পারিবে না—কেহ বলিলেন, যে কুম্ভীরের উপদ্রব এতক্ষণও কি আর সে আছে? কেহ বলিলেন, জগত আমাদের মত মানুষ নয়, অনেক সময় তাহাকে পদ্মাসন করিয়া জলে ভাসিতে দেখিয়াছি, সে কি আর ইচ্ছা করিলে উঠিতে পারিবে না? সকলে দাঁড় টানা পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্ণ মনে কেবল চতুর্দ্দিকে তাকাইতে লাগিলেন। নানাপ্রকার অমঙ্গল চিন্তায় তাহাদের হৃদয় তোলপাড় হইতে লাগিল। মাঝি হাল ধরিয়া শঙ্কিত মনে বসিয়া থাকিল। পদ্মা নিজ ইচ্ছা মত নৌকাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বাজিতপুর হইতে শীতলাইর জমিদার বাড়ী অনেক দূরে অবস্থিত। নৌকা যখন ভাসিতে ভাসিতে ঐ জমিদার বাড়ীর নিকটে তীরবর্ত্তী হইয়াছে তখন একজন পরম আনন্দে ঐ ঐ বলিয়া হাত তালি দিয়া নাচিয়া উঠিল ঐ দেখ কুলগাছের নীচে বসিয়া রহিয়াছে। সোৎসুকভাবে সবাই সেইদিকে তাকাইয়া দেখেন যে, প্রভুর পরিধানে কোন বস্ত্র নাই, দিগম্বর হইয়া কুলগাছের তলায় বুকহাটু বসিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছেন। তখন সবাই নৌকা হইতে অবতরণ করতঃ মাঝিকে বিদায় দিয়া হারানিধি বন্ধুহরির নিকটে যাইয়া পরমানন্দে হাস্য পরিহাস করিতে আরম্ভ করিলেন। বন্ধুকে উলঙ্গ দেখিয়া সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন, কারণ সকলেরই জানাছিল জগদ্বন্ধু কাহারও কাপড় পরেন না। তখন সঙ্গীগণের মধ্যে একজন উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে দৌড়িলেন। তাহার বাড়ী ঐস্থান হইতে অনতিদূরেই ছিল। বাড়ী গিয়া তিনি বাক্স খুলিয়া নূতন বস্ত্রখানি লইয়া ছুটিয়া আসিলেন। বন্ধু হরিকে কাপড় দিতে চাহিলে তিনি কোন কথা বলিলেন না; হাত তালি দিয়া কীর্ত্তন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। সঙ্গীটি তখন আদরাতিশয্যে নিজেই কাপড়খানি পরাইয়া দিলেন। বন্ধু হাসিতে থাকিলেন। প্রভু তাহার প্রদত্ত কাপড়খানি গ্রহণ করিলেন ভাবিয়া তিনি পরমসুখ অনুভব করতঃ কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। সবাই কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুকে লইয়া সহরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ সংকীর্ত্তন রঙ্গে মাতিয়া তারপর যে যার বাসায় চলিয়া গেলেন। এইরূপে নানাভাবে ভাবের ঠাকুর জগদ্বন্ধু সুন্দর আনন্দের খেলা খেলাইতে খেলাইতে আনন্দের কাঙ্গাল জীবকে আনন্দ দান করিতে লাগিলেন। জয় জয় ভাবের ঠাকুর। জয় তোমার মহাভাবময় মহাউদ্ধারণ লীলা।

গোপীবন্ধু দাস।

জন্মরহস্য

শ্রীমহানাম মধুভাষ্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

শ্রীহরির জন্মের রহস্য এই, যে তিনি কখনও এই জন্ম-জরাময় জগতে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না. কেবল প্রকাশিত হয়েন মাত্র। এই জন্যই শ্রীগীতাতে স্বকীয় জন্মকে পার্থিব না বলিয়া দিব্য বলিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীল বৃন্দাবন দাসঠাকুর জানাইয়াছেন—

"এসব লীলার কভো নাহি পরিচ্ছেদ,
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ ॥"

অর্থাৎ আবির্ভাব তিরোভাব উক্তিমাত্র, যথার্থ নহে।

তিনি প্রকাশিত বা প্রকট হয়েন, কখন? যখন ভক্ত তাঁহাকে ডাকে। আকুল হৃদয়ে ব্যাকুল প্রাণে অনন্যমনা হইয়া ঐকান্তিক ভাবে ভক্ত যখন কাঁদে—এক কথায় ভক্ত যখন আত্মস্থ হয়। দাস্য সখ্যাদি রসের ভক্ত যখন ঐ ঐ রসের অতল তলে নিমগ্ন হয়, তখনই শ্রীহরি তাহার সম্মুখে প্রকট হইয়া থাকেন। ভক্ত যখন দাস্য ভাবে কাঁদে, তিনি তখন প্রভু হইয়া আসেন,—ভক্ত যখন সখ্যরসে গলাটি ধরিতে চায়, তিনি তখন প্রাণসখা হইয়া আসেন, ভক্ত যখন কান্তাভাবে প্রাণনাথ বলিয়া বাহু প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করিতে চায়, তখন তিনি হৃদয়-স্বামী হইয়া আসেন, যখন ভক্ত বাৎসল্যে অধীর হইয়া 'আয় রে যাদু' বলিয়া কোলে তুলিয়া লইতে চায়, অনন্তানন্তময় ভগবান তখন পুত্র হইয়া তাহার স্তন্য পান করেন। ইহাই জন্মরহস্য। কাহারও গর্ভ হইতে বাহির হইয়া তিনি পুত্র হয়েন না। তাহা হইলে স্ফটিক-স্তম্ভকেও পিতা বলা যাইত, পরীক্ষিৎ রক্ষার্থ উত্তরার গর্ভ প্রবিষ্ট ভগবানের উত্তরাই মাতা হইত। শ্রীশ্রীপ্রভুর সহিত কাহারও কোন মায়িক সম্বন্ধ নাই, থাকা সম্ভব নহে। প্রেম প্রীতির সম্বন্ধ ছাড়া জীবে ও ভগবানে কোন সম্বন্ধ নাই, ছিলনা, কোনও কালেই থাকিবে না।

ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে ॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভক্ত ছাড়া কৃষ্ণের আর কেহ নাই। এই মায়িক জগতে যে সম্বন্ধে সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া আমরা পিতামাতা দাদা, কাকা, বলিয়া একে অন্যকে ডাকি, জানি ও প্রীতি করি; শ্রীশ্রীপ্রভু সম্বন্ধে কুত্রাপি তাহা নহে। যাজ্ঞিক পত্নীগণের সঙ্গে কৃষ্ণ বলরামের কোন্ সম্বন্ধ ছিল যে তাহারা পুত্রভাবে অন্নদান করিয়াছিলেন? শচীদেবীর সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুর কোন্ সম্বন্ধ ছিল? কি হেতুই বা "জননী বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে" এই কথা শচীদেবী কহিয়াছিলেন? কি হেতু "অন্নদেহ মাতা মোরে বড় ক্ষুধা করে" বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ শচী মাতার নিকট অন্ন চাহিয়া ছিলেন? শ্রীবাস ঘরণী মালিনীর সঙ্গে শ্রীগৌর নিত্যানন্দের কোন্ সম্বন্ধ ছিল যে "পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়" এই কথা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণনা করিয়াছেন? ভক্তবর কেদার শীলের সঙ্গে প্রভু বন্ধুর কোন্ সম্বন্ধ ছিল যে তাহাকে তিনি কাঁহা (কাকা) বলিয়া সম্বোধন করিতেন? ভক্তকুলমণি গোপালমিত্রের সঙ্গেই বা তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল যে তাহাকে "জ্যেঠা" বলিয়া আদর করিতেন? ঐ শুনুন জ্যেঠা মহাশয় ভক্তিগদগদকণ্ঠে কি গাহিয়াছেন—

"ভক্ত লাগি প্রভু সহেন কত তাপ ;
আদরে কারে বা বলেন খুড়ো বাপ।
আবার অভক্ত পাষণ্ড, তাওনা করে দণ্ড ;
"জ্যেঠা" বলে তারে বাড়ান সম্মানে ॥"

ভক্ত, ভক্তি, ভগবান, এই তিন লইয়াই যত লীলাখেলা ও আনন্দের মেলা। আবার অধিক কি বলিব, শ্রীমুখে একদিন কহিয়াছেন—

"প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহুদূর ॥"

অতএব কাহারও গর্ভে প্রবেশ করিয়া ভগবান তাহার সহিত মাতা পুত্র সম্বন্ধ করেন ইহা অতি অশাস্ত্রীয় কথা।

শ্রীভগবান, শান্তভক্ত নারদাদির যেমন প্রেমের বিষয়, দাসভক্ত হনুমানাদিরও তেমনি, সখা-ভক্ত শ্রীদামাদিরও তেমনি বাৎসল-রসের ভক্ত নন্দ যশোমতীরও ঠিক তেমনই প্রেমের বিষয়; জগন্নাথ শচীদেবীরও ঠিক তেমনই, দীননাথ বামাদেবীরও ঠিক তেমনই প্রেমের বিষয়। তবে কি বাৎসল্য প্রেম হৃদয়ে থাকিলেই তাহাকে আমরা পিতামাতা বলিয়া জানিব? না, তাহা নহে। তদ্রূপ হইলে উপানন্দ, কৃত্তিকা, ধনিষ্ঠা, অদ্বৈতগৃহিণী, সীতাদেবী সকলকেই মাতা পিতা বলিতে পারিতাম, গোলোকমণি দেবী, রাসমণি দেবী বা দিগম্বরী দেবী প্রভৃতি যাঁহারা সন্তান স্নেহে পালন করিয়াছেন, তাহাদিগকেই মাতা বলিতে পারিতাম, অথবা যে দুঃখীরাম ঘোষকে প্রভু নন্দ ঘোষ বলিয়াছিলেন তাহাকে বা চন্দননগর নিবাসী ডাক্তার দয়ালচন্দ্র ঘোষ বা শ্রীরামবাগানের পীতাম্বর বাবাজী যাঁহাদিগকে প্রভু 'তাত' সম্বোধন করিয়াছিলেন তাহাদিগকেই পিতা বলিতাম। এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ গ্রন্থে শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত শুনুন। যেরূপ বাৎসল্য প্রেম ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণে পুত্রভাব সম্ভব হয় না, নন্দ যশোমতীর হৃদয়ে সেই প্রেম প্রচুর, আমরা আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলি—জগন্নাথ শচীদেবীর সেই রূপ প্রেম প্রচুরতর মধুরতর, দীননাথ বামাদেবীর হৃদয়ে সেইরূপ প্রেম আরও গাঢ়তর আরও ঘনীভূত, প্রচুরতম, মধুরতম। এইজন শ্রীব্রজমণ্ডলের ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীব্রজরাজ দম্পতীকেই আমরা পিতামাতা বলি, এই জন্য শ্রীগৌড়মণ্ডলের ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীমিশ্র দম্পতীতেই আমরা পিতৃত্ব, মাতৃত্ব আরোপ করি এই জন্যই আজ শ্রীশ্রীবন্ধু মহামণ্ডলের ভক্তকুলের মধ্যে আমরা শ্রীন্যায়রত্ন দম্পতীকেই পিতামাতা বলিয়া মনে করিতেছি। তবে গোলোকমণি দেবী, দিগম্বরী দেবী, দুঃখীরাম ঘোষ, পীতাম্বর বাবাজী, দয়াল ঘোষ প্রভৃতি ভক্ত-বৃন্দের যার যেমন অধিকার যার বাৎসল্য প্রেম যেমন ঘনীভূত শ্রীশ্রীপ্রভু তাহাকে তদনুযায়ী আদর আব্দার করিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, ও ভালবাসিতে অধিকার দিয়াছেন। এখন কথা এই, যে দেবকী শচীমাতা প্রভৃতি জননীগণ যখন সর্ব্বদাই ঐ বাৎসল্য ঘন রসের ভক্ত, এবং ভগবান তাহাদের প্রেমেই আকৃষ্ট হইয়া অঙ্কদেশে প্রকট হইয়াছেন তখন কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহার প্রকাশ হইল কেন, যে কোন সময়ই তো হইতে পারিত। ইহার উত্তর এই, "যখন আত্মস্থা হইলেন তখন আবির্ভূত হইলেন"। ভক্ত সর্ব্বদা ভক্তিতে গদগদ থাকে তাই বলিয়া ভগবান সর্ব্বদাই তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়েন না। শ্রীমুখেই কহিয়াছেন'ভক্তের হৃদয়ে মোর সতত বিশ্রাম' তিনি সর্ব্বদা ভক্ত হৃদয়ে বাস করেন। যখনই ভক্ত আত্মস্থ হয়, তখনই হৃদয় সরোজ বিকসিত করিয়া বাহিরে আবির্ভূত হয়েন। বাৎসল্য রস ঘনমূর্ত্তি জননীর সম্মুখে যখন ঐভাবে প্রকাশমান হয়েন তখনই আমরা ভগবান জন্মিলেন এই কথা বলি। ইহাকেই বলে জন্ম রহস্য। "যখন আত্মস্থা হইলেন তখন হৃদয়সরোজ বিকশিত করিয়া আবির্ভূত হন" এই বাক্য কয়েকটির মধ্যে ঐ রহস্য সম্পূর্ণরূপে নিহিত আছে। এইজন্য মহাধর্ম্ম মহাউদ্ধারণ তত্ত্ববিচারে ঐ কয়টি কথাকে মহা মহাপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছি। এই রহস্য প্রকাশ যে আজই একেবারে নূতন হইল তাহা নহে, তবে এইরূপ সরল সুন্দর ভাষায় সম্পূর্ণ তত্ত্বটি প্রকাশ এই নূতন বটে। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীলঘুভাগবতামৃত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে কেবলমাত্র ইঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়াছে। সে সব কথা পূর্ব্বে একবার আলোচনা করিলেও আবার লিখিতে বাধ্য হইলাম। ভক্তগণ পুনরুক্তিকে দোষ মনে করিবেন না। লীলাময়ের ঐ লীলা মাধুরী যতবার আস্বাদন করা যায় ততই মধু উঠে। একই লীলাতত্ত্ব নিত্য স্মরণ করিয়া ভক্ত নিত্য নূতন তথ্য আহরণ করে, তাহাতে পুনরুক্তি দোষ হয় না। মাদৃশ ভজনবিমুখ জীব তাদৃশ আস্বাদনের অধিকারী না হইলেও গর্দ্দভ কর্ত্তৃক আনীত শর্করা দ্বারা যদ্রূপ মহাজনের ও ক্রেতা বিক্রেতার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তদ্রূপ কোন ভক্তের কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দের কারণ হইলে কৃত-কৃতার্থ হইব।

শ্রীমদ্ভাগবতকার প্রথমতঃ বসুদেবের কথা লিখিয়াছেন যে, প্রথমতঃ শ্রীভগবান তাহার মনে প্রবেশ করিলেন। (আবিবেশ অংশ ভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ) তার পর তৎকর্ত্তৃক বেদ দীক্ষা দ্বারা অর্পিত হইয়া দেবকীর মনে প্রবেশ করিলেন। দেবকী তাঁহাকে মন দ্বারাই ধারণ করিলেন। (দধার মনস্তঃ)। ভক্তগণ উপরোক্ত বাক্য ভঙ্গি অনুধাবন করুন, বুঝিবেন ভগবান মনে প্রবেশ করিলেন—ইহা শ্রীশুকদেব কৌতুক করিয়া বলিয়াছেন। আমরা একটু বিপরীত করিয়া তত্ত্বটী আস্বাদন করিয়া লইব। ভগবান গিয়া মনে প্রবেশ করিলেন অর্থাৎ তাহাদের মন গিয়া

শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিল। আগে বসুদেবের মন শ্রীকৃষ্ণেতে থাকিল, তারপর তাহার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে শুনিতে দেবকীও কৃষ্ণপ্রাণা হইলেন। শ্রীরূপ লঘুভাগবতামৃতেও এই কথাই জানাইয়াছেন। তার পর সেই মনঃ প্রবিষ্ট ভগবান কি খাইয়া বাঁচিয়া ছিলেন—শ্রীরূপ বলিলেন—দেবকীর বাৎসল্যের এক স্বরূপ প্রেমানন্দমৃত পান করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, ভক্তগণ ইহা হইতে কি বুঝিতে পারেন? বাৎসল্যরসে ডুবিতে ডুবিতে যেদিন উভয় সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ হইলেন সেইদিন সেই সময়ে তাহাদের বিকশিত হৃদয় সরোজ হইতে তিরোভূত হইয়া ক্রোড়ে উদিত হইলেন। শ্রীশ্রীচরিতামৃতকার জগন্নাথ ও শচীদেবীর কথোপকথন লিখিয়াছেন,—

"জগন্নাথ কহে, মুই স্বপন দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল॥
আমার হৃদয় হ'তে তোমার হৃদয়।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়॥"

এই স্বপ্ন স্বপ্ন নহে ইহাই বাস্তবিক সত্য, একমাত্র মহাসত্য, পৌর্ণমাসী যোগমায়ার আবরণে সত্যকে স্বপ্ন মনে হয়, স্বপ্নকে সত্য মনে হয়। তাই শ্রীশ্রীপ্রভু লিখিয়াছেন—

"সাক্ষী পৌর্ণমাসী
ও তা জানে বসুধা-ধনে"

বস্তুতঃ বসুধা-ধন শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হইতে এই তত্ত্ব স্ফুরণ হয়।

এখন কেবল একটি প্রশ্ন থাকিল, যদি এই রূপই হইয়া থাকে, তবে প্রামাণ্য গ্রন্থাদিতে পুনঃ পুনঃ দশমাস গর্ভের কথা উল্লেখ রহিয়াছে কেন?

এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে অধিকারী ভক্তজন নানা প্রকার ভঙ্গি করিয়া কথা বলেন। শ্রীশুকদেব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীচম্পটী ঠাকুর পর্য্যন্ত সকলেই বাক্যে ঐরূপ চতুরতা করিয়াছেন। কোন বস্তুর পূর্ণতা বুঝাইতে আমরা বলি 'ষোল কলা' কখনও বলি 'ষোল আনা' এখানে যেরূপ ষোল পদের আক্ষরিক অর্থ ধরিতে হয় না, তদ্রূপ দশমাস স্থলে দশ শব্দের আক্ষরিক অর্থ লইতে হইবে না। পূর্ণতা জ্ঞাপনই ঐ সব পদের তাৎপর্য্য। প্রাকৃত পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে পিতা হইতে মাতাতে সংক্রমিত হইয়া শিশু মাতৃগর্ভে বাস করে, আর অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ পুত্র হইবার পূর্ব্বে ঐ বাৎসল্য রস, কৃষ্ণ কথা দ্বারা পিতা হইতে মাতার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে, উভয়ে সেই বাৎসল্য দ্বারা শ্রীভগবানকে ভালবাসিতে থাকেন। চতুর শ্রীশুকদেব একটু রসিকতা করিয়া আস্বাদন করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া সেই বাৎসল্য রসে বাস করেন। কাজেই উপমাটী বেশ ভালই লাগিল। কাজেই গর্ভ শব্দটি প্রয়োগ করিয়া শ্রীশুকগোসাঞি দৃষ্টান্তটিকে বেশ জমাইয়া লইলেন। দশমাস পূর্ণ হইলে প্রাকৃত শিশু ভূমিষ্ঠ হয়; আর ঐ বাৎসল্য রস ঘনীভূত হইয়া পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে পিতা মাতা আত্মস্থ হয়েন। বাহিরের আর কিছু মনে থাকে না। সেখানে কেবল 'আমি আর গোপাল' থাকে। ভক্তি ভক্ত ও ভগবান ছাড়া তখন বিশাল বিশ্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। ঐ বাৎসল্যের আশ্রয় পিতা মাতা; বিষয় শ্রীভগবান। আত্মস্থ হইলে ঐ 'আশ্রয়' আর ঐ 'বিষয়' ছাড়া জগতের কিছুই থাকে না সম্পূর্ণ তন্ময় হইলে চিত্ত একমাত্র তদ্গত থাকে। তখনই যাবতীয় শুভ গ্রহের সংযোগ হয়, তখনই রাহু আসিয়া কলঙ্কী চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলে—তখনই পুষ্পবন্ত সনে মহেন্দ্র মিলিত হয়—তখনই তুঙ্গে উঠিয়া পঞ্চগ্রহ নাচিতে থাকে আর ভগবান কখনও কারাকক্ষকে কখনও গঙ্গার বক্ষকে উজ্জল করিয়া প্রকাশ হয়েন। এই পূর্ণত্ব বিজ্ঞাপনের জন্যই চতুরতা করিয়া দশমাস গর্ভের কথা উল্লেখ করিয়াছেন আরও পূর্ণতরতা জানাইবার জন্য শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ত্রয়োদশ মাসের কথা কহিয়াছেন। এত ভঙ্গি করিয়া চাতুর্য্যপূর্ণ বাক্য প্রয়োগের হেতু কি? শ্রীরূপ নিজেই তাহার উত্তর দিয়াছেন (অতি রহস্যত্বাৎ) 'ইহা অতি রহস্য সেই জন্যই ঐরূপ করিতে হইয়াছে'। কেবল শ্রীশুকদেবকে কেন শ্রীশ্রীপ্রভুকে পর্য্যন্ত চতুরতা করিয়া বাক্য প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। কেন না 'অতি রহস্যত্বাৎ' ইহা অতি রহস্য সেই জন্য। প্রথমতঃ অবতার রহস্য পূর্ণাবতারী আরও রহস্য তারপর মহাবতারী সে আরও অতি অতি রহস্য তারপর তাঁর জন্মকথা অতি অতি রহস্যতম—রহস্যের চূড়ান্ত। তাহাই ভেদ করিতে আজ এত বাগাড়ম্বর করিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা—শ্রীশ্রীপ্রভুর অযাচিত করুণা, শ্রীলচম্পটী ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ ও শ্রীগুরুদেবের করুণাপ্রসূত বুদ্ধি-যোগ। আমি বিষয় বিমূঢ় জীব, প্রমাদাদি দোষ থাকাই স্বাভাবিক। ভ্রম প্রমাদ, কতটা আছে পরম দয়াল বান্ধবগণ দর্শাইয়া অনুগ্রহীত করিবেন—বিপ্রলিপ্সা যে নাই তাহা খুব জোর

করিয়া বলিতে পারি। তবে করণাপাটব যে আছে তাহা বেশ বুঝিতে পারি। কারণ, লেখনী মসীপাত্র, ভাব ভাষা, সর্ব্বোপরি আমার মন ও বুদ্ধি—যাহাদিগকে করণ করিয়া এই দুরধিগম্য রহস্য উদ্ঘাটন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তাহাদিগের প্রত্যেকেরই যে অপাটব বা অপটুতা আছে তাহা বেশ অনুভব করিতেছি। কোনও কালে কোনও দিন পটুতা লাভ করিতে পারিবে কিনা স্বয়ং কর্ত্তাই জানেন। যাহা হউক, এই পর্য্যন্ত এই নীরস বিচার স্থগিত রাখিয়া বাৎসল্য রসাভিষিক্ত দম্পতি যুগলের অনুসরণ করিব।

অই দেখুন! সোণার চাঁদ বুকে লইয়া একটি উদ্বেলিত স্রোতস্বতী, ধীর মন্থরগমনে চলিয়াছেন। দুটি বাহুলতা বেষ্টনে একটি ননীর পুতুল হৃদয়ে ধরিয়া স্বামীর অঙ্গাবলম্বনে পতিপ্রাণা সতী অগ্রসর হইতেছেন। অঙ্গের ছটায় প্রকৃতি-দেবী হাসিতেছে, প্রেমসুধারস মাখা কত সুষমারাশি ঝরিয়া পড়িতেছে, কুঞ্জকানন কাঁপাইয়া পিকবধূ ললিত রাগিনী তুলিয়াছে,—

ঘোরা রজনী প্রভাত হ'ল, মোহ ঘুমঘোর ভাঙ্গিল।
সোনার বরণ তরুণ তপন, পুরবগগণে উদয় হ'ল॥
বরজ-কুসুম সুবাস ছড়া'য়ে, মলয় বাতাস ধীরে ধীরে ধীরে।
বঙ্গ হ'তে সারাজগত জুড়িয়ে, মৃদুমন্দভাবে বহিতে লাগিল॥
জয় জগদ্বন্ধু ধ্বনিটি শুনিরে, ত্রিধারা মরি একধারা হ'য়ে।
সাগর কল্লোলে কল্লোল মিলায়ে, কুলু-কুলুনাদে গাহিতে লাগিল॥

সে রাগিণীর ঝঙ্কার বহিয়া পবন-বাহক প্রতি দ্বারে দ্বারে নির্ঘোষ ঘোষণা করিতেছে। মঙ্গলবার্ত্তা পাইয়া বিশ্ববাসী নাচিয়া উঠিয়াছে। মাধুর্য্য নলিনী পুলকে স্পন্দিত হইয়া চারু মুখ খানি খুলিয়া দিয়াছে, পথে পথে পরাগময় মুক্তাবিন্দু ঝিকমিক্ ঝিকমিক্ খেলা করিতেছে।

গৃহে পৌছিয়া দীননাথ শয্যা রচনা করিয়া দিলেন। আঁধার কুটীর আলো করিয়া, শয়ন শয্যাকে ধন্য করিয়া শিশুবন্ধু শয়ন করিলেন। এখানে একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে আসে যে, অপ্রাকৃত বস্তু তিনি, প্রাকৃত ভাবে গর্ভে আসিতে না পারিয়া, বাৎসল্য রসাশ্রয়ে ধরায় আসেন বটে, কিন্তু প্রাকৃত শয্যা আসন বসন ভূষণ আহার্য্য বস্তু কি করিয়া গ্রহণ করেন। ভক্ত আত্মস্থ হইলে ভগবান আসেন একথা বেশ, কিন্তু ঐ সকল জড় বস্তুর তো আর সাধনযোগ্যতা নাই, কাজেই কি করিয়া ঐ সকল প্রাকৃত জাগতিক বস্তুজাত তাঁহার অপ্রাকৃত অঙ্গের সেবার উপযোগী হয়? এই যে ভাবুক ভক্ত সমাধান করিয়াছেন—

"আমার ধ্রুবতারা লিখে'ছে চিঠি,
সে আকাশ হ'তে খ'সে প'ড়েছে।
ভূতলের মাটী করিতে খাটি,
মধুর উজ্জ্বল রস এ'নেছে॥"

আমরা দেখিয়াছি, ধরায় আগমন করিবার পূর্ব্বে বাৎসল্য-বিগ্রহ পিতামাতাকে প্রেরণ করেন, কেন না, ঐ বাৎসল্য-রস না হইলে তিনি প্রকাশিত হইতে পারেন না। ঠিক তদ্রূপ আগমনের পূর্ব্বে শ্রীনিত্যানন্দকে প্রেরণ করেন। কারণ শ্রীনিত্যানন্দ না আসিলে ভূতলের মাটি খাটি হয় না। পরম দয়াল নিত্যানন্দের করে প্রেম ঝরে। উজ্জ্বল রস ছড়াইয়া তিনি নূতন প্রেমের কনক পৃথিবী সৃজন করেন।

প্রেমদাতা শ্রীনিত্যানন্দের পরশে নূতন আকাশে নূতন চাঁদ উঠে, নূতন বাগানে নূতন ফুল ফোটে, নূতন ভ্রমর নূতন মধু লুটে, নূতন অবতারী নূতন জগতে নামিয়া আসেন। এই জন্যই বিশ্বরূপ রূপে তিনি শ্রীগৌরাগ্রজ, শ্রীবলরামরূপে তিনি কৃষ্ণাগ্রজ, এই এই জন্যই শ্রীগুরুচরণ রূপে তিনি শ্রীবন্ধুর অগ্রজ।

আমরা দেখিতে পাই, যতবার তিনি আসিয়াছেন ততবারই সঙ্কর্ষণ আসিয়াছেন। পূর্ণভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথা বলিতে যাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত একাধিক স্থলে "অংশেন" ব্যবহার করিয়াছেন। যিনি যাহাই বলুন এই "অংশেন" অর্থ যে "সংকর্ষণেন" তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। নয়নাভিরাম শ্রীকৃষ্ণের তিনি 'বল' স্বরূপ তাই তিনি বলরাম আদর করিয়া যশোমতি বলেন 'বলাই'। এই বলরাম শ্রীনিত্যানন্দেরই বিলাস মূর্ত্তি। রাম লীলায় লক্ষ্মণও সংকর্ষণ মূর্ত্তি। তারপর বিশ্বরূপ—বিশ্বকে তিনি রূপ দেন, কোন রূপ? শ্রীগৌর সেবার উপযোগী রূপ। এই পার্থিব রূপ বদলাইয়া তিনি অপ্রাকৃত রূপ দান করেন। তিনি ভিন্ন শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবার বস্তু আর কিছুই হইতে পারে না,—

"তাহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্তু নহে আর।
অতএব বিশ্বরূপ নাম যে তাঁহার॥"

তার পর শ্রীগুরুচরণ। শ্রীবন্ধুসুন্দরের প্রকাশের পূর্ব্বে দীননাথ ও বামাদেবীর অঙ্গ হইতে কৈলাস কামিনী রূপে

যেমন যোগমায়া আসিয়াছেন, তেমনি গুরুচরণরূপে শ্রীঅনন্তের মূলতত্ত্ব প্রকট হইয়াছেন। তিনি আসেন কেন? রাজা আসিবার পূর্ব্বে অমাত্য আসিয়া যেমন আসন রচনা করেন গুরু-বন্ধুর আসিবার পূর্ব্বেও তেমন তাঁহার শ্রীচরণ রাখিবার পাদপীঠ রচনা করিতে শ্রীগুরুচরণ আসেন। উজ্জ্বল রস মাখাইয়া ভূতলের মাটিকে খাটি করিতে তিনি আগে আগে ছুটে আসেন। সংকর্ষণ অনন্তরূপ। অনন্তরূপে তিনি অনন্তানন্তময়ের সেবা করেন। যে কুটীর খানিতে শ্রীশ্রীপ্রভু প্রবেশ করিলেন, যে শয্যাখানি তিনি গ্রহণ করিলেন যে বস্ত্র খানি তিনি ধারণ করিলেন, তাহা প্রাকৃত জগতের জড় বস্তুর বিকার নহে। বিশুদ্ধ চিন্ময় শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার বা অনন্তদেব শ্রীনিত্যানন্দের বিলাসমূর্ত্তি। ইহা কবি কল্পনা নহে। শ্রীনিত্যানন্দ পদমকরন্দপানে সতত উন্মত্ত যে সকল ভক্তভৃঙ্গ শুধু তাঁহারাই এই তত্ত্ব-রস আস্বাদন করিতে পারেন। এই শুনুন শ্রীনিতাই-সর্ব্বস্ব ব্যাসাবতার শ্রীল-বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের স্বকীয় অনুভূতি—

"মূর্ত্তি ভেদে আপনে হয়েন প্রভু দাস।
সে সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ॥
সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন।
গৃহ, ছত্র, বস্ত্র যত ভূষণ আসন॥
আপনে সকলরূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করে পায় সেই জনে॥"

কেবল নিজে অনুভব করিয়াই ঠাকুর মহাশয় তুষ্ট হয়েন নাই, "অনন্ত-সংহিতা" গ্রন্থের বচন উদ্ধার করিয়া শাস্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছেন।

"নিবাস শয্যাসন পাদুকাং শুকো
-পধান বর্ষাতপ বারণাদিভিঃ।
শরীর ভেদৈস্তবশেষতাং গতৈ
র্যথোচিতং শেষ ইতীরিতো জনঃ॥

ধরণী দেবী শেষদেবকে কহিতেছেন, "হে দেব; মানুষ যে তোমাকে 'শেষ' বলে তাহা যথার্থই বলা হয়, যেহেতু শেষ পর্য্যন্ত যা কিছু সবই তুমি। বিভিন্ন মূর্ত্তি ধরিয়া বিভিন্ন রূপে তুমিই তোমাকে সেবা কর। কারণ, আমার পৃষ্ঠদেশে যত প্রকার বস্তু আছে, সবই পার্থিব মৃত্তিকার বিকার—সবই জড়বস্তু। কিন্তু তুমি যখন আমাকে (পৃথিবীকে) ধন্য করিবার জন্য আমার তপ্ত বুকে শ্রীচরণার্পণ করতঃ অবতরণ কর তখন থাকিবার মন্দির, বসিবার আসন, বস্ত্র. উপাধান, শয্যা ছত্র এমন কি শ্রীপাদুকাখানি পর্য্যন্ত—যাহা কিছু সেবোপকরণ গ্রহণ কর তাহার কিছুতেই পার্থিবত্ব থাকে না। নিজেই অশেষ প্রকারে অশেষ স্বরূপ প্রকাশ করতঃ নিজের সেবা করিয়া থাক। এই জন্যই তোমার শেষ নাম সার্থক।" তাই বলিতেছিলাম, শেষাবতার শ্রীনিত্যানন্দের অযাচিত কৃপা বলেই এই মাধুর্য্যময় তত্ত্ব অনুভব হয়। স্বয়ং শ্রীবন্ধুহরিও তাই একদিন শ্রীমুখে উক্তি করিয়াছেন,—

"যে বস্তুর যতক্ষণ পর্য্যন্ত সুকৃতি থাকে ততক্ষণই তাহা এই অঙ্গে ধৃত হইতে পারে"—অর্থাৎ এই বিশ্বমাঝে সুন্দর শোভন বস্তু একমাত্র আমি। আমারই কৃতি বা স্বরূপাভেদ দ্বিতীয় মূর্ত্তি শ্রীনিতাই। তাঁহারই প্রকাশফলে প্রাকৃত বস্তু সমূহ যখন অপ্রাকৃত শুদ্ধ সত্ত্বময় হইয়া উঠে তখনই তাহা মায়াগন্ধহীন জড়াংশরহিত এই অঙ্গের সেবোপযোগী হইতে পারে। হয়তঃ একদিন বহুবার শ্রীভোগ নিবেদন করা হইতেছেন, শ্রীশ্রীপ্রভু কিছুতেই গ্রহণ করিছেন না; অনেকবার পরে শেষে একটিবার কিছু গ্রহণ করিলেন, এইরূপ হইবার কারণ এই যে শ্রীনিত্যানন্দের বিলাসে যে বস্তুটি জড়ত্ব বর্জ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ চৈতন্য ভাবময় না হইয়াছে. সেটী ভাবের ঠাকুর শ্রীশ্রীপ্রভুর 'ভাব-বল্লরী-জড়িত-মাধুর্য্য-প্রতিম' শ্রীঅঙ্গের সেবোপযোগী হইতে পারে না। তত্ত্ব-রসিক শ্রীঠাকুর মহাশয় এই জন্যই গাহিয়াছেন—

নিতাই পদ কমল কোটী চন্দ্র সুশীতল,
সে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধা কৃষ্ণ পেতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥"

এবার শ্রীসংকর্ষণ গুরুচরণ রূপে প্রকাশিত হইয়া গুরুবন্ধুর মহাউদ্ধারণ লীলা সুফলা করিয়া অল্পদিন পরেই লীলার সৌকর্য্য বিধানার্থ লোক লোচনের অগোচর হয়েন।

শ্রীশ্রীবন্ধুর অবিচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে অদৃশ্যভাবে অনন্ত বিশ্বে বিচরণ করতঃ জীবজগতের প্রাকৃতত্ব ঘুচাইয়া দিয়া ঐ শ্রীচরণ সেবার উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য সতত ক্রিয়াশীল হইয়া রহিয়াছেন। অযাচিত কৃপাবলেই অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া এই সব লীলারহস্যের মর্ম্মভেদ করা যায়। কাজেই সামান্য জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব

শ্রীদীননাথের যে কুটীরে উদয় হইয়া যে শয্যাখানি আলোকিত করিলেন তাহা বিশ্বরূপ নিতাই চাঁদেরই যে একটী মূর্ত্তি ইহাতে সংশয় মাত্রও নাই।

আজ দীননাথ কুটিরে ভক্ত ভগবানের অপূর্ব্ব সম্মিলন হইল। অন্তরালে যোগমায়া কৈলাস কামিনী চোখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। পঙ্কজবদনে হাসির পাপ্‌ড়ি ফুটিয়া উঠিল। 'অনন্ত যাহারে ধ্যানে নাহি পায়' তিনি দুঃখিনী ব্রাহ্মণী ক্রোড়ে, দুলিতে লাগিলেন। স্থায়ীভাব—মধুর মধুর বাৎসল্য রসমাধুরী। আশ্রয়—দীননাথ-বামাদেবী, বিষয়—নব প্রস্ফুটিত শিরীষ কুসুম-কান্তি শিশু-বন্ধু। বামাদেবী স্বভাবতঃ মধুর মূর্ত্তি, তাহাতে নবোদিত শিশুর অঙ্গচ্ছটায় যেন আরও উজ্জ্বল হইয়াছেন। সাত্বিক পুলকে তনু পরিপ্লুত হইতে লাগিল, স্তনযুগ হইতে অবিরল ধারে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে লাগিল, পলে শতবার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করতঃ ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন, তবু অতৃপ্ত তৃষ্ণা সহস্রধা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহাই পরম বৈচিত্র্য। কনকরুচি, শিশু ওঁয়া ওঁয়া কাঁদিতে লাগিল, অপার্থিব হাবভাব ও অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া ক্ষণে ক্ষণে দীননাথের চিত্ত বিভ্রম ঘটিতে লাগিল। অনন্তভাবের অনন্ত হিল্লোলে বাৎসল্য বারিধি টলমল করিতে লাগিল। জয় জগবন্ধু! জয় জন্মলীলা! জয় জয় বাৎসল্য রূপিনী শ্রীবামাদেবী, জয় জয় পিতৃ-শান্ত মূর্ত্তি শ্রীদীননাথ।

ন্যায়রত্নমহাশয়ের পুত্র হইয়াছে শুনিয়া পাড়াপ্রতিবেশী সকলে ক্রমে ক্রমে আসিয়া দেখিতে লাগিলেন। অমানুষিক রুচিলাবণ্য নিরুপম হাসি ও চাহনি দেখিয়া বাৎসল্যময়ী জননীগণের স্তনধারা গলিয়া পড়িল।

সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ প্রতিমাভান;
সর্ব্বঅঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্যদ্যুতি, দেখি পাইল বহুপ্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়॥

সেই ভাগ্যবতী জননীগণের অনেকেই ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছেন। কেবল সাক্ষ্য দিবার জন্য কমলাক্ষ বাবুর বাড়ী একটি বৃদ্ধা মাতা ও শ্রীযুক্তা মহালক্ষ্মী দেবী এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছেন। বহরমপুরের ভক্তবর জ্ঞানেন্দ্রের † নিকট ঐ মাতা একদিন বলিয়াছিলেন, 'ওগো তোমাদের জগবন্ধু যে অযোনি-সম্ভব। ন্যায়রত্নের ছেলে হ'য়েছে শুনিয়া আমরা সবাই দেখিতে যাই। গিয়া দেখি কি আশ্চর্য্য। পুত্রপ্রসব হইলে স্ত্রী শরীরে সে সকল পরিবর্ত্তন হয়, প্রসূতির দেহে সেরূপ কোন লক্ষণই দেখিলাম না। আর খোকাটিকে দেখে ঠিক চার পাঁচ মাসের ছেলের মত মনে হতে লাগল।" ভাগ্যবতী মহালক্ষ্মী দেবীও তৎপুত্র শ্রীযুক্ত দেবেন বাবুর * নিকট প্রভুর অযোনিসম্ভবত্বের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। দিনের পর দিন ঐরূপ কত ভাগ্যবতী আসিয়া ঐ অনিন্দ্যসুন্দর রূপলাবণ্য দর্শনে নয়ন সফল করিল। জননীগণ! তোমরা ধন্যা, সুন্দরীশিরোমণি বামাসুন্দরীর সুন্দর অঙ্কে জগৎ সুন্দর যখন দু'হাতে ধরিয়া স্তন্যপান করেন তখন যে কি চমৎকার শোভাটী হয় তাহা একমাত্র তোমরাই—স্বীয় স্বামীপুত্রের কথা ভুলিয়া দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলে! দীননাথের পর্ণকুটীরে প্রত্যহ কতলোক আসে, কেহ কাহাকেও জানে না। দাসঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন আনন্দে বিহ্বল হইয়া কাহাকেও চিনিতে পারেন নাই—

'দেবস্ত্রীয়ে নরস্ত্রীয়ে না পারি চিনিতে।
দেব নরে একত্র হইল ভালমতে॥"

রসিক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস বুঝি দিব্যচক্ষে তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন;—

"সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচীরম্ভা অরুন্ধতী,
আর যত দেবনারীগণ।
নানাদ্রব্য পাত্র ভরি, ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি,
আসি সভে করে দরশন॥"

চতুর পদকর্ত্তা বুঝি দিব্যকর্ণে তাহাদের কথোপকথন শুনিয়াছেন।

তোর এ বালক কমলকোরক সকল সুষমা খনি।
হাসে রাকাশশী, পদনাখে বসি, পরাণ পরশ মণি॥
শুন দীননাথ প্রিয়ে!
কি জানি কি গুণে, লভি এ রতনে শীতল করিলি হিয়ে।
শুধু তোরা নয়, ধন্য বিশ্বচয়, পড়শী মোরা কা কথা।
শিশু বটে হয়, বিষ্ণু চিহ্ন গায়, পরশে জুড়ায় ব্যথা॥

---

† পরম শ্রদ্ধাস্পদ জ্ঞান দাদা সেদিন শ্রীমৎ অঙ্গন দুলাল ব্রহ্মচারীর নিকট ঐ কথা বলিয়াছেন।

* পূজ্যপাদ দেবেন বাবু সেদিন ঐ কথা নিজ মুখে শ্রীঅঙ্গনে প্রকাশ করিয়াছেন।

বুঝি মুরহর, শ্রীকৃষ্ণকিশোর, কিবা গৌর অবতারী।
চারিহস্ত দেহ, দে'খেছ কি কেহ, নাম জগবন্ধু হরি ॥
মহীনের জ্ঞানে, দৈবজ্ঞ বচনে, এ যে নলিনাক্ষ হরি।
জন্মলগ্ন তুঙ্গে, পঞ্চগ্রহরঙ্গে, দিল সাক্ষী অবতারী ॥

জয় জগবন্ধু হরি! জয় মহাউদ্ধারণলীলা !!
শ্রীধামানন্দানন্দং ডাহাপাড়া পুরন্দরম্।
দীননাথস্য জীবিতং নমামি শিশুসুন্দরম্ ॥

মহানামব্রত।

স্মরণ-মঙ্গল।

গাঢ় অন্ধকারে, বিজন কুটীরে,
রাজে অভিনব আলোর দেবতা।
আবরি' আপনা, আমোদি' আঙ্গিনা,
নিরখিয়া যেন স্তব্ধ নীরবতা ॥

কলানিধি কাঁতি ভীত ভানু ভাতি,
জিত নবনীত ললিত অঙ্গ।
তাহে চমৎকার, কঠোর আচার
অশনি আপনি, মানিছে ভঙ্গ ॥

উঁকি ঝুঁকি চায়, তস্কর প্রায়,
কর পরসারি, ভাস্কর তারা।
পশিতে পারেনি, কভু পরশেনি,
রসে গড়া তনু আপনা হারা ॥

গন্ধভরে অন্ধ, ছন্দে নে'চে নে'চে,
মৃদুল মন্দ, ধীর সমীরণ।
গলাটি ধরিয়ে, কানে গেল ক'য়ে,
দ্বাদশ বরষ আজিকে পূরণ ॥

নয়নে বাদল, বুকে মহাবল,
বিশ্বাসে অচল, বাদল বিশ্বাস।
চমকি' চাহিল', সঘনে ডাকিল,
আয় আয় ক'হে, যাই তাঁর পাশ ॥

করে ফুল মালা, চন্দনের থালা,
উলসি মহেন, ছুটে অভিসারে।
দ্বার উন্মোচিয়ে, শ্রীমন্দিরে গিয়ে,
আনত-বদনে, রহে একধারে ॥

শতশশী কয়, নিরমল তয়,
উজলি' বিরাজে সূর্য্যকান্ত মণি।
চারু চন্দ্রাধর, চুমি হাসে চুমী
অমিয় ক্ষমিয় লাবণীয় খনি ॥

সুবিশাল ভাল, কোমল কপোল
আবরিত কয়া, সঙ্গত কিরে?
সুধাইয়া হে'সে, কৃষ্ণ কেশ পাশে,
পাশে বসি কহে হাত দিল শিরে ॥

কুটিল কুন্তল, জটাজুট ভেল,
হেরইতে হল, বেয়াকুল হিয়া।
উঠিল অমনি, কহিল বিশ্বাসে
ঝুরিল বাদল, শিরে হাত দিয়া ॥

ধাওল বাদল, বসন না বাঁধে,
কেদার কেদার, ডাকিছে কেবলি।
বাদলের স্বর, যেন জলধর.
উত্তরে কেদার, 'হরি বোল' বলি ॥

শোন্‌রে কেদার বচন আমার,
বিচার করিয়া যা হয় বল্।
প্রভুর মাথায়, জটাহ'ল হায়,
কর হে উপায়, বিলম্বে কি ফল?

এত কাল বাদ, আজি সুপ্রভাত,
শুভদিন কিরে, ফিরিয়া আসিল।
ভাবিয়া কেদার, মুছে অশ্রুধার,
সাধ্য কি আমার, কাতরে কহিল ॥

তুলারাশি হ'তে কোমল দেহেতে,
সু-ধার সে ক্ষুর, ধরিব কি মতে।
কহিল বাদল, জীবের কি বল,
প্রভুর কৃপায়, সম্ভব তোমাতে ॥

শ্রীচরণে প্রণমিয়ে, কৃতাঞ্জলি হৈয়ে
ভূমে গড়ি দিয়ে কাঁদিল কেদার।
আমি অকিঞ্চন অতি অভাজন
যা করহে প্রভু ভরসা তোমার॥

বাদল অগ্রেতে চাবি ল'য়ে হাতে,
মন্দিরের তালা, ঘুচাইয়া দিলা।
মহেন সুধীর, সুবাসিত নীর,
কোমল তোয়া'লে লইয়া চলিলা॥

পশ্চাতে কেদার, ধীরে আগুসার,
হিয়া কাঁপে তার, ভয়ে দুরু দুরু।
শক্তি দান করি' ইচ্ছা পূর্ণ কর,
তুমি দয়াধার বাঞ্ছা কল্পতরু॥

অই বধুয়া রহিছে চাহিয়া।
কোন্ সে দেশের কোন্ মহাভাব,
মহান্ সিন্ধুর অতলে বসিয়া॥

পটোল দুখানি, চটুল চাহনি,
চারিভিতে চাহি' কারে যেন চায়।
কি যেন কি ছিল কে যেন নিয়েছে,
হারানিধি যেন, খুঁজিয়া বেড়ায়॥

ধীরে সন্তর্পণে, অতি সযতনে,
কত সাবধানে ধরি দুইজনে
কার্য্য সমাধিল, আনন্দ বাড়িল,
মুচকি হাসিল পঙ্কজ বদনে॥

অতি ধীরে ধীরে, শ্রীহস্তটি ধ'রে,
সাদরে মহীন কহে যুক্তকরে।
"কতকাল প্রভু যাননি বাহিরে,
চলুন বাহিরে আজি দয়া ক'রে॥"

বাঞ্ছা পূর্ণকারী কাঙ্গালের হরি
উঠিলা অমনি, বিমোহন সাজে।
ধ্বজবজ্র আঁকা চরণ রাজীব
লুকা'য়ে থুইল, পাদুকার মাঝে॥

গজেন্দ্র গমনে বাহির প্রাঙ্গণে
চলিলা বঁধুয়া মুনি-মনোহারী।

বার্ত্তাবহ বায়ু ঘোষিল নগরে,
উধাও ছুটিল বালবৃদ্ধ নারী॥

সে রূপ দেখিয়া অধীরা হইয়া,
বাউরী সাজিল কুললাজ ভুলি'
জয় জয় রোল, হরি হরিবোল,
মুখরা আঙ্গিনা দিল হুলাহুলি॥

কুঙ্কুম কস্তুরী দুই হাতে পুরি',
চলে ত্বরা করি' কোন কুলবালা।
কেহ লয়ে চারু চন্দন অগুরু,
কনক চম্পক, কলিকার মালা॥

তৈল সুবাসিত হরিদ্রা সংযুত,
ল'য়ে হরষিত, চিতে কেহ যায়।
শ্রীকুণ্ডের বারি, পূর্ণ কুম্ভ ভরি',
ধরি' শিরোপরি, আগে কেহ ধায়॥

ভকত মরম, মরমে জানিয়া,
পরাণ রসিয়া, আড়চোখে চায়।
শ্রীচালিতা মূলে, বসিলা বিহ্বলে,
শুকসারী ডে'রে, অশ্রু জলে গায়॥

কনক কেতকী- কুসুমিত কাঁতি
নেহারিয়ে মাতি', ভক্ত অলিকুল।
করি গুণ্ গুণ্ গাহি' বন্ধুগুণ,
লুটল মাধুরী, জগতে অতুল॥

স্নিগ্ধ নিরমল, কাঞ্চন অচল,
সুঠাম শ্রীঅঙ্গে হরিদ্রা হাসিল।
পুরট সুন্দর, মিহির উপর,
চালিতা সুন্দরী, পুষ্প বরষিল॥

কোরক প্রসুন, ভদ্রশ্রী আগম,
হরি চন্দন ঘন পড়িছে পায়॥
শ্রীঅঙ্গ সিঙ্গারি' শ্রীকুণ্ডের বারি,
বাল্যলীলা স্মরি' ধুলায় গড়ায়॥

সিঞ্চি' সর্ব্ব জীবে, বরষি' অমিয়া,
ভক্ত অশ্রু ধারে আপনি নাহিয়া।

খঞ্জন-ঠমকে, নাচিয়া থমকে,
শ্রীমন্দিরে চলে, বন্ধু বিনোদিয়া।

তিরপিত ভেল, তিরথিত জীব,
উচ্চ করি গায়, হরি হরি বল।

আজিও সেথায়, অই শোনা যায়,
শ্রীবন্ধু-বাসন্তী স্মরণ মঙ্গল॥

মহানাম ব্রত।

দু'টী অক্ষর।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। পরম মঙ্গলালয় শ্রীশ্রীপ্রভু-বন্ধু শ্রীধাম গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনে শ্রীমন্দিরে কে জানে কোন্ জগতের কি মঙ্গল চিন্তায় আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া বসিয়া আছেন। শ্রীশ্রীপ্রভু তখন পর্য্যন্ত মৌনব্রত অবলম্বন করেন নাই। ভক্তগণ সান্ধ্য কর্ত্তব্য শেষ করিয়া যে যাঁহার বাসায় গমন করিয়াছেন, কেবলমাত্র শ্রীধাম বাকচরবাসী ভক্তকুল-মণি কোদাই সাহা মহাশয় * শ্রীমন্দিরের বারান্দায় একটা জীর্ণ মাদুরে কাঙ্গাল ভাবে শয়ন করতঃ আপন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন। এমন সময় চট্‌মট্‌ করিয়া একটা শব্দ সাহা মহাশয়ের কাণে পৌঁছিল। অস্পষ্ট আলোকে সাহাজী দেখিলেন কে একটী ভদ্রলোক জুতা পায়ে দিয়া শ্রীঅঙ্গনের দিকে আসিতেছেন। লোকটী যেন জিজ্ঞাসু ভাবে অতি ব্যস্ততার সহিত আসিতেছেন। আসিয়াই বরাবর শ্রীমন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। লোকটী কি করেন দেখিবার জন্য সাহাজী চুপটি করিয়া থাকিলেন। শ্রীমন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া লোকটী অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে শ্রীশ্রীপ্রভুকে সম্বোধন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"জগত, বিষয়টী কি?"

যখনকার কথা বলা হইতেছে, তখন শ্রীশ্রীপ্রভু দেশের অনেক যুবককে আপনার শান্তির কোলে টানিয়া লইয়া নামে প্রেমে মাতোয়ারা করিয়া তুলিয়াছেন। জগত সেদিন-কার স্কুলের ছেলে। বাল্যকাল হইতেই তাহার গতিবিধি কার্য্যকলাপ আচার ব্যবহার একটু স্বতন্ত্র ভাবের ছিল বটে, কিন্তু সেই যে শেষটায় এমন হইয়া পড়িবে কে জানে? এই তাহারা এত বয়োবৃদ্ধ হইয়াছেন, জগত তো মাত্র সেদিন পৃথিবীতে আসিয়াছে। এত অল্পকালের ভিতর কতই না অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া ফেলিল! আগত ব্যক্তি বোধ হয় সমধিক মান্যগণ্য শ্রেণীর এবং প্রতিষ্ঠাবান্ হইবেন। দু'দিনের জগতের এতটা করা যেন তাহার নিকট কেমন মনে হয়। এ জগত কে? এ কি উদ্দেশ্যেই বা এ সমস্ত করিতেছে। রহস্য যেন দুর্ভেদ্য হওয়াতেই সে আজ ব্যস্তভাবে প্রভুর নিকট ছুটিয়া আসিয়াছে। ত্রিশ বৎসর বয়সের একটা মায়া মানুষের এত সব কাণ্ডকারখানায় তাহার ক্রোধ এবং বিস্ময় যুগপৎ উদিত হইয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। তাই এই ব্যক্তি আসিয়াই একটু যেন ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"জগত, বিষয়টী কি?"

তাঁহারা এই এত বৃদ্ধ হইয়াছেন, কই এমনটী ত কোন দিন দেখেন নাই। এই দীননাথ ন্যায়রত্নের ছেলেটা এ কি করিয়া ফেলিল! ত্রিভুবনটা যেন নাচাইয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছে। শ্রীশ্রীপ্রভু যদিও প্রতিষ্ঠা ভালবাসেন না তবুও তাঁহার এই যে রহস্যময়ী লীলা ইহাকে যেন মহাপ্রতিষ্ঠা মনে করিয়া ঐ বৃদ্ধ অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত হইয়াই যেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"জগত, বিষয়টী কি?"

এই যে তাহার ভাবের বিকার, আবাল্য এই যে তাহার সংকীর্ত্তনোন্মত্ততা, এই যে তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, পবিত্রতা ও ব্রহ্মচর্য্যের দিব্য প্রতিমূর্ত্তি, এই যে আচণ্ডালে হরিনাম প্রেমদান, এই যে খোল করতালে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করা, এই যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান, এই যে বিশ্বজগতকে কি যেন মধুর আকর্ষণে আকৃষ্ট করা ইহার কারণ কি; ইহার মূলে কি বুঝিতে না পারিয়াই যেন তিনি জগতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

---

* উক্ত সাহা মহাশয়ের নিকটেই এই ঘটনাটি শ্রুত হইয়াছি।

"জগত, বিষয়টী কি ?"

প্রভু কিন্তু নীরব। তিনিও ছাড়িবার পাত্র নহেন, পুনঃ পুনঃ ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীবন্ধুহরি শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তর হইতে মৃদু মধুর স্বরে বলিয়া উঠিলেন—

"বিষয় মাত্র দু'টি অক্ষর"

শুনিয়াই ভদ্রলোকটি যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন—জগত বুঝি কোন উত্তরই করিবে না।

জগতের তাৎকালীন একটী শ্রীমুখের কথা শুনিলে জীবের শ্রবণ স্নিগ্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু ঐ কোকিল কলধ্বনির মত কথাটি শুনিয়া তিনি যেন একটু ক্রোধাভিমান মিশ্রিত বিস্মিত ভাবে বলিলেন,—"কি দু'টি অক্ষর, সে অক্ষর দু'টি কি ?" শ্রীশ্রীপ্রভু আবার বলিলেন—

"হ আর রি"

ইহার পর ঐ লোকটি আরও অনেক কথা কহিলেন, কিন্তু প্রভু সুন্দর আর কোন উত্তর দিলেন না।

বাস্তবিকই ঐ দু'টি অক্ষরই একমাত্র সার। উহার সম্বন্ধেই প্রভুর যত কিছু কার্য্য। জীব অজ্ঞাত ভাবে ঐ দু'টি অক্ষরের জন্যই সদা সতৃষ্ণ। ঐ দ্বি অক্ষর বিশিষ্ট নামটীই একমাত্র মধুর স্নিগ্ধ শান্তিদায়ক। ঐ নামই একমাত্র যুগে যুগে মানুষের ভিতর মানুষ হইয়া আসিয়া জীবকে কৃতার্থ করিয়া যান্। ঐ নামীই একমাত্র সারাৎসার। ঐ নামীই মায়ামোহমুগ্ধ জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল। যোগী ঋষি মুনিগণ ঐ নামীর সন্ধানেই যজ্ঞ তপস্যা ধ্যান ধারণা করিয়া থাকেন। ষড়দর্শন ঐ নামীর তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতেই গবেষণা করিয়াছেন। বিজ্ঞান ঐ রস স্বরূপ দু'টি অক্ষরের দিকেই পা বাড়াইতেছেন। ভক্ত ঐ দু'টি অক্ষরের গুণগাথা গাহিয়া পরানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কেহই ঐ দু'টি অক্ষরের তত্ত্ব আজও বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

সে যে হরি। হরণ করেন বলিয়াই তাঁর নাম হরি। ত্রিতাপ জ্বালা হরণ করিয়া জীবকে অমায়িক ধামে নিয়া থাকেন বলিয়াই তাঁর নাম হরি। মনপ্রাণ হরণ করিয়া জীবকে পাগলপারা উন্মাদ করিয়া তোলেন বলিয়াই তাঁহার নাম হরি। এই মর্ত্ত্যধামে ইচ্ছাকৃতি দ্বারা অবতরণ করিয়া জীবের সমুদয় দুর্গতি হরণ করিয়া থাকেন বলিয়াই তাঁর নাম হরি। অধর্ম্মকে হরণ করিয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়া থাকেন বলিয়াই তাঁহার নাম হরি।

শ্রীশ্রীপ্রভু যে বলিলেন বিষয় মাত্র দু'টি অক্ষর—"হরি" তাহা তৎকালে তাহার পক্ষে পরম শোভনই হইয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও নিজে ঐ হরি স্বরূপ হইয়াও একদিন হরি-রসসুধা আস্বাদন করিবার আকাঙ্ক্ষায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ঐ হরিপ্রেম বিলাইবার জন্যই সন্ন্যাস অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ঐ হরিপ্রেম সাগরে নিমজ্জমান হইয়াছিলেন, ঐ হরি হরি বলিয়া দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, ঐ হরির বিরহ-যন্ত্রণায় একাদশ ও দ্বাদশ দশার অত্যদ্ভুত বিকারগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ঐ হরি হরি বলিতে বলিতে নীলাচলে গম্ভীরায় নয়নধারে স্বরূপ রামানন্দের অঙ্গ সিক্ত করিয়াছিলেন। আজ যে প্রভু বলিলেন, "বিষয় মাত্র দু'টি অক্ষর" তাহাতে তাহারও যে হরি হইয়া হরির জন্য ঐরূপ করিতে হইবে, ইহাই যেন ইঙ্গিতে জানাইলেন। আর এই যে বর্ত্তমানে কাহাকেও দেখা দেন না, কাহাকেও তন্ত্র মন্ত্র শিক্ষা দীক্ষা দেন না, তবুও যে সহস্র সহস্র লোক আকুল আবেগে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসে, ইহারও একমাত্র কারণ তিনি ঐ দু'টী অক্ষর স্বরূপ—হরি। কামকাঞ্চন লুব্ধ জগৎকে আজ ধরা দিবেন বলিয়াই তিনি আসিয়াছেন। একদিন ঐ হরির জন্যই সরল বিশ্বাসী ধ্রুব কাননে কাননে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ছুটিয়াছিলেন। ঐ হরির জন্যই ভক্তরাজ প্রহ্লাদ হস্তিপদতলে নিষ্পিষ্ট হইতে গিয়াছিলেন। ঐ হরির জন্যই দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্র হাতে করিয়া ত্রিভুবন ভরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। ঐ হরির জন্যই পঞ্চানন ভস্ম মাখিয়া শ্মশানে মশানে বিচরণ করেন। ঐ হরির জন্যই ব্রজরাখালগণ একদিন পাগলপারা হইয়াছিলেন। ঐ হরির তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই একদিন পিতামহ গোধন হরণ করিয়াছিলেন। ঐ হরিকে চিনিতে না পারিয়াই দেবরাজ বৃন্দাবন ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ হরিই মা যশোদার অঞ্চলের মণি। ঐ হরিই গোপকুল কামিনিগণের সর্ব্বস্ব। ঐ হরিকে লাভ করিবার জন্যই অণু হইতে অনন্ত পর্য্যন্ত ব্যাকুল। ঐ হরির ইচ্ছাই এই যে তিনি সকলের সঙ্গেই প্রেমের খেলা খেলিবেন, প্রেমের লীলা অভিনয় করিবেন। জীব জগতকে প্রেমময় করিয়া নটরাজ নটবর হরি রঙ্গ দেখিবেন। সকলকেই হরি বলিয়া নাচাইবেন,

হাসাইবেন, কাঁদাইবেন। শ্রীবৃন্দাবনের ঐ হরি এবার নিখিলে মাঝে ছড়াইয়া পড়িবেন।

স্বয়ং হরি এবার হরি-প্রেম হরিরলুট দিবেন। সে লুট কুড়াইয়া সে হরিরসসুধা আকণ্ঠ পান করিয়া সকলেই অমর হইবে। মায়া মনসিজ চিরতরে বিদূরিত হইবে। কামকুক্কুর কোটী যোজন দূরে সরিয়া পড়িবে। পাপমোহের চিরপরাভব ঘটিবে। তাপ জ্বালার চিরনিবৃত্তি হইবে। জরা মৃত্যু ঘুচিয়া যাইবে। জীব স্বকীয় নিত্যস্বরূপ অনুভব করিয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া হরির সঙ্গে প্রেমের আলাপন করিবে, রসের সাগরে ডুবিবে, ভাবের তুফানে দুলিবে, আনন্দের স্রোতে ভাসিবে। শ্রীশ্রীপ্রভু যথার্থই উত্তর দিয়াছেন। "বিষয় মাত্র দুটি অক্ষর হ আর রি" প্রশ্নোত্তর শুনিয়া সাহাজীও ঐ নাম আর নামীর তত্ত্ব ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন॥

ভক্তি সুধাকর শ্রীহরেকৃষ্ণ বন্দুদাস।

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

"পিতরং কো ন বন্দেত মাতরং কো ন পূজয়েৎ।
কো হি দূষয়তে বেদং কো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে॥"

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস।

শ্রীএকাদশী তিথির আর এক নাম শ্রীহরিবাসর। মিলন-রজনীতে মানুষ বাসরঘরে পরমানন্দে যাপন করে। এই দিনটি মানুষের সঙ্গে শ্রীহরির মিলিবার দিন। এইদিন শ্রীহরি এই মরধামে নামিয়া আসিয়া এই তিথির স্থিতিকাল ব্যাপিয়া বিরাজ করতঃ জীবগণকে ডাকিয়া কহেন—রে মানবগণ! তোমরা আমার পরম প্রিয়, আমি নিজস্বরূপের অনুরূপ করিয়া তোমাদের দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহা আমার ভজনোপযোগী করিয়া দিয়াছি, আর তোমরা কি না দিন রাত্র আমাকে ভুলিয়া উদরান্নের চিন্তায় ডুবিয়া আহার নিদ্রা মৈথুনে কাল কাটাইতেছ, এই দেখ আজ আমি কৃপা করিয়া তোমাদের সঙ্গে মিলিতে আসিয়াছি, মাসের ত্রিশ দিনের মধ্যে এই দুইটা দিন কি তোমরা এই আহার নিদ্রা মৈথুন এই তিনটা কাজ ভুলিয়া আমার চিন্তায় কাটাইতে পারিবে না? ত্রিশ দিনের মধ্যে এই দুইটা দিন কি তোমরা মামলা মোকদ্দমা জাল জুয়াচুরী ছল চাতুরী ভুলিয়া সাধুগুরু বৈষ্ণব সেবা লইয়া দিনাতিপাত করিতে পারিবে না? ত্রিশ দিনের মধ্যে এই দুইটা দিন কি তোমরা নাটক নভেল যাত্রা থিয়েটার নাচ তামসা ভুলে,শ্রীমদ্ভাগবত পঠনে আমার লীলা-গুণস্মরণে আর আমার শ্রীনামসংকীর্ত্তনে অতিবাহিত করিতে পারিবে না?

এই সংসারে যত প্রকার সাধন পথ আছে প্রত্যেক পথেই অধিকারী বিচার আছে। কিন্তু এই হরিবাসরে কাহারও বাধা নাই। লোকে বলে সধবা স্ত্রীলোকের একাদশী করিতে নাই, কিন্তু জীব-শিক্ষা-গুরু শ্রীমন্ মহাপ্রভু একদিন শ্রীশচীদেবীকে ডাকিয়া কি বলিলেন—

"একদিন মাতা পদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে, মাতা মোরে দেহ একদান॥
মাতা বলে তাহা দিব যা তুমি মাগিবে।
প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবে॥
শচী কহে না খাইব ভালই কহিলা।
সেই হইতে একাদশী করিতে লাগিলা॥"

আদিলীলা।

জগৎকে শিক্ষা দেওয়াইবার জন্য শ্রীমহাপ্রভু তাহার নিজ মাতাকে একাদশীব্রত পালন করাইলেন নতুবা স্বয়ং শ্রীহরি অহর্নিশ যার আঙ্গিনায় গড়াগড়ি যান তার আবার হরিবাসর ব্রত কি? লোক শিক্ষাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সময় শ্রীজগন্নাথ মিশ্র প্রকট ছিলেন। অতএব সধবা একাদশী করিবে না এই কথাও অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে।

শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার বলেন যেমন পিতা বন্দনীয়, যেমন মাতা পূজনীয়া, যেমন বেদ আদরণীয় তেমন শ্রীহরিবাসর ব্রত আবশ্য পালনীয়।

দ্বিতীয় পাণ্ডব শ্রীভীমসেন বড় পেটুক ছিলেন। অনেক খাইতে পারিতেন। কিছুতেই উপবাস করিতে পারিতেন

না। কেহ হয়ত মনে করিবেন উপবাস না করিলে কি আর ভগবানকে ডাকা যায় না? কথাটা এই যে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের যতগুলি কাজ তার শতকরা নিরানব্বইটি কাজ উদরান্নের জন্য। খাবার চিন্তা থাকিলেই তদনুযায়ী প্রচেষ্টা থাকিবে—তার পর উদর পূর্ণ করিয়া আহারটী করিলে তাহার অনুজ্ঞা নিদ্রাদেবী আর বিলম্ব সহিবেন না। তার পর পূর্ণিমা বা অমাবস্যার নিকট-বর্ত্তিতা হেতু শরীর স্বভাবতঃ রসস্থ হয়—তদুপরি আহারে ইন্দ্রিয় সংযম অসম্ভব হইয়া পড়ে, ফলে ধর্ম্মকর্ম্ম সাধনভজন সবই নষ্ট হয়।

ব্যাসদেব আঠার পুরাণ রচনা করিয়াছেন। তিনি আবার ভীমের ঠাকুর দাদা। ভীম ঠাকুরদাদাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীম কহিলেন—হে পিতামহ আমি উপবাস করিতে একেবারেই অসমর্থ অতএব কি করিয়া হরিবাসরের মর্য্যাদা রক্ষা করিব? তখন ব্যাসদেব নাতির জন্য একটা ব্যবস্থা করিয়া কহিলেন—বৎস, সূর্য্যদেব যখন বৃষ রাশিতে পদার্পণ করেন তখন জ্যৈষ্ঠমাস, ঐ মাসের শুক্লা একাদশীতে জল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া যত্ন সহকারে উপবাসী থাকিবে, স্নান আর আচমন ভিন্ন সকল কার্য্যে জল ত্যাগ করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া রহিবে, তার পর দ্বাদশীর সুপ্রকাশিত প্রাতঃকালে দ্বিজাতিগণকে জল ও সুবর্ণ অর্পণ পূর্ব্বক দ্বিজগণসহ পারায়ণ করিবে। সংবৎসরের মধ্যে যতগুলি একাদশী আছে—এই একদিনেই তোমার তৎসমস্তের ফললাভ হইবে, এই কথা আমি নিজের মনগড়া বলিলাম না, চক্রপাণি নিজে একদিন আমাকে এই দিনটীর কথা কহিয়াছেন। পিতামহের উপদেশ মত ভীম ঐ একটী একাদশীই সার করিলেন—ঐ একাদশীর নাম ভৈমী একাদশী। ব্যাসদেব আরও বলিয়াছিলেন—তিনি বলিয়াছিলেন—আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, এই একাদশীতে উপবাসী থাকিলে ধনধান্যপুণ্যপুত্রসৌভাগ্য ও সুখপ্রাপ্তি হয়। যিনি এই একাদশীতে ব্রতোপবাস করেন, করাল কামরূপী দণ্ডধারী ভীষণ শমনদূতগণ তাহার নিকট উপস্থিত হইতে সমর্থ হয় না। পীতবসনধারী শঙ্খচক্রপাণি বিষ্ণুদূতগণ তাহাকে লইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

এই সংসারে যাহারা ধনপুত্র কামনা করে, তাহাদিগকে ধনপুত্রের লোভ দেখাইয়া; যাহারা শমনের ভয়ে ভীত, তাহাদিগকে ঐ ভয় নিবারণ করিয়া; যাহারা বিষ্ণুলোকেচ্ছু, তাহাদিগকে ঐ লোকের সুখের আশা দিয়াও ব্যাসদেব সকলকে একাদশীতে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন—ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, একাদশীতে সকলের অধিকার।

একাদশী ব্রতস্যাপি পুণ্যসংখ্যা ন বিদ্যতে।
এতৎ পুণ্যপ্রভাবশ্চ যৎ সুরৈরপি দুর্লভঃ॥
নক্তস্যার্দ্ধ ফলং তস্য একভক্তস্য সত্তম।
একভুক্তঞ্চ নক্তঞ্চ উপবাসস্তথৈব চ॥
এতেষ্বন্যতমং বাপি ব্রতং কুর্য্যাৎ হরে র্দিনে।
তাবৎ গর্জ্জন্তি তীর্থানি দানানি নিয়মা যমাঃ॥
একাদশী ন সংপ্রাপ্তা যাবত্তাবদ্যমা অপি।
তস্মাদেকাদশী সর্ব্বৈরুপোষ্যা ভবতীকৃতিঃ॥

তীর্থাদিতে গমন করিলে পুণ্য হয়, দান ধ্যান করিলে পুণ্য হয়, যম নিয়ম পালন করিলে পুণ্য হয়, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে পুণ্য হয়,—হয় বটে, কিন্তু আমাদের মত সংসারাসক্ত জীবের ঐ সকল করিবার সময় সুবিধা হয় কি? পরম দয়াল শ্রীহরি তাই আমাদের জন্য নিজে এই তিথিটিকে নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই তিথির মাহাত্ম্যের তুলনা হয় না। ঋষিগণ তাহাই কহিয়াছেন—তীর্থ দান, যম, যজ্ঞ ততদিনই গর্জ্জন করিয়া নিজ নিজ মহিমা ঘোষণা করে যাবৎ হরিদিন আসিয়া উপস্থিত না হয়েন। অতএব যাহারা ভবপারে যাইতে অভিলাষ করেন তাহারা আর কিছু করুন না করুন—ঐই হরি দিনের ব্রতটি অতি আগ্রহের সহিত পালন করিবেন। ঐ দিন হরিকথা, হরিনাম, হরি সংকীর্ত্তন ছাড়া আর কিছু করিবেন না। এই ব্রতে মর্ত্তবাসীরই অধিকার দেবগণের ইহা দুর্লভ। অল্পায়ুঃ হীনবীর্য্য নরজীবের জন্যই শ্রীহরির মূর্ত্তি স্বরূপ এই তিথির আবির্ভাব।

এই তিথিটিতে উপবাস করা সকলেরই কর্ত্তব্য। 'উপ' অর্থ নিকটে, বস ধাতুর অর্থ বাস করা। এই দিনটি শ্রীহরির সন্নিকটে বাস করিতে হইবে। আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য আহার আর ইন্দ্রিয় সুখের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে হইবে। একেবারে অপারগ হইলে সারাটি দিন হরিনাম রসে মগ্ন থাকিয়া, দিবসের অষ্টম ভাগে সূর্য্যদেবের কিরণ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে, একবার আহার করিবে। তাহাতেও অসমর্থ হইলে দিবসেই একবার মাত্র আহার করিবে, কিন্তু কদাপি একাদশীকে অবমাননা করিয়া দুই বেলা আহার করিবে না।

সত্য ত্রেতাদি যুগে রাজা মহারাজারা অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিয়া যে ফল পাইতেন, কলিযুগে একাদশী ব্রত দ্বারা সেই ফল লাভ হইবে। পুণ্যক্ষেত্রাদিতে গমন করিয়া শ্রীগদাধর বিগ্রহ দর্শন ও স্নানাদি দ্বারা যে ফল হয়, তাহা একাদশীর ব্রতের ফলের তুলনায় এক অংশ মাত্র। ব্যতীপাত যোগে বা সংক্রান্তিতে দান করিলে যে ফল হয় বহু বর্ষ ধরিয়া যেব তপস্বী ভোজন করাইলে যে ফল হয়, হরিবাসরের পুণ্যসমূহের কাছে তাহা গোষ্পদ তুল্য মাত্র। কলির জীবের জন্য যেমন ভুবন মঙ্গল হরিনাম মহৌষধি, তেমনি হরিবাসর পুণ্যোদধি। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

আর সদাশিব বলিয়াছেন ভবাণীকে—

"রটন্তীহ পুরাণানি ভূয়ো ভূয়ো বরাননে।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥

অতএব হরিবাসরে হরিনাম, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বস্তু সংসারে আর দ্বিতীয় নাই। কেবল ইহাই নহে, একাদশী অকরণে আবার প্রত্যবায়ের কথাও শাস্ত্রে আছে—

একাদশী ব্রতং নাম সর্ব্ব কর্ম্ম-ফলপ্রদম্।
কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা বিপ্রৈ বিষ্ণু-প্রীণন কারণম্ ॥
মাতৃহাপিতৃহাচৈব ভ্রাতৃহা গুরুহাতথা।
একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ ॥
অগ্নিবর্ণায়সং তীক্ষ্ণং ক্ষিপ্যন্তি যমকিঙ্করাঃ।
মুখে তেষাং মহাদেবী যে ভুঞ্জন্তি হরের্দিনে ॥

প্রত্যেক ব্রাহ্মণেরই শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থে এই সর্ব্ব-কর্ম্মফলপ্রদ একাদশী পালন করা উচিত। যে ব্যক্তি একাদশীতে শ্রীহরির স্মরণ না করিয়া ইন্দ্রিয়লালসায় মত্ত থাকে সে মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা ও গুরুহত্যার পাতকী হয়। যমদূতগণ উত্তপ্ত লৌহ শলাকা তাহার মুখে নিক্ষেপ করে। বস্তুতঃ ৩৬৫ দিনের মধ্যে এই ২৪ দিনও যে মুখ আহারের ক্ষণিক সুখ হইতে বিরত হইয়া নিত্য শাশ্বত সুখময় শ্রীহরির নামরসে মত্ত হইতে না পারিল—সে মুখের ঐরূপ দুর্গতি হওয়াই উচিত। তবে বিশেষ কোন শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন যদি কোন দিন কোন ব্যক্তি এই ব্রতের উদ্‌যাপনে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া পড়েন তবে তাহার কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে? বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর বলেন—

ব্রহ্মঘ্নস্য সুরাপস্য স্তেয়িনো গুরুতল্পিনঃ।
নিষ্কৃতির্ধর্ম্ম-শাস্ত্রোক্তা নৈকাদশ্যন্ন ভোজিনঃ ॥

শাস্ত্রে ব্রহ্মঘাতী সুরাপায়ী ও তস্করের নিষ্কৃতির বিধান কথিত, আছে, কিন্তু একাদশীতে যে ব্যক্তি আহার করে তাহার পরিত্রাণার্থ প্রায়শ্চিত্তের কোন বিধি নাই। কেবল একটী উপায় আছে—বৎসরে ২৪টি একাদশী আছে, মলমাস হইলে আর দুইটী বেশী হয়। যে দিন একাদশী উদ্‌যাপনে একান্ত অসমর্থ, সেদিন গললগ্নীকৃতবাস হইয়া যুক্ত করে ঐ ২৬টি একাদশীর নাম স্মরণ পূর্ব্বক প্রত্যেকের নিকট ক্ষমা চাইতে হইবে যে—হে হরিপ্রিয়া তিথি, তুমি শ্রীহরিবল্লভা, কখনও শয়ন, কখনও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, কখনও উত্থান করিয়া শ্রীহরি তোমাতেই বিহার করেন, আমি হতভাগ্য তাই আজ তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলাম না. তুমি কৃপা কর যেন আমার হরি পদে মতি হয়।'

ঐ একাদশী দেবীগণের নাম সমূহ কি সুন্দর!

উৎপন্না মোক্ষদা চাপি সফলা পুত্রদা তথা।
ষট্‌তিলাখ্যা জয়াখ্যাচ বিজয়া মালকীতিচ ॥
পাপমোচনিকাখ্যা চ কামদা চ বরুথিনা।
মোহিনী চাপরাখ্যাচ নির্জ্জলা যোগিনী তথা ॥
বিষ্ণোর্দেবস্য শয়নী পবিত্রা পুত্রদাত্বজা।
পরিবর্ত্তিনীন্দিরাখ্যা তথা পাশাঙ্কুশা বরা ॥
দেবোত্থানীতি চ প্রোক্তা শ্চতুর্ব্বিংশতি নামভিঃ।
দ্বে চাপ্যধিকমাসস্য পদ্মিনী পরমেতি চ ॥

কাহারও নাম জয়া, কাহারও নাম বিজয়া, তাহারা সর্ব্বত্র জয়যুক্ত করেন, কাহারও নাম পাশাঙ্কুশা, তিনি অষ্টপাশের অঙ্কুশ স্বরূপা, কাহারও নাম পবিত্রা, তিনি হৃদয় পবিত্র করেন, কাহারও নাম রমা. তিনি রমাপতিকে মিলাইয়া দেন।

শ্রীএকাদশী জয়যুক্ত হউক। একাদশীতে উপবাসী বৈষ্ণবগণ জয়যুক্ত হউক। তাহাদের পদধূলিস্পর্শে ধরণী পবিত্র হউক।

মৃদঙ্গমাধুরী শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী, কীর্ত্তনাচার্য্য।
১৯, বাদুরবাগান লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীপ্রভুর রচনা-রহস্য।

করুণাময় মহাউদ্ধারণচন্দ্র শ্রীশ্রীবন্ধু হরি ও তাঁহার মহা-মহিমামণ্ডিত ভক্তগণের পাদপদ্মে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি। প্রাসঙ্গিক হো'ক বা না হো'ক আগে আমি-জীবাধমের জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা সর্ব্বচরণে নিবেদন করিব। শ্রীবন্ধুহরির কৃপাসিদ্ধ শ্রীমহানাম সম্প্রদায়ের পরম দয়াল ভক্ত বৃন্দের শ্রীচরণরজে স্নাত হইয়া যখন আমার কর্ম্মজীবনের আবর্জ্জনা রাশি শরীর হইতে মুছিয়া নিজেকে সুস্থ, শুদ্ধ ও ধন্য মনে করিয়াছি; জীবনের সেই শুভমুহূর্ত্ত হইতেই প্রাণ প্রিয়তম বন্ধু সুন্দরের রাতুল পাদপদ্ম যুগলে প্রার্থনা করি যে, প্রভু তুমি কৃপা করিয়া তোমার দুরূহগ্রন্থ রাজির নিগূঢ় মর্ম্ম কিঞ্চিৎ আমার হৃদয়ে প্রকাশিত কর। আজও করিতেছি, জানি না শ্রীলেখনী প্রসূত শ্রীমহাউদ্ধারণ গ্রন্থগণ কোনও কালে এ দীন মূর্খকে করুণা করিবেন কিনা। ইতিপূর্ব্বে এক সময় শ্রীশ্রীপ্রভুর অনুকম্পায় শ্রীচন্দ্রপাত্ত হরিকথা ও ত্রিকালগ্রন্থ আলোচনায় আমার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও নিবিষ্টতা আসে। মনে হয় জীবনে অন্য কোন গ্রন্থ পাঠে মনের এতদূর একাগ্রতা ও কৌতুহল হয় নাই। ঐ গ্রন্থ সমূহের শব্দ মাধুর্য্য আমার চিত্তকে একেবারে বিমোহিত করিয়া-ছিল, আজ আমি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম।

জীবপাবন বন্ধু আমার নিতান্ত কৃপাপরায়ণ হইয়া পতিত অধম জীবকে লইয়া উদ্ধারণের পথে তুলিয়া দিবার জন্য গোলোক ছাড়িয়া ভূলোকে অবতরণ করিয়াছেন। সৃষ্টির কোন্ ভাবী মঙ্গল কামনায় বা অন্য কোন্ শুভ ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া তিনি সপ্তদশ বর্ষ নির্জ্জন কুটির অবস্থান করিয়াছেন, কেনই বা বর্ত্তমানে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে অন্তরালে লুকাইয়া মহা-মহা দশামাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন, কেনই বা শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থকে উদ্ধারণ ও মহাউদ্ধারণ আখ্যা দিয়াও জীবের একরূপ দুর্ব্বোধ্য করিয়া রাখিয়াছেন—

এসব দুর্ব্বোধ রহস্য কে ভেদ করিতে সক্ষম? তাঁহার অচিন্তনীয় কার্য্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অধম জীবের বিচার্য্য নহে—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ।
ন তাং স্তর্কেন যোজয়েৎ॥

শ্রীশ্রীপ্রভু তাহার রচিত গ্রন্থে গূঢ় সৃষ্টিতত্ত্ব, আচার্য্য, ধর্ম্ম, মহাধর্ম্ম, উদ্ধারণ, মহাউদ্ধারণ, সূক্ষ্মলীলারহস্য, নাম, মহানাম, তাঁহার আবির্ভাবের কারণ ও মাধুর্য্য, প্রলয় নিবারণ, উদ্ধারণকার্য্য প্রভৃতি হইতে জীবের দেহধারণ জন্ম যাহা হিত, যাহা অহিত, যাহা আচরণীয়, যাহা বর্জনীয়, আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, নৈসর্গিক, প্রভৃতি সকল কথা অতি অল্প অক্ষরে সূত্রাকারে প্রচার করিয়াছেন। এই সৃষ্টিকার্য্যে বিগ্রহগণ, ভক্তগণ, আবেশগণকে কোন কার্য্যের ভার লইয়া অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে সৃষ্টিরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিরাজ করিতেছেন, তাহাও বলা হইয়াছে। আমার মনে হয়, অন্যান্য অবতারে যাহা প্রকাশিত হয় নাই, এবার তাহা সম্যকরূপে প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীহরিকথা বিশেষতঃ শ্রীচন্দ্রপাত গ্রন্থের কিছু মর্ম্ম অবগত হইতে হইলে শ্রীত্রিকালগ্রন্থের সাহায্য লইতে হইবে। অনেক অর্থ যাহা প্রচলিত অভিধানে নাই তাহা শ্রীত্রিকাল গ্রন্থে লেখা আছে। শ্রীমহাউদ্ধারণ গ্রন্থ বাঙ্গলা অক্ষরে দেখা যায় সত্য, কিন্তু ভাষা এক অভিনব প্রকারের। অপ্রাকৃত কাহাকে বলে জানি না—তবে মনে হয় এইই অপ্রাকৃত ভাষা।

শ্রীহরি কথার দুই একস্থানে মাত্র, বিশেষতঃ ভনিতায়, শ্রীশ্রীপ্রভুর কথার আভাষ পাওয়া যায়। উক্ত শ্রীগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ লীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাকথায় পূর্ণ। শ্রীচন্দ্রপাতগ্রন্থে আমরা বর্ত্তমান লীলারই পরিচয় পাই। তিনি কে, কি জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ, কিসের সাহায্যে আগমন, তৎপর এখানকার কার্য্য পরে মহামৃত্যু মহাপ্রলয়ন কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রথমে তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, দ্বিতীয়তঃ তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া উভয় তত্ত্বের মধ্যে নিজ বিশেষত্ব বুঝাইয়া বর্ত্তমান পরিচয় দিতেছেন। পরিশিষ্টে মহাদশমীরূপ মহা মহাভাবদশাকে মহামৃত্যু আখ্যা দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কৈতবতপ্ত জীবকে হরিনাম-উপদেশ, শুচি হইতে বলা, গতিমুক্তিলাভের উপায় মহাপ্রলয় ভীতি হইতে সাবধান করণ, মহাউদ্ধারণ সেবার উপদেশ দিয়া অভয়দান জীবের হরিনামে অবিশ্বাসই যেন বজ্রবধ স্বরূপ তজ্জন্য কঠোর তিরস্কার ও পাষাণভেদী আক্ষেপ সবই আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীশ্রীপ্রভু কেন শ্রীচন্দ্রপাত মহাউদ্ধারণ-গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের সহজ বোধ্য করেন নাই তাহা বুঝিবার শক্তি নাই তবে তিনি কৃপা করিয়া এই দুর্ব্বোধ্য মহাগ্রন্থের চাবি যাহাকে অর্পণ করিবেন তিনিই শ্রীগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় অতি সহজ সরল ভাষায় বর্ণিত দেখিতে পাইবেন, এবং আরও দেখিবেন যে শ্রীশ্রীপ্রভু কত অল্পকথায় তাহার মহাভাব ও মহালীলার মধুর প্রাঞ্জল বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচন্দ্রপাতগ্রন্থ—আগাগোড়া cypher writing বা সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত। অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে যাহাই থাকুক, স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখের বাক্যে আমরা কিছুমাত্র জটিলতা পাইব না ইহাই আমার বিশ্বাস। যেমন কেহ একটি বহু মূল্য রত্ন পাইলে লুকাইবার মানসে উহা অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে, শ্রীশ্রীপ্রভুও তদ্রূপ চন্দ্রপাতের অর্থ কতকগুলি ভাঙ্গা অর্থহীন শব্দের সংযোগে কোনশব্দ ভাঙ্গিয়া (যথা সাঙ্গোপাঙ্গ স্থলে সাঙ্গ উপঅঙ্গ) তিনটি চারটি পৃথক শব্দদ্বারা কোনটীর অক্ষর ছাটিয়া (যথা অমঙ্গল স্থলে অমঙ্গ) হ্রস্ব কোনটী দীর্ঘ কোথাও বা একই রকমের দুইতিনটি শব্দের প্রয়োগ (যথা সাদন সদন যেমন বাঙ্গলাতে কাপড় চোপড়, চাষা ভূষা ইত্যাদির প্রয়োগ হয় তদ্রূপ) কখনও একই অর্থসূচক দুইটিশব্দের সমাবেশ (যথা সংলয়লয় ইত্যাদি) দ্বারা লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তবে একটিবার সঙ্কেতটি বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে মূলবস্তুটি সহজ ও সরল, বিন্দুমাত্র জটিলতা নাই।

শ্রীভগবানের সৃষ্টিকার্য্য ও লীলা যেরূপ বুদ্ধির অগম্য তাহার মহাবাক্যাবলি ও আদেশ উপদেশ সমূহও যদি তদ্রূপ হইত তবে মাদৃশ মূর্খ জীবের কিরূপে তাহা আশ্রয়ণীয় হইত? অবিশ্বাসী জীব তাহার বাক্যে জটিলতা পাইলে নানা অর্থ করিয়া তাহাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না। কাশীধামে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বলিয়া ছিলেন যে বেদান্তের অর্থ সহজ সরল কিন্তু শ্রীশঙ্কর ঈশ্বরাদেশে স্বকল্পিত ভাষামেঘ দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিয়া বিপরীত অর্থ করিয়াছেন। শ্রীগীতার ভাষাও সরল ও দ্বিভাববর্জ্জিত যেহেতু উহা স্বয়ং পদ্মনাভের মুখপদ্ম বিগলিত।

শ্রীমহাউদ্ধারণ গ্রন্থে যদি কেহ প্রচলিত ব্যাকরণ বানান অশুদ্ধি, আভিধানিক শব্দার্থ ইত্যাদি দেখিতে চাহেন তবে তিনি ভুল করিবেন। যেহেতু ইহা সাধারণ সাধু মহাপুরুষের রচিত নহে। বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং বীণাপাণি যাঁহা হইতে বাণী লাভ করিয়াছেন তিনি নিজ শ্রীমুখে যাহা বলিবেন ও শ্রীহস্তে লেখনী ধরিয়া যাহা লিখিবেন তাহাই অপ্রাকৃত ভাষা বা মহামহাবেদ, সে বিষয়ে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে? অপ্রাকৃত লীলা, কেবলমাত্র প্রাকৃত জীবের গোচরীভূত করিবার জন্য প্রাকৃত ছাঁচে ঢালা হইয়াছে।

এই সকল রহস্যময়ী রচনার মর্ম্মোদ্ঘাটন কে করে করিবেন—কে জানে? পরমদয়াল বান্ধবগণ কৃপাশীর্ব্বাদ দানে শক্তি সঞ্চার করিলে, সময়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা দ্বারা নিজকে পবিত্র করিব—এইরূপ আশা হৃদয়ে আছে। জয় জয় প্রভু বন্ধু। জয় তোমার মহাউদ্ধারণ গ্রন্থমালা॥

মহানামপ্রহরী—শ্রীঅমূল্যভূষণ মল্লিক।
অবসরপ্রাপ্ত পুলিস ইনস্পেক্টর।

জয় জগদ্বন্ধু হরি।

এস মোহন বংশীধারী।

বেদনা পীড়িত তৃষিত পরাণে ঢাল গো করুণা শান্তি বারি;
এস মোহন বংশীধারী॥

অনলের মাঝে দহিয়া দহিয়া,
দৈন্যের বোঝা সতত বহিয়া,
অচেনার পথে যাব হে চলিয়া
যাব হে শান্তি মানসে।
তখনি তোমার বাঁশরীর তানে,
ব'লে দিও ওগো মোর কানে কানে,
পথ সন্ধান নিরাশ পরাণে
সুরের লহরী পরশে॥
প্রলয়ের যবে অমানিশা রাতে,
জীবন সিন্ধু রুদ্র আঘাতে,
জীর্ণ তরীর যবনিকাপাতে
ডাকিব হে নাথ বলিয়া॥
মিলন মধুর রাগিণী শান্ত,
বাঁশীটি বাজায়ে ক'রো গো ক্ষান্ত,
মত্ত সিন্ধু; জীবনকান্ত
যেও না তখন ভুলিয়া॥
জীবন মৃত্যু সমরাঙ্গনে,
পাপের তীব্র ক্রূর দংশনে,
আসিবে যখন অবসাদ মনে
নিস্তেজনায় শ্রান্তি॥
তখন যেন গো প্রাণোন্মাদিনী,
বাঁশী বেজে উঠে দিবস যামিনী,
শত্রু জিনিব শুনি সে রাগিণী
লভিব ত্রিদিব শান্তি॥
করমের শেষে শমন আসিয়া,
দেহটী যখন ফেলিবে গ্রাসিয়া,
এস গো তখন বাঁশী বাজাইয়া
মঙ্গল গান প্রচারি'॥
(ওগো) তুলে নিও কোলে, তখন তোমার স্নেহের বক্ষ চির প্রসারি'
এস, মোহন বংশীধারী॥

সেবকাধম—
শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন সাহা।

অজিত প্রেস ১১৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে শ্রীললিতমোহন রায় দ্বারা মুদ্রিত।

মাঘোৎসব।

মাঘী তেরোদশী হাসে দশদিশি
বার বরষ বিরসে কাটাইয়া।
যত ভক্তগণ সবে হৃষ্টমন,
আজি বাহিরে আসিবে বিনোদিয়া।
ছুটে মহীন্দির, চোখে বহে নীর,
ধীরে মন্দিরে সাদরে প্রবেশিয়া।
কহে বন্ধুধনে, ধীরে সঙ্গোপনে,
বড় আদরে হৃ'করে কর দিয়া।
কত কাল ধরি', দৃঢ় ব্রত ধরি',
র'লে সোণার বরণ আবরিয়া।
ওহে গুণধর, আজি দয়া কর,
বহিরঙ্গনে আপনা প্রকাশিয়া।
শুনি' বন্ধুহরি, মৃদু হাস্য করি,
উঠে মহীন-অঙ্গেতে অঙ্গ দিয়া।
আসি বাহিরেতে, চাহে চারিভিতে,
প্রেম-আঁখিতে অমিয়া বরষিয়া।
যত নরনারী, ছুটে তাড়াতাড়ি,
সবে নাচিল ভাসিল দরশিয়া।
গৃহ কাজ ছাড়', ছুটে কুলনারী,
কুল ভরম সরম পাশরিয়া।
প্রেম ফুলমালা, ভরি' হৃদি ডালা,
প্রাণ বঁধুরে বরিল সমর্পিয়া।
যত ভক্তগণ, করে উচ্চারণ,
হরিপুরুষ সুন্দর মোহনিয়া।
মহানাম ব্রত, মোহ ঘুমে রত,
হেন বঁধুরে রহল পাশরিয়া॥

"হরি নাম প্রভু জগদ্বন্ধু ॥"

"হরি পুরুষ, উদ্ধারণ প্রকৃতি ॥"

"হরি শব্দ উচ্চারণ, হরি পুরুষ উদয় ॥"

"হরি পুরুষ উদ্ধারণ উচ্চারণ,
উদ্ধারণ আগমন ॥"

—(ত্রিকাল)

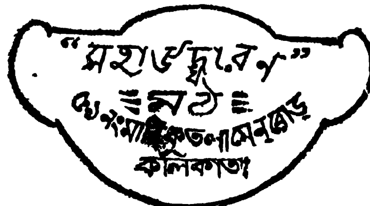


নিয়মাবলী।

১। "আঙ্গিনা" "মহাধর্ম্ম মহাউদ্ধারণ" গ্রন্থ। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীশ্রীনিতাইগৌর ও শ্রীশ্রীহরিপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের মাধুর্য্যময় লীলানুস্মরণই এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য।

২। বৎসরে চারি সংখ্যায় বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে। বৈশাখী সীতানবমী হইতে বর্ষ আরম্ভ। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৵০ মাত্র। প্রতি সংখ্যা নগদ ।০ আনা মাত্র। প্রবন্ধাদি 'কার্য্যালয়ে' প্রকাশকের নিকট প্রেরিতব্য।

আঙ্গিনা কার্য্যালয় :—



বিনয়াবনত—
গোপীবন্ধু দাস।
প্রকাশক।

ললিত প্রেস—১১৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা